চিলড্রেন্‌স. ডিকেটেড.
তিরিশ বছরের সেরা
ভূতের গল্প

উৎসর্গ

দাদা—
৺মানবেন্দ্রনাথ বসু
ভাইপো—
৺ময়ুখ সুন্দর বসু
খুড়তুতো বড়দা—
৺সন্তোষকুমার বসু
ভাইপো—
৺সন্দীপ বসু
ফুলমামা—
৺দীপক দে মল্লিক

Collect More Books >
From Here

ভূমিকা

'ভূতের গল্প' নামটাতেই একটা শিহরন জাগে। ভূত কথার যতই যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা থাক না কেন, পাঠকমহলে এর চাহিদা অপরিসীম। তবে ভূতের গল্প পড়া বা শোনার জন্য একটা পরিবেশ দরকার। শীতের সন্ধ্যায় বা রাত্রে অথবা ঘনঘোর বর্ষায় যেমন জমে যায় ভূতের গল্প অন্য সময় ততটা নয়। শীতের আমেজ, কুয়াশাঘেরা প্রকৃতি আর অন্ধকার অন্ধকার ভাবের মধ্যে ভূতের গল্প শুনলে অতি বড় যুক্তিবাদীও শিহরিত হবেন। ভূতের গল্পের সঙ্গে জড়িত থাকে কিছু অতি প্রাকৃতিক বর্ণনা। এই বর্ণনা যত বিস্তারিত ও রসালো হয় ততই মন আকৃষ্ট হয় গল্পের প্রতি। বাস্তব জগতে ভূত আছে কি নেই তা নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা চলতে পারে, অনেক যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করা যায় ভূত বলে কিছু নেই, কিন্তু শীতের অন্ধকার রাত্রে নিজের ছায়া দেখেও অবিশ্বাসের বেড়া ভেঙে আমাদের মনোজগতে বাসা বেঁধেছে। কিশোর মন সর্বদাই রোমাঞ্চ খুঁজে বেড়ায়, না দেখা বস্তুর প্রতি থাকে অপরিসীম কৌতূহল, তাই অতিপ্রাকৃত ঘটনায় সমৃদ্ধ ভূতের গল্প তাদের মনকে সহজেই নাড়া দেয়। চিল্ড্রেন্স ডিটেকটিভ পত্রিকা কিশোর মনের এই তাগিদকে পূরণ করতে ভূতের গল্প অন্তর্ভুক্ত করে পত্রিকায়। আজ তিরিশ বছর ধরে বিভিন্ন লেখক-লেখিকা যে সব ভূতের গল্প এই পত্রিকায় লিখেছেন তার থেকে বাছাই কিছু গল্প নিয়ে প্রকাশিত হল এই সংকলন। লেখক তালিকাই প্রমাণ দেবে এই সংকলনটির উৎকর্ষতা। কিশোর মনের সদাজাগ্রত মননশীলতাকে ছুঁতে পারাই এই সংকলনটি প্রকাশের উদ্দেশ্য। কিশোর মন আকৃষ্ট হলেই আমাদের সার্থকতা।

মহীন্দ্র বসু
সঙ্ঘমিত্রা বসু

সূচি

অদৃশ্য মানুষের হাতছানি	সমরেশ বসু	৯
ডনের ভূত	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	২৩
এক ভৌতিক মালগাড়ি আর গার্ড সাহেব	বিমল কর	২৯
ভূলো ভূত	মহাশ্বেতা দেবী	৩৫
একখানি মুখ	নীহার রঞ্জন গুপ্ত	৩৯
হুড়কো ভূত	অমিতাভ চৌধুরী	৪৪
অদৃশ্য হাত	ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়	৪৮
অবুঝ ভূতের গল্প	বাণী রায়	৫১
রামকিঙ্করবাবুর অদ্ভুত ভাড়াটে	হিমানীশ গোস্বামী	৫৪
ছেলেটার মুখ	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	৬২
দুই পালোয়ান	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	৬৭
গোলাবাড়ির সার্কিট হাউস	লীলা মজুমদার	৭০
রাতের আশ্রয়	মনোজ বসু	৭৪
চার বুড়োর আড্ডা	আশাপূর্ণা দেবী	৭৭
ভূতের মাসি, ভূতের পিসি	পূর্ণেন্দু পত্রী	৮৫
শিবকালীর যাত্রা দেখা	বরেণ গঙ্গোপাধ্যায়	৯০
কলিকাতার গলিতে	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৯৫
কাচ	সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	১০১
টটনের কুকুর	অতীন বন্দোপাধ্যায়	১০৪
স্বপ্নের মতো	নবনীতা দেবসেন	১১১
রাতটা ছিল দুর্যোগের	সমরেশ মুজমদার	১২১
ব্রহ্মদত্যির খড়ম নেই	শেখর বসু	১২৬
অবিশ্বাস্য হলেও সত্য	চিন্ময়ী দে	১৩১
ভূতের বিভীষিকা	রুবি বাগচি	১৩৪
ভূতদাদু	প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়	১৩৮
অন্যরকম ভূত	তপন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪২
সে এসে দেখা দেয়	মহীন্দ্র বসু	১৪৯

অদৃশ্য মানুষের হাতছানি

সমরেশ বসু

সেবার গোগোল বাবা মায়ের সঙ্গে গেছল দার্জিলিংয়ে। মাত্র বছর দুয়েক আগে। এর আগেও গোগোল দার্জিলিং গেছে। তখন যে ঘটনা ঘটেছিল, তা এতদিনে সবাই জেনেও গেছে। দু বছরের আগের ঘটনাটা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। সে-ঘটনা লোকজনের মধ্যে জানাজানি হয়নি। কোনো রকম হৈচৈও হয়নি। সেজন্যই ঘটনাটার কথা সাধারণ লোকে কিছু জানতে পারেনি।

ঘটনাটা একরকম ভুতুড়ে ঘটনা বললেই চলে।

সেবার দার্জিলিংয়ে যাবার আগে থেকে কোনো কথা ছিল না। পুজোর ছুটিতে কোথাও যাওয়া হবে না, সেটা আগে থেকেই ঠিক ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে, পুজোর ছুটির মাত্র দিন সাতেক বাকি থাকতে, হঠাৎ একটা নিমন্ত্রণ জুটে গিয়েছিল। বাবার এক বন্ধু, হাইকোর্টের তিনি একজন ব্যারিস্টার। বাবারই বয়সি। ভদ্রলোকের নাম নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। দার্জিলিংয়ে, ম্যালের আগে একটু নিচেই, হাসপাতালের খুব কাছেই, তাঁর পিতামহের আমলের একটি বাড়ি ছিল। নীলমাধববাবুর বাবাও ছিলেন তাঁর পিতার একমাত্র পুত্র। নীলমাধববাবু নিজেও তাঁর বাবার একমাত্র ছেলে। সেই সূত্রেই, দার্জিলিংয়ের বাড়িটি তিনি পেয়েছিলেন।

গোগোল শুনেছে, বাবার সেই ব্যারিস্টার বন্ধু নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি অনেকবার বাবাকে সপরিবারে দার্জিলিংয়ে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছেন। বাবা সময় করে উঠতে পারেননি। বছর দুয়েক আগে, বাবা সেবার অফিসের কাজে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় ছুটি নিতে পারেননি। সেজন্য পূজোর পরে, অফিস থেকে ছুটি পেতে তাঁর অসুবিধা ছিল না। আর তাঁর ব্যারিস্টার বন্ধুর তখনও হাইকোর্ট বন্ধ। তিনি বাবাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন।

পুজোর ছুটির পরেই, সাধারণতঃ বাৎসরিক পরীক্ষার সময় ঘনিয়ে আসে। সেজন্য মা গোগোলের পড়ার ব্যাপারে, প্রথমে একটু আপত্তি তুলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত নীলমাধববাবু মাকে বলে রাজি করিয়েছিলেন। আর তিনি মাকে রাজি করিয়েই, বাবার সম্মতি পেয়ে, নিজের থেকেই বাগডোগরা পর্যন্ত প্লেনের টিকেট কেটেছিলেন। বাবা ট্রেনেই যাবেন বলে স্থির করে রেখেছিলেন, আর সেই মতো ব্যবস্থাও করেছিলেন। কিন্তু নীলমাধববাবু বাবাকে বলেছিলেন, "পুজোর ছুটিটা এখনো রয়েছে বলে, ট্রেনে টিকেট পাওয়া একটু মুশকিল আছে। তাই আমি প্লেনের টিকেটই কেটেছি। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা দার্জিলিং পৌঁছে যাব।"

বাবা বাধ্য হয়েই প্লেনে যেতে রাজি হয়েছিলেন। তাঁর বন্ধুকে, গোগোলের হাফ টিকেট নিয়ে, আড়াইটি টিকেটের টাকা দিতে গিয়েছিলেন। নীলমাধবাবু তাতে মনে খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন। বলেছিলেন, "সমীরেশ, তোমার জন্য আমি টিকেট কেটেছি, তার জন্য তুমি আমাকে টাকা দেবে? আর সে-টাকা আমি নেব। তুমি তা ভাবতে পারলে?"

বাবা তবুও তাঁর বন্ধুকে টাকাটা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। নীলমাধববাবু টাকা নেন নি। অবশ্য

নীলমাধববাবু খুবই বড়লোক, আর বাবার ছেলেবেলারই বন্ধু। গোগোলকে বলা হয়েছিল, ও যেন নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যানার্জি কাকা বলে ডাকে।

গোগোল তারপরে শুনেছিল, নীলমাধব কাকা বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু কাকিমা বেশি দিন বাঁচেননি। তিনি আর বিয়ে করেননি। তাঁর কোনো ছেলেমেয়েও ছিল না। অথচ লোকজন নিয়ে থাকতে ভালবাসেন। গোগোলের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যাবার পরেই, দুজনের মধ্যে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল।

ব্যানার্জি কাকার সব ব্যবস্থাই করা ছিল। দমদম থেকে, বাগডোগরায় প্লেনে যেতে সময় লেগেছিল মাত্র চল্লিশ মিনিট। বাগডোগরায় ব্যানার্জি কাকা খবর দিয়ে, আগেই একটি গাড়ি রেখে দিয়েছিলেন। তখন বেলা দশটায় দমদম থেকে বাগডোগরার প্লেন উড়তো। বেলা একটাতেই গোগোলরা দার্জিলিং পৌঁছে গেছল। ট্রেনে করে যাবার মধ্যে দু রকমের আনন্দ আছে। দিনের বেলা গেলে, মাঠ ঘাট গ্রাম নদী, অনেক দৃশ্য দেখতে দেখতে যাওয়া যায়। আর রাত্রের গাড়িতে গেলে, তারও একটা মজা আছে। গোগোলের ট্রেনে ঘুম এলেও, বেশিক্ষণ ঘুমোতে পারে না। মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙে যায়। আর জেগে উঠে, হঠাৎ মনে করতে পারে না, ও কোথায় আছে। তারপর ট্রেনের শব্দে আর ঝাঁকুনিতে টের পায়, ও চলেছে রাত্রের রেলগাড়িতে। টের পেয়েই, আবার শুয়ে পড়ে। আবার ঘুম ভেঙে যায়। যেন একটা স্বপ্নের খেলার মধ্য দিয়ে, ভোরের আলোয়, হঠাৎ এক নতুন দেশের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

ট্রেনে যাবার সেই ভালো লাগা একরকম। প্লেনে যাবার মজা আর একরকম। সেবারই অবশ্য গোগোলের প্রথম প্লেনে ওড়া ছিল না। আগেও প্লেনে উড়েছে। পরেও বেশ কয়েকবার উড়েছে। প্লেনে জানালার ধারে বসে যেতে পারলে, নীচের অনেক কিছুই দেখা যায়। তার মধ্যেও একটা মজা আর উত্তেজনা আছে। খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে, নীচের অনেক কিছুই দেখা যায়। যেমন নদী, জঙ্গল, চাষের মাঠ, রেল লাইন, রেল লাইনের ওপর দিয়ে চলা ট্রেন, রাস্তা, রাস্তার ওপর দিয়ে ছোটা মোটরগাড়ি, সবই খুব ছোট আকারে দেখা যায়। গ্রামের পরে, হঠাৎ কোনো শহর বা কারখানা এলেও চোখে পড়ে। আবার প্লেন যখন কাত হয়ে যায়, তখন মনে হয়, এক দিকের নীচের ভূমি একদম আবছা হয়ে যায়। উলটো দিকের জানলায় চোখ পড়লে, নীচের আর এক দৃশ্য। বড় নদীগুলোকে দেখায় যেন বিরাট আঁকাবাঁকা অজগরের মতো। সেই অজগরের বুকে, খুব ছোট পুতুলের মতো নৌকোও ভাসতে দেখা যায়। কোনো কোনো জায়গায় নদী এত চওড়া, বহুদূর পর্যন্ত তার বালির চড়া দেখা যায়। আর ছোট নদীগুলো ছোট সাপের মতো দেখায়। সেবার ব্যানার্জি কাকার সঙ্গে অক্টোবর মাসের একেবারে শেষ দিকে যাওয়া হয়েছিল। আকাশ এত পরিষ্কার ছিল, বাগডোগরায় নামার আগেই, বরফ ঢাকা কাঞ্চনজংঘা পরিষ্কার দেখা গেছল। প্লেনে যাবার মজাটা হল, অনেকটা পথ আকাশের ওপর দিয়ে উড়ে, খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাওয়া যায়। দার্জিলিং মেলে যেতে হলে, সন্ধ্যা রাত্রি থেকে, শিলিগুড়ি পৌঁছতেই সকাল হয়ে যায়। তারপরে গাড়িতে দার্জিলিং পৌঁছানো। অবশ্য, দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেনে গোগোল চেপেছে। জীপ বা মোটর গাড়িতে যাওয়ার চেয়ে, ওতেই আনন্দ বেশি, তবে টয় ট্রেনে যেতে সময় বেশি লেগে যায়।

দুবছর আগে, ব্যানার্জি কাকার সঙ্গে, কলকাতার বাড়ি থেকে, সকাল সাড়ে আটটায় গাড়িতে বেরিয়ে, প্লেনে উড়ে, বাগডোগরা থেকে দার্জিলিং পৌঁছেছিল বেলা একটায়। ম্যালের বাঁ পাশ দিয়ে ঘুরে গাড়ি হাসপাতালের দিকে গেছে। হাসপাতালের সামনে থেকেই, একটা প্রায় কুড়ি গজ চওড়া রাস্তা সোজা ব্যানার্জি কাকার বাড়ির গেটের সামনে পৌঁছে গেছল। গেটটা খোলাই ছিল। আর একজন নেপালি মহিলা দরজার সামনে হাসি মুখে দাঁড়িয়েছিলেন। গাড়িটা সোজা, শান-বাঁধানো চত্বরে ঢুকে গেছল। ব্যানার্জি কাকা গাড়ির সামনের আসনে বসেছিলেন। দরজা খুলে নামতেই, নেপালি মহিলা কপালে দুহাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে কী

যেন বললেন। গোগোলদের জানালার কাচ তোলা ছিল। তাড়াতাড়ি কাচ নামিয়ে দিয়েছিল। ব্যানার্জি কাকাও কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে যে-ভাষায় নেপালি মহিলার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, গোগোল তার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারেনি। বাবা বলেছিলেন, ব্যানার্জি কাকা নাকি নেপালি ভাষাতেই মহিলার সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

গোগোল বাবা মায়ের সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমেছিল। অক্টোবর মাসের শেষ দিকে, পাহাড়ের নীচে তখনও গরম ছিল। কিন্তু মা আগে থেকেই সকলের জন্য গরম জামা আর শাল বের করে রেখেছিলেন। গাড়ির কাচ বন্ধ থাকলেও, কার্শিয়াং আসার আগেই, গোগোল একটা ফুল হাতা সোয়েটার গায়ে দিয়েছিল। দার্জিলিংয়ে পৌঁছে ওর আর তেমন শীত করেনি। রোদ ছিল বেশ ঝকঝকে। আকাশ ছিল নীল।

ব্যানার্জি কাকার বাড়িতে ঢোকার সামনে বাঁধানো চত্বরটা বেশ বড়। সামনেই কাচের মস্ত বড় দরজায় অনেকটা আয়নার মতোই, গোগোলরা নিজেদের দেখতে পাচ্ছিল। ওটাই ছিল বাড়ির ভেতরে ঢোকবার দরজা। ঢোকবার দরজার পাশেই ছিল আর একটা ঘর। কাঠের দেয়ালের সেই ঘরটার দরজা ছিল খোলা। ভেতরে দেখা যাচ্ছিল একটা টেবিল ঘিরে কয়েকটা চেয়ার। কিন্তু লোকজন কেউ ছিল না। একটা জানালার কাচের পাল্লা ছিল বন্ধ। বাঁধানো চত্বরের সামনে, লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা ছিল। রেলিংয়ের ওপারে কোনো ঘর বা চালের মাথা উঁচিয়ে ছিল না। চত্বরে দাঁড়িয়ে, নীচে বেশ কিছু ছবির মতো দেখতে সুন্দর বাড়ির ওপারে, বড় আর চওড়া কার্ট রোডের ওপর দিয়ে গাড়ি চলাচল করতে দেখা যাচ্ছিল। তার ওপরেও, নানা গাছপালা বাড়ি ঘর গাড়ি চলছিল। আর মাথার ওপরে নীল আকাশ। ব্যানার্জি কাকার বাড়িটার পেছনে পাহাড়ের ধাপে ধাপে, কয়েকটা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। আর সেই সব বাড়ির পাশ দিয়ে, ছোট সরু রাস্তা উঠে গেছে। প্রথমে মনে হয়েছিল ব্যানার্জি কাকার বাড়িটা যেন ঘিঞ্জির মধ্যে। কিন্তু চত্বরে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ের দিকে তাকালেই কার্ট রোড, গাড়ি-ঘোড়া, বাজারের কিছু অংশ, লোকজনের যাতায়াত সব সময়েই দেখা যেত। তাছাড়া রাস্তার ওপরের পাহাড়ে গাছপালা, বাড়িঘর ছোট রাস্তায় গাড়ি চলা আর আকাশ একেবারে অবারিত। তবে হ্যাঁ, ওদিকটায় কাঞ্চনজংঘা দেখতে পাবার কোনো আশা ছিল না।

বাড়ির ভেতর চত্বরে গাড়ি ঢুকতেই, নেপালি মহিলা গেটটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ব্যানার্জি কাকা গোগোল আর বাবা মায়ের সঙ্গে মহিলার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। মহিলার বয়স মায়ের থেকে কিছু বেশি। তাঁর ফর্সা রঙের মুখে বেশ কিছু রেখা পড়েছিল। তাঁর ছোট চোখ দুটি ছিল কালো। আর মুখের হাসিটি ভারি ভদ্র আর সুন্দর। তিনি মায়ের মতোই শাড়ি পরেছিলেন। আর একটা নীল রঙের ফুল হাতা সোয়েটার ছিল তাঁর গায়ে। তিনি বাবা-মাকে কপালে দু হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করেছিলেন। বাবা-মাও তাঁকে নমস্কার জানিয়েছিলেন। তিনি বাংলায় বলেছিলেন, "আসুন মিঃ চ্যাটার্জি, মিসেস চ্যাটার্জি, বাড়ির ভেতরে আসুন।"

মহিলার বাংলা কথা শুনে বাবা-মা খুব অবাক হয়েছিলেন। গোগোলও কম অবাক হয়নি। তবে তাঁর বাংলা বলার মধ্যে, উচ্চারণটা ছিল একটু অন্যরকম। ব্যানার্জি কাকা আবার নেপালি ভাষায় মহিলাকে কিছু বলেছিলেন। মহিলা পাশের কাঠের ছোট ঘরের দিকে একবার দেখে কি যেন জবাব দিয়েছিলেন। ব্যানার্জি কাকা তারপরে মহিলাকে দেখিয়ে বাবা মাকে বলেছিলেন, "এই মহিলাকে আমি ময়লিদিদি বলে ডাকি। ময়লি মানে মেজো। তার মানে মেজদিদি। তোমরাও ওঁকে মেজদিদি বলেই ডাকতে পার। মেজদি মেয়ে হলে কী হবে? তিনি একজন জবরদস্ত মহিলা। আর খুবই বুদ্ধি রাখেন। তাঁর স্বামী ছিলেন মিলিটারিতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, বার্মার কাছে, জাপানিদের হাতে তিনি অনেকদিন বন্দী থাকেন। যুদ্ধের শেষে যখন ফিরে আসেন, তখন তাঁর শরীর খুবই ভেঙে পড়েছিল। তখন তাঁরা ম্যালের যেদিকে লেবং, সেদিকে নীচের একটা

বাড়িতে থাকতেন। আমার বাবা তাঁদের এ বাড়িতে নিয়ে আসেন। আর এ বাড়িতেই ময়লি দিদির স্বামী মারা যান। জাপানিদের হাতে বন্দী হবার আগে, তিনি হাবিলদার পদে প্রমোশন পেয়েছিলেন। বন্দী না হলে, বা অসুস্থ না হয়ে পড়লে, তিনি হয় তো ক্যাপটেন বা মেজর হতেন। কিন্তু শেষ জীবন পর্যন্ত অসুস্থ সৈনিক হিসেবে, তিনি কেবল পেনশনই পেতেন।"

ব্যানার্জি কাকা প্রথমে লক্ষ্য করেননি, তাঁর কথা শুনতে শুনতে ময়লি দিদির মুখটি বিষণ্ণ হয়ে উঠছিল। আর ওঁর চোখ দুটি উঠেছিল ছলছলিয়ে। গোগোলের মা সেটা দেখতে পেয়ে বলেছিলেন, "ব্যানার্জি ঠাকুরপো, এসব কথা আমরা পরে শুনবো। এখন থাক।"

ব্যানার্জি কাকা তখনই ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছিলেন। আর লজ্জা পেয়ে, দুঃখের সঙ্গে ময়লি দিদিকে নেপালি ভাষায় কিছু বলেছিলেন। ময়লি দিদি তাড়াতাড়ি চোখ মুছে হেসে নেপালি ভাষায় কিছু বলে, গোগোলকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "মাস্টার চ্যাটার্জিকে আমি একটা কথাও বলিনি। তোমার জরুর খুব ভুখ লেগেছে। চলো, ভেতরে চলো। খাবার সব তৈরি আছে। কেবল গরম জলে সাবান দিয়ে হাত ধোবে, আর ডাইনিং টেবিলে খেতে বসে যাবে।"

"এই হলেন আমাদের ময়লি দিদি!" ব্যানার্জি কাকা হেসে বাংলায় বলেছিলেন, "ময়লি দিদির দুটি মেয়ে আছে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। তার নাম দুর্গা। আর ছোট মেয়ের নাম মায়া। তার এখনো বিয়ে হয়নি। তবে হতে আর বেশিদিন দেরিও নেই। দুর্গা আর মায়াও ময়লি দিদির সঙ্গে থাকে। দুর্গার বর প্রতাপ বাহাদুর বাজারের এক শেঠ মারোয়াড়ির দোকানে চাকরি করে। দুর্গার একটি ছেলে আছে। মায়া গত বছর স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে। ময়লি দিদিই আমাদের বাড়ির কেয়ারটেকার। তিনিই সব দেখাশোনা করেন। ময়লি দিদি না থাকলে, আমাদের আর দার্জিলিং আসা হতো না।"

ময়লি দিদি বাংলা কথা সবই বুঝতে পারছিলেন। লজ্জা পেয়ে হেসে বাংলায় বলেছিলেন, "ব্যানার্জি ভাইয়া যাই বলুক, তিনি আমাকে প্রতি মাসে যা টাকা পাঠান, তাতেই আমি সব করতে পারি। আমার সংসার আর মেয়েদের সব তিনিই দেখাশোনা করেন। চলুন, ভেতরে চলুন। আপনারা নীচে থেকে ওপরে এসেছেন। বাইরের রোদটা ভালো লাগলেও, বেশি ঠান্ডা এখন লাগাবেন না। আপনাদের গরম জল রাখা আছে। আমি বলব, আজ আপনারা চান করবেন না। হঠাৎ ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। বেলাও হয়েছে। এখন দুপুরের খাবারের সময়। আপনারা সবাই সকালবেলা কলকাতা থেকে কতটুকু আর খেয়ে এসেছেন?"

গোগোল বলে উঠল, "আমরা গাড়িতে আসতে আসতে কমলালেবু, বিস্কুট, চকোলেট আর গরম দুধ খেয়েছি।"

ব্যানার্জি কাকা কাচের দরজার কাছে গিয়ে, দু ধাপ সিঁড়ির ওপর উঠেছিলেন। কাচের বড় দরজাটা খুলে ধরে বলেছিলেন, "সবাই ভেতরে চলে এস।"

গোগোল তখন মাকে জিজ্ঞেস করছিল, "মা, ময়লি দিদিকে আমি কী বলে ডাকব?"

"তুমি আমাকে ময়লি দিদি বলেই ডাকবে নিজেই হেসে বলেছিলেন, আর গোগোলের গাল টিপে দিয়ে আদর করে বলেছিলেন, "তুমি খুব মিষ্টি ছেলে। দিদিরা তোমাকে পেলে খুব আদর করবে।"

বাবা আর মা যখন কাচের দরজার ভেতরে ঢুকছিলেন, গোগোলের চোখে পড়ল, খুবই জরাজীর্ণ খাকি রঙের মিলিটারি পোশাক পরা, রোগা আর লম্বা একজন দরজার অন্য পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথায় একটা নেপালি কালো টুপি। চোখের কোল বসা লোকটির চোখ দুটো যেন বড় বেশি জ্বলজ্বল করছিল। নাকের নীচে, দুদিকে ঝুলে-পড়া একজোড়া গোঁফ। জরাজীর্ণ মিলিটারি পোশাকের মধ্যে খাকি রঙেরই ছেঁড়াখোঁড়া একটা

ফুল হাতা উলের সোয়েটার পরা। হাতার বাইরে হাত দুটো ময়লা আর শীর্ণ। তার মুখেও যেন নানা রকমের হিজিবিজি দাগ। কিন্তু তার চোখ দুটো ভীষণ জ্বলজ্বল করছিল। গোগোলের দিকে একবার তাকাতেই ও চোখ সরিয়ে নিল। ওই চোখে চোখ রাখা যায় না।

ব্যানার্জি কাকার ঠিক উল্টো দিকে, সিঁড়ির ওপরে, দরজার এক পাশে লোকটি দাঁড়িয়েছিল। দেখছিল ব্যানার্জি কাকাকে। কিন্তু ব্যানার্জি কাকা যেন তাকে দেখতেই পাচ্ছিলেন না। অথবা ইচ্ছে করেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে দেখছিলেন না। তিনি না হয় দেখছিলেন না। বাবা মাও কি লোকটিকে দেখতে পেলেন না? আশ্চর্য! জলজ্যান্ত একটা লোক দরজার অন্য পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা মাকে জ্বলজ্বলে চোখে দেখছে। অথচ বাবা মা একবারও লোকটির দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলেন না। দরজার ভেতরে ঢুকে গেলেন। তারপর ময়লি আন্টি গোগোলের হাত ধরে, সিঁড়ির ধাপে উঠলেন। লোকটির সঙ্গে গোগোলের চোখাচোখি হল। আর আশ্চর্য! সেই জ্বলজ্বলে চোখের চাউনিটা কেমন নরম হয়ে গেল। ঝুলে পড়া গোঁফের দু পাশে একটু হাসি ফুটল। অথচ ময়লি আন্টি সেদিকে ফিরেও তাকালেন না। যেন দেখতেই পাচ্ছেন না। গোগোলকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। তারপরেই ভেতরে ঢুকে এলেন ব্যানার্জি কাকা। কাঁচের বড় পাল্লা দরজাটা বন্ধ করে, ভেতর থেকে ছিটকিনি এঁটে দিলেন। গোগোল পেছন ফিরে দেখল, দরজার বাইরে, তখনও লোকটি দাঁড়িয়ে, কাচের দরজা দিয়ে ভেতরের দিকে দেখছে।

পেছন ফিরে দেখতে গিয়ে, কাঠের মেঝের ওপর পাতা কার্পেটে গোগোল জুতো পায়ে হোঁচট খেল। ময়লি আন্টি বললেন, "আহা, লাগে নাই তো? কার্পেটের এ জায়গাটা একটু উঁচু হয়ে আছে।"

গোগোল তখনও পেছন ফিরে তাকিয়ে লোকটিকে দেখছিল। সেও গোগোলকেই দেখছিল। ময়লি আন্টি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি বাইরে কী দেখছ? কিছু ফেলে এসেছ?"

"না!" গোগোল মাথা নেড়ে দরজার বাইরে চোখের ইশারায় দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ওখানে দরজার বাইরে এক পাশে, ও লোকটি কে দাঁড়িয়ে আছে?"

ময়লি আন্টির অবাক চোখে যেন হঠাৎ একটা ঝিলিক খেলে গেল। তিনি মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকালেন। বললেন, "কই, ওখানে কেউ নেই তো! তুমি কাকে দেখতে পেলে?"

"খুব পুরোন খাকি রঙের ছেঁড়া মিলিটারি পোশাক পরা একটি লোক তো এখনো দরজার এক পাশে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে।" গোগোল বলল, "মাথায় কালো নেপালি টুপি, পায়ের জুতো ময়লা ছেঁড়া। হাত দুটোও ময়লা আর রোগা। মুখে একজোড়া গোঁফ। সে আমার দিকে তাকিয়ে একটু একটু হাসছে। আপনারা কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছেন না?"

ময়লি আন্টি যেন কেবল অবাক হলেন না। হঠাৎ খুব রেগে উঠে, চোখ পাকিয়ে দরজার দিকে তাকালেন। গোগোল আরও অবাক হয়ে দেখল, লোকটি মুখ ফিরিয়ে, আস্তে আস্তে সিঁড়ি থেকে নেমে, চত্বরের ওপর দিয়ে হেঁটে, বাঁ দিকে রেলিংয়ের ওপাশের আড়ালে চলে গেল। ময়লি আন্টি কিন্তু বললেন, "না তো গোগোল, কেউ ওখানে দাঁড়িয়ে নেই। আমরা কেউ দেখতে পাই নি। নতুন জায়গায় বেড়াতে এসে তুমি বোধহয় ভুল দেখেছ। চল, ভেতরে চল।"

গোগোল কিছুই বলতে পারল না। কিন্তু ভুল যে ও দেখেনি, সে বিষয়ে ওর নিজের মনে কোনো সন্দেহই ছিল না। ও দেখল, বাবা মা ব্যানার্জি কাকা সেখানে নেই। কার্পেটের তিন দিকে সোফা সেট। মাঝখানে একটা গোল সেন্টার টেবিল। সামনেই একটা কাঠের পার্টিশন। ডান দিকের কাঠের দেয়ালে রয়েছে কাচের পাল্লা বন্ধ একটা বড় জানালা। সামনের পার্টিশনের এক পাশে একটি কাচের পাল্লার দরজা। সেই দরজা দিয়ে

ভেতরে একটা বড় ঘর দেখা যাচ্ছে। ময়লি আন্টি গোগোলের হাত ধরে, সেই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। কাঠের মেঝের খানিকটা অংশ খোলা। বাকি সবই কার্পেট পাতা। সেখানে মস্ত বড় ডাইনিং টেবিল। টেবিলের ওপর সাদা ধবধবে কাপড় পাতা। দুটো ছোট ফুলদানিতে ফুল। দুটো বড় পেতলের মোমদানিতে, দু' ইঞ্চি ডায়ামিটারের মোটা গোলাপি রঙের বড় মোমবাতি রয়েছে। এখন জ্বলছে না। কোনো আলো জ্বলছে না। ডান দিকেই কাঠের দেয়ালে, বড় বড় দুটো কাচের পাল্লার জানালা দিয়ে দিনের আলো এসে পড়েছে। সেই আলোতেই সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ডাইনিং টেবিলে, চারটি প্লেটের ওপর, একটি করে চাইনিজ সুপের বউল রয়েছে। পাশেই রয়েছে চীনা মাটির সুপ খাবার চামচ। প্রত্যেক প্লেটের বাঁ দিকে একটি করে ছোট প্লেট। তার প্রত্যেকটার পাশে, ছোট বড় দুটো স্টিলের চামচে, কাঁটা, গেলাসে সাদা কাপড়ের ন্যাপকিন, ত্রিভুজ করে দাঁড় করানো রয়েছে। গোগোলের মনে হল, কলকাতার নাম-করা বড় হোটেলে যে-রকম খাবার টেবিল সাজানো থাকে, এই ডাইনিং টেবিলও সেইরকম করে সাজানো রয়েছে। কিন্তু--

ময়লি আন্টি টেবিল পেরিয়ে, গোগোলের হাত ধরে সামনে এগিয়ে গেলেন। গোগোল আবার পেছন ফিরে একবার দেখল। না, এবার এ ঘরের কাচের দরজা দিয়ে, পাশের ঘরের কাঁচের দরজার দিয়ে, পাশের ঘরের কাচের দরজার সিঁড়ির কাছে কারওকে দেখতে পেল না। ময়লি আন্টি টেবিলটা পেরিয়ে কয়েক গজ গিয়ে, বাঁ দিকের একটি দরজার সামনে দাঁড়ালেন। কাঁচের দরজার ভেতরে পর্দা টাঙানো। ভেতরটা দেখা যায় না। ময়লি আন্টি দরজার পাল্লা ঠেলে খুলে দিলেন। গোগোলের চোখের সামনে ভেসে উঠল, মস্ত একটা সুন্দর সাজানো ঘর। ঘরে প্রচুর আলো। ময়লি আন্টি গোগোলকে নিয়ে, এক ধাপ কাঠের সিঁড়ি উঠে, সেই ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। গোগোল দেখল, সামনেই একটা বিরাট ঝকঝকে খাটের ওপর সুন্দর বিছানা। মা সেই বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসেছেন। বাবা একপাশের কাঠের দেয়ালের দিকে, লম্বা ড্রেসিং টেবিলের সামনে, দুটো বড় বড়, সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো আয়নার সামনে চেয়ারে বসে সিগারেট খাচ্ছেন। কিন্তু ঘরে এত আলো এল কোথা থেকে? বাইরের দিকে কোনো কাচের দেয়াল বা জানালা কিছুই নেই। তারপরেই ওর চোখ পড়ল, ঘরের মাথার দিকে! কাঠের ছাদের ঠিক মাঝখানে স্কাই লাইট। যেন রোদের আলো সেই স্কাই লাইটের কাচে পড়ে, গোটা ঘরটা আলোয় ভরে দিয়েছে।

ঘরটা অনেক বড় বলেই, আর একটা খাটও ছিল পেছন দিকে। সেই খাটেও রয়েছে পরিষ্কার বেডশীট ঢাকা দেওয়া বিছানা। দুটো খাটের মাঝখানে রয়েছে একটি গোল পাথরের টেবিল। টেবিল ঘিরে চারটি খুব সুন্দর চেয়ার। চেয়ারগুলোর আকৃতি, বেগুনি রঙের গদি, সব মিলিয়ে খুবই রাজকীয়। বাবা যেদিকে বসেছিলেন, সেদিকে কাঠের দেয়ালের সঙ্গে লম্বা ড্রেসিং টেবিল জোড়া, অনেকটা তাকের মতো। তার ওপর পাতা আছে লিনেনের সাদা কাপড়। সেখানে রয়েছে, যতো রাজ্যের নাম-করা দেশি বিদেশি কোল্ড ক্রিম, পাউডার, অডিকলনের দারুণ সুন্দর দেখতে নানা আকারের শিশি বোতল। আর ওদিকের কাঠের দেয়ালে, কুঁচিয়ে সেলাই করা লিনেনের পর্দা টাঙানো। ঘরের বাকি দেয়াল ঝকঝকে পালিশ করা কাঠের। ঘরের কাঠের মেঝের ওপর সুন্দর কাজ করা পশমের কার্পেট। কাঠের দেয়ালের দু দিকে দুটো তেল রঙের ছবি। কোট-টাই পরা, গোঁফওয়ালা, চোখে চশমা ফরসা এক ভদ্রলোক। আর একটা ছবি এক মহিলার। মাথায় সামান্য ঘোমটা টানা, কাঁধের কাছে জড়োয়ার ব্রোচ আটকানো। দেখতে তিনি সুন্দরী। অনেকটা আগের কালের বড়লোক মহিলাদের মতো তাঁর সাজগোজ। ডান দিকের কাঠের দেয়ালে, একটি খোলা দরজা দেখা যাচ্ছে। সেই ঘরে স্কাই লাইটের দিনের আলো নেই। আলো জ্বলচে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ময়লি আন্টি গোগোলকে নিয়ে

সোজা এগিয়ে গেলেন, ঘরের শেষ দিকে। সেখানে দু ধাপ সিঁড়ির ওপর একটি বন্ধ দরজা ছিল। ময়লি আন্টি দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল। তিনি দু ধাপ সিঁড়ি উঠে, ভেতরের অন্ধকারে গেলেন। সুইচ টিপে আলো জ্বেলে ডাকলেন, "মাস্টার গোগোল, অন্দরে এস।"

গোগোল ভেতরে ঢুকল। দেখেই বোঝা গেল, বাথরুম। বাথরুমের মেঝে শান বাঁধানো। গিজারের লাল আলোটা জ্বলছে। একদিকে রয়েছে মস্ত বড় বাথটাব। ঠান্ডা গরম জলের লাইন আর শাওয়ার। বাথরুমের পাশেই রয়েছে আর একটা ঘর। খোলা দরজা দিয়ে, ভেতরে চোখে পড়ে কমোড। পাশের ঘরটার দেয়ালে রয়েছে একটা জানালা, যার কাঁচের পাল্লা বন্ধ। ময়লি আন্টি বেসিনের দুদিকের কলের মুখের একটা দেখিয়ে বললেন, "এটা খুললে গরম জল পাবে। এই রয়েছে সাবান। আর ওইখানে রয়েছে তোয়ালে। তুমি হাত মুখ ধুয়ে এস। আমি বাবা মাকে তাড়া দিচ্ছি। গরম গরম খাবার খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম কর।"

ময়লি আন্টি বাথরুম থেকে বেরিয়ে গেলেন। গোগোল গরম জলের কল খুলে, সাবান দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিল। কিন্তু সেই ঝরঝরে মিলিটারি পোশাক করা, মাথায় নেপালি টুপি লম্বা রোগা গোঁফওয়ালা মূর্তিটার কথা ভুলতে পারছে না। তোয়ালে দিয়ে, হাত মুখ মুছতে মুছতে ভাবল, কেবল ময়লি আন্টিই যে লোকটিকে দেখতে পান নি, তা নয়। বাবা মা ব্যানার্জি কাকা, কেউই তাঁকে দেখতে পান নি। অথচ লোকটি যে দরজার অন্য পাশে দাঁড়িয়েছিল, গোগোলের মনে কোনো সন্দেহ নেই।

ও বাথরুম থেকে বেরোবার আগেই, মা এলেন। বললেন, "তোমার হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।" বলে গোগোল বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল।

মা পেছন থেকে বললেন, "গোগোল, খুব সাবধান। শীত বেশ ভালোই আছে। ঠান্ডা লাগিও না যেন।"

"আচ্ছা।" গোগোল বলল।

মা বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিলেন। বাবা তখনও চেয়ারে বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন। বাঁ দিকের খোলা দরজা দিয়ে ব্যানার্জি কাকা বেরিয়ে এলেন। কলকাতা থেকে তিনি এসেছিলেন স্যুটেড বুটেড হয়ে। এখন দেখা গেল, পাজামা পাঞ্জাবির ওপরে মোটা একটা শাল চাপিয়েছেন। পায়ে মোজা আর স্যান্ডেল। গোগোলকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার হাত মুখ ধোয়া হয়ে গেছে? বেশ, ভালো। এবার খেতে যাবার আগে, পাশের ঘরটাও দেখে এস। খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করে, তারপরে দোতলাটা দেখবে।"

গোগোল পাশের ঘরে ঢুকল। এ ঘরটাও বেশ বড়। খাট রয়েছে একটাই। কাঠের চকচকে দেয়াল। এ ঘরেও রয়েছে একটা টেবিল ঘিরে কয়েকটা গদী-আঁটা সুন্দর রাজকীয় চেয়ার। একদিকে ড্রেসিং টেবিল আর কাঠের দেয়াল জুড়ে বড় আয়না। টেবিলের ওপর প্রসাধন সামগ্রী। পেছন দিকের বন্ধ দরজাটা দেখে মনে হল, ওটা এ ঘরের বাথরুম। তবে দুদিকের দেয়ালের ঢাকা পর্দার ফাঁকে কাচের অংশ চোখে পড়ল। গোগোল এগিয়ে গিয়ে, একদিকের দেয়ালের পর্দা সরাতেই, বড় কাচের বন্ধ জানালা দেখা গেল। জানালার বাইরে, বাঁ দিকে, কাঠের একটা আলাদা ছোট বাড়ি। বাড়ির সামনে একটা কাঠের ছোট একফালি বারান্দা। কোনো রেলিং নেই। বারান্দার নীচে ছোট একটুখানি খোলা জায়গা। শান বাঁধানো, পরিষ্কার। সেই খোলা জায়গার একধারে রেলিং, যেখান দিয়ে নীচের রাস্তা, গাড়িঘোড়া, ওপারের পাহাড় আর ছবির মতো বাড়িগুলো দেখা যায়।

কাঠের একফালি সরু বারান্দায় শাড়ি পরা একজন মহিলা। বয়স তার অনেক কম। গায়ে কোনো গরম জামা আছে বলে মনে হল না। বেণী ঝুলছে পিঠে। কোলে একটি বছর খানেক বয়সের ছেলে। তার গায়ে পুরো হাত আর গলা ঢাকা উলের সোয়েটার, মাথায়ও উলের বোনা টুপি। গাল দুটো টুকটুকে লাল। পুতুলের

মতো দেখতে। আর একজন, তার বয়স আরও কম, লম্বা ফ্রকের মতো পোশাক গায়ে। কিন্তু গায়ে কোনো গরম জামা দেখা যাচ্ছে না। এর মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, আর খোলা। বয়স সতর আঠারর বেশি হবে না। গোগোলের মনে হল, এরাই বোধহয় ময়লি আন্টির দুই মেয়ে, দুর্গা আর মায়া। দুজনের কেউ গোগোলের দিকে দেখছে না। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

গোগোল পর্দা টেনে দিয়ে, ঘরের আর একপাশে গেল। সেদিককার পর্দা খুলতেই, বন্ধ কাচের জানালা দিয়ে বাইরে বাগান দেখা গেল। বেশ কিছু গোলাপ গাছ রয়েছে, কিন্তু ফুল নেই। চন্দ্রমল্লিকার টব রয়েছে বেশ কয়েকটা। ক্যাকটাসও রয়েছে নানা রকম। তা ছাড়া আছে সবজি বাগান। সবজি বাগানে ফুল আর বাঁধাকপি, টমাটো, আর ধনেপাতা রয়েছে। দেখলেই বোঝা যায়, বাগানটির নিয়মিত যত্ন করা হয়।

গোগোল পর্দাটা ফেলে সরে আসবার মুহূর্তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, সেই জরাজীর্ণ মিলিটারি পোশাক পরা, নেপালি টুপি মাথায়, পায়ে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতো, ময়লা শীর্ণ হাত। আর গোঁফওয়ালা রোগা লম্বা লোকটি, ডান দিকের কাঠের বাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। ডান দিকের কাঠের বাড়িটায় ময়লি আন্টি থাকেন। গোগোল একটু আগেই, বাড়িটার অন্যদিকের বারান্দায় ময়লি আন্টির দুই মেয়েকে কথা বলতে দেখেছে। এ লোকটি কি ময়লি আন্টির বাড়ির ভেতর থেকেই বেরিয়ে এল?

গোগোল ভাবতেই, লোকটি বাগানের দিকে নেমে, গোগোলের দিকে তাকাল। সে যে বাইরে থেকে, কাচের মধ্যে গোগোলকে দেখতে পাচ্ছে, কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, গোগোল পর্দা ফেলে সরে আসবে ভেবেও, সরে আসতে পারল না। লোকটা যেন ওকে দেখা দেবার জন্যই কাঠের বাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। গোগোলের চোখে চোখ রেখে সে অপলক তাকিয়ে আছে। কিন্তু এখন তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে না। অবশ্য তার চোখ দুটো বড় বেশি সাদা। এখন সে গোগোলের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে। আর যেন সামান্য ঘাড় নাড়িয়ে, কিছু একটা ইশারা করছে। তার ঝুলেপড়া গোঁফ জোড়া নড়ে উঠল কি না, বোঝা গেল না। অথচ মনে হল, সে যেন ঠোঁট নেড়ে কিছু বলল।

বাগানের সীমানার বাইরে, সাদা আর নীল রঙের একটা ছোট কাঠের বাড়ি। বাগানের পেছনে যেমন জমি ওপর দিকে উঠে গেছে, সাদা নীল বাড়িটার পেছন দিকেও তেমনি উঁচুতে জমি উঠেছে। সেখানে রয়েছে কয়েকটা পাইন আর নানা রকমের ছোট ছোট গাছপালা। যার মাঝখান দিয়ে, সরু আঁকাবাঁকা রাস্তা ওপরে উঠেছে। সেই সরু পথে দু একজন মহিলা-পুরুষকে ওঠা-নামা করতে দেখা যাচ্ছে।

গোগোল দেখল সাদা নীল বাড়িটার সীমানার লতানে বেড়ার সামনে এসে দুটি নেপালি ছেলে দাঁড়াল। তারা এদিকের বাগানের দিকেই মুখ করে দাঁড়িয়ে, হাসতে হাসতে নিজেদের মধ্যে কী কথাবার্তা বলছে। গোগোলের থেকে দুজনেই বয়সে একটু ছোট হবে। মিলিটারি পোশাক পরা লোকটি একবার মুখ ফিরিয়ে ছেলে দুটির দিকে দেখল। তাদের মধ্যে দূরত্ব ছ' সাত গজের বেশি নয়। অথচ ছেলে দুটি যে লোকটিকে দেখতে পাচ্ছে, তা মোটেই মনে হচ্ছে না। ওরা বাগানের দিকে খুব করে কথা বলছে, হাসছে। অথচ একবারও লোকটার দিকে ফিরে দেখছে না। অবশ্য ওরা এই জানলায়, পর্দার পাশে গোগোলকেও দেখছে না। নিজেদের কথা আর হাসিতেই ব্যস্ত।

"কী ব্যাপার গোগোল, তুমি এখনো জানালায় দাঁড়িয়ে কী দেখছ?" পেছনে মায়ের গলা শোনা গেল, "ময়লি দিদি আমাদের গরম গরম খাবার বেড়ে দেবার জন্য তৈরি। তাড়াতাড়ি এস।"

গোগোল ডাকল, "মা শোন, এখানে একটু এস।"

মা গোগোলের কাছে এগিয়ে গেলেন। গোগোল বন্ধ কাচের জানালা থেকে পর্দার আর একটু সরিয়ে বলল, "তুমি বাইরে, বাগানে কী দেখতে পাচ্ছ বল তো?"

"কী আবার দেখব?" মা অবাক হয়ে বললেন, "ফুলগাছ, ক্যাকটাস, কপি, টমাটো, এই সব?"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "আর কিছু দেখতে পাচ্ছ না?"

"পাচ্ছি বই কি।" মা বললেন, "ওপাশের বাড়ির বেড়ার ধারে দুটি ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, কেন বল তো?"

গোগোলের চোখ তখন সেই লোকটির দিকে। লোকটিও গোগোলের দিকেই তাকিয়েছিল। গোগোল তবু মাকে জিজ্ঞেস করল, "ওই ছেলে দুটো ছাড়া, আর কারুকে দেখতে পাচ্ছ না?"

"না তো?" মা অবাক হয়ে বললেন, "আবার কাকে দেখব? ওখানে তো আর কেউ নেই। তুমি দেখতে পাচ্ছ নাকি?"

গোগোল থতমত খেয়ে গেল। ও মাকে সত্যি কথাটা বলতে পারল না। কারণ, জানে মা বিশ্বাস তো করবেনই না। আর সমস্ত ব্যাপারটাকে আজেবাজে আজগুবি কিছু ভেবে, গোগোলকে একা আশেপাশে কোথাও একটু বেরোতেও দেবেন না। ও উড়িয়ে দেবার মতো করে বলল, "না, দেখতে পাচ্ছিনে। মনে হচ্ছিল, একটা অন্য লোককে যেন হঠাৎ দেখলাম।"

"ভুল দেখেছ।" মা বললেন, "ওই সব গাছপালার মধ্যে, লোকজন মাঝে মাঝে পাহাড়ের পথে ওঠা-নামা করছে। তাদেরই দেখেছ। আর কাকেই বা দেখতে পাবে। এখন তাড়াতাড়ি খেতে চল।"

গোগোলের চোখে চোখ রেখে, লোকটা তখনও একইভাবে দাঁড়িয়েছিল। সে যেন ঘরের ভেতরে মায়ের কথা শুনতে পেল, আর ঘাড় ঝাঁকিয়ে, গোগোলকে চলে যেতে ইশারা করল। গোগোল তাতে আরও অবাক হল। মা আবার তাড়া লাগাবার আগেই ও পর্দাটা টেনে দিল। মায়ের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পাশের ঘরে আসতেই গোগোল চিনা খাবারের গন্ধ পেল। গন্ধ পেয়েই, অনেকক্ষণের চাপাপড়া খিদেটা যেন চনমনিয়ে উঠল। বাবা আর ব্যানার্জি কাকা পাশের ঘরে ছিলেন না। গোগোল মায়ের সঙ্গে বাইরে গেল। বাবা আর ব্যানার্জি কাকা টেবিলের কাছে বসে পড়েছিলেন। ময়লি আন্টি একপাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল তাঁর ছোট মেয়ে মায়া। ময়লি আন্টি মায়াকে মা আর গোগোলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর এগিয়ে এলেন টেবিলের সামনে।

টেবিলের ওপরে তখন ঢাকা দেওয়া বেশ কয়েকটি চিনা মাটির পাত্র এসে গেছে। ময়লি আন্টি একটির ঢাকনা খুলতেই ধোঁয়া বেরোল। সেটাতে ছিল চিকেন ক্লিয়ার স্যুপ। সয়াবিন সস আর চিলি সসের পাত্র সামনে রাখা ছিল। মায়া কাচের গেলাসগুলো থেকে ন্যাপকিন তুলে, গেলাসে গেলাসে জলের জাগ থেকে জল ঢেলে দিল। ময়লি আন্টি একটা স্যুপ তোলার বড় হাতায় করে স্যুপের পাত্র ঘেঁটে, প্লেটের ওপর উল্টে ঢেলে দিলেন। গোগোল চটপট স্যুপের বউলে খানিকটা সয়াবিন সস ঢেলে দিল। মা বলে উঠলেন, "গোগোল, তুমি চিলি সস খেও না।"

গোগোল জানত, মা ওকে চিলি সস খেতে বারণ করবেনই। ও একটু নুন আর গোলমরিচ মিশিয়ে নিল। ন্যাপকিনটা কোলের ওপর পেতে, চামচে করে স্যুপ মুখে দিয়ে, সামনের দিকে তাকাল। সেই হিলকার্ট রোডের লোকজন যানবাহনের ভিড়। ওপারের পাহাড়ের গাছপালা বাড়িঘর। ওদিকে কোথাও সেই লোকটি নেই।

স্যুপ খেতে খেতে গোগোল একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। তারপরে, ওর প্রিয় চিকেন ফ্রায়েড, চিনা ভাত, টক মিষ্টি দিয়ে তৈরি কর্ন, নরম করে ভাজা হাড়বিহীন ভেড়ার চিনা রান্না মাংস, আর মিষ্টি, সবই ও বেশ পেট ভরে গেল। কিন্তু সেই লোকটার চিন্তা ওর মাথা থেকে দূর হল না।

বাবা, মা, ব্যানার্জি কাকা, সবাই ময়লি আন্টির চীনা রান্নার খুব প্রশংসা করলেন। ময়লি আন্টি মায়াকে দেখিয়ে বললেন, "আমি একা করি নাই। মায়াও আমার সঙ্গে খাবার বানিয়েছে।"

মায়ার মুখ এমনিতেই অনেকটা লাল। সকলের প্রশংসা শুনে আরও লাল হয়ে উঠল। খাওয়ার শেষে, ব্যানার্জি কাকা বললেন, "দার্জিলিংয়ে দুপুরে ঘুমোলে আমার শরীর ম্যাজম্যাজ করে। তবে আজ আমরা সবাই একটু শুয়ে বিশ্রাম করব। বিকেলে চা খেয়ে, দোতলাটা তোমাদের সবাইকে দেখাব।"

ব্যানার্জি কাকা নেপালি ভাষায় ময়লি আন্টিকে কিছু বললেন। তারপরে গোগোল সামনের ঘরে, বড় খাটে বাবার কাছে শুয়ে পড়ল। খাওয়ার পরে শীতটা যেন বেড়ে গেল। মা অন্য খাটে শুলেন। ব্যানার্জি কাকা চলে গেলেন পাশের ঘরে। খানিকক্ষণ পরেই গোগোল টের পেল, বাবা মা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। ওর মোটেই ঘুম পাচ্ছে না। ওর চোখের সামনে ভাসছে সেই লোকটির চেহারা। কী আশ্চর্য! কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। অথচ গোগোল কেমন করে দেখছে? ও জীবনে এমন ঘটনা কখনও দেখে নি। একেই কি ভূত বলে? নাকি সেই অদৃশ্য মানুষের গল্পই সত্যি? তাই যদি হবে, অদৃশ্য মানুষকে গোগোল একা দেখবে কেন? তাকে তো কেউ দেখতে পায় না। অথচ সে নানান কান্ড করে।

গোগোল ঘুমন্ত বাবাকে একবার দেখে, আস্তে আস্তে খাট থেকে নামল। দরজা খুলে ঘরের বাইরে গেল। ডাইনিং টেবিল আবার ফিটফাট সাজানো হয়ে গেছে। সামনে বন্ধ কাচের জানালা দিয়ে বাইরের সেই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। ও কাচের দরজা খুলে, পাশের বসবার ঘরে গেল। তাকাল বাইরের ঢোকবার বড় কাঁচের দরজার দিকে। সেখানে এখন কেউ নেই। চত্বরের একপাশে, রোদে মোটর গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ বসবার ঘরের কাঠের দেয়ালে, একটি খোলা দরজা চোখে পড়ল। দরজার ওপরে সেই মিলিটারি পোশাক পরা লোকটি দাঁড়িয়ে, গোগোলের দিকে তাকিয়ে দেখছে। গোগোল শুধু চমকে উঠল না, ওর গাটা কেমন ছমছম করে উঠল। এখন কাছে-পিঠে কেউ নেই। শুধু ও আর লোকটা। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ভেতরে একটা অন্ধকার ঘর। এর আগে দুবার লোকটিকে ঘরের বাইরে দেখেছে, এখন ঘরের ভেতরে! লোকটার সাদা অপলক চোখের কালো মণি দুটো স্থির। গোগোলের দিকে তাকিয়ে যেন গোঁফের ফাঁকে হাসছে। গোগোল সাহস করে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কে?"

লোকটি কোনো জবাব দিল না। কিন্তু তার ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল। তারপর সে গোগোলকে অবাক করে দিয়ে, বাইরে যাবার কাচের দরজাটা না খুলেই, বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। কাঠের মেঝের ওপর তার ছেঁড়া ক্যামবিসের জুতোর কোনো শব্দ হল না। কিন্তু দরজা না খুলে কাচ ফুঁড়ে সে বেরিয়ে গেল কেমন করে? বাইরে গিয়েও লোকটি, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে গোগোলের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। আর মনে হল, যেন ঘাড় ঝাঁকিয়ে সে গোগোলকে ইশরায় ডাকল।

গোগোল দু পা এগোতেই পেছন থেকে ময়লি আন্টির গলা শোনা গেল, "কোথায় যাচ্ছ মাস্টার গোগোল? তুমি শোওনি?"

গোগোল দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, "আমার ঘুম আসছিল না। তাই বেরিয়ে এসেছি।"

ময়লি আন্টি বললেন, "আর একটু পরেই তোমার বাবা মা উঠে পড়বেন। আমি চা তৈয়ার করব। তারপরে তোমরা ম্যালে বেড়াতে যাবে। এখন তুমি ঘরেই যাও।"

"আচ্ছা ময়লি আন্টি, বাইরের দরজার ধারে যে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে, সে কে?" গোগোল জিজ্ঞেস করল।

ময়লি আন্টি বাইরের দরজার দিকে তাকিয়ে, ভুরু কুঁচকে দেখলেন। অবাক হয়ে বললেন, "কই, দরজার ধারে কেউ দাঁড়িয়ে নেই তো?"

"কিন্তু আমি যে দেখতে পাচ্ছি।"

"কি রকম লোক দেখতে পাচ্ছ বল তো?"

"খুব পুরোন ছেঁড়াখোঁড়া মিলিটারি পোশাক, খাঁকি রঙেরই ছিঁড়ে যাওয়া উলের সোয়েটার, মাথায় নেপালি টুপি, পায়ে ছেঁড়া ক্যামবিসের জুতো।"

ময়লি আন্টি যতই শুনছিলেন, তাঁর চোখ দুটো বড় হয়ে উঠছিল। আর একটা আতঙ্ক ফুটে উঠছিল তাঁর দৃষ্টিতে। বাইরের কাচের দরজার দিকে তাকিয়ে, তিনি আবার গোগোলের দিকে তাকিয়ে ওর একটা হাত ধরলেন। বললেন, "ও কিছু নয়। তুমি ভুল দেখছ। চলো ঘরের ভেতরে চলো।"

ময়লি আন্টি গোগোলকে প্রায় টেনে নিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, "আরে, এ ঘরের দরজাটা আবার কে খুলল? এটা তো খোলা ছিল না।"

ময়লি আন্টি খোলা দরজাটা টেনে, বাইরে থেকে শিকল টেনে দিয়ে বললেন, "তুমি যে-রকম লোকের কথা বললে, সে-রকম কোন লোক ঘরের অন্দরে ঢুকতেই পারে না। তুমি ভুল দেখেছ। এখন চলো, ঘরে গিয়ে আধ ঘণ্টা শুয়ে থাকো। আমি এবার চায়ের জল গরম করতে যাচ্ছি।"

ময়লি আন্টি গোগোলকে হাত ধরে খাবার ঘরে নিয়ে গেলেন। গোগোল পিছন ফিরে দেখল, লোকটি তখনও বড় কাচের দরজার বাইরে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ তাকে যদি আর কেউ দেখতে না পায়, গোগোল কি করেই বা সবাইকে বিশ্বাস করাবে। আর লোকটা গোগোলকেই কেন শুধু দেখা দিচ্ছে? এর মধ্যেই বা কি রহস্য আছে?

গোগোল দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। দেখল বাবা মা উঠে বসেছেন। ব্যানার্জি কাকাও এঘরে এসেছেন। গল্প করছেন তিন জনেই। গোগোলকে দেখে ব্যানার্জি কাকা জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় গেছলে গোগোল? ময়লি দিদির ঘরে নাকি?"

"না। খাবার ঘর থেকে বাইরের দিকে দেখছিলাম।" গোগোল বলল। লোকটার কথা বলার ইচ্ছা থাকলেও বলতে পারল না। কারণ কেউ বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু গোগোলই বা নিশ্চিন্ত থাকবে কেমন করে? ওর চোখের সামনে ময়লি আন্টির মুখটা ভেসে উঠল। লোকটির কথা শুনতে শুনতে, তাঁর চোখে মুখে কেমন একটা আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠেছিল। গোগোলের মনে হয়েছিল, উনি কিছু জানেন। অথচ ভুল বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। রহস্যটা কি অজানাই থেকে যাবে?

চা পর্বের পরে, সবাই যাবার জন্য তৈরি হলেন। মা গোগোলকে সোয়েটারের ওপর কোট পরে নিতে বললেন। বাইরে যাবার আগে, খাবার ঘরের পাশের বসবার ঘরের বন্ধ দরজাটা ব্যানার্জি কাকা খুললেন। ভেতরে গিয়ে আলো জ্বাললেন। বাবা মায়ের সঙ্গে গোগোল ঢুকল। দেখল, এ ঘরটা প্রায় ফাঁকা। সাজানো গোছানোও তেমন নেই। এ ঘরেরই বাঁ দিকে, দোতলায় ওঠার কাঠের সিঁড়ি রয়েছে।

ময়লি আন্টি এ সময়ে এসে পড়লেন। ব্যানার্জি কাকা সবাইকে ডেকে, ওপরে নিয়ে গেলেন। ওপরটা আরও সুন্দর। সমস্ত কাচের জানালায় ঢাকা দেওয়া মোটা পর্দাগুলো ময়লি আন্টি সরিয়ে দিলেন। বিকালের উজ্জ্বল আলো তখনও ছিল। ওপর তলার কাঠের ঘর বারান্দা সবই কার্পেট দিয়ে মোড়া। তিনটে পাশাপাশি

ঘর সাজানো। কিন্তু মাঝের ঘরের পেছনের দরজা খুলতেই দেখা গেল, সেখানে রয়েছে অর্ধগোলাকার বারান্দা। অনেকটা গাড়ি-বারান্দার মতো। তার সবটাই কাচের জানালা। ময়লি আন্টি মোটা পর্দা সরিয়ে দিলেন। একটি গোল টেবিল ও খানকয়েক চেয়ার সেখানে রয়েছে। এ বারান্দা থেকে ম্যালের কাছাকাছি ওপরের দিক এবং আকাশ দেখা যায়।

ব্যানার্জি কাকা সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। মাঝখানের ঘরের বাইরে, বসবার ঘরের একটা আরামকেদারা দেখিয়ে বললেন, "আমার ঠাকুর্দার নেমন্তন্নে, রবীন্দ্রনাথ একদিন বিকেলে চা খেতে এসে এই আরামদারাটায় বসেছিলেন। আর বলা হয়, এ বাড়িতে বিবেকানন্দও এসে কয়েকদিন ছিলেন। তাঁর স্মৃতি রাখা আছে পাশের ঘরে।"

পাশের ঘরে দেখা গেল, গুল বাঘের ছালের ওপরে ছোট গদির বিছানা, বালিশ, আর পাশ বালিশ। ওখানে বিবেকানন্দ থাকতেন। সামনের দরজা খোলা থাকত। তা ছাড়া, ব্যানার্জি কাকার ঠাকুর্দার আমলে, দার্জিলিংয়ের অনেক সাহেবসুবোরাও আসতেন। ঠাকুর্দা বা বাবা ছুটি পেলেই দার্জিলিংয়ে চলে আসতেন। ব্যানার্জি কাকার বছরে একবারও হয়তো আসা হয়ে ওঠে না। তবে তিনি বাবা-ঠাকুর্দার প্রিয় বাড়িটি সযত্নে রক্ষা করছেন। তার জন্য, ময়লি আন্টির কাছেই তিনি কৃতজ্ঞ। কারণ, কেবল টাকা দিয়েই মানুষের কাছ থেকে কাজ পাওয়া যায় না। ময়লি আন্টি বাড়িটিকে সযত্নে রক্ষা করেন।

দোতলা দেখা হয়ে যাবার পরে, গোগোল সকলের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। দেখল, সেই লোকটি সকলের আগে আগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। অথচ কাঠের সিঁড়িতে কোনো শব্দ হচ্ছে না। ব্যানার্জি কাকা বললেন, "দাঁড়ালে কেন গোগোল? ওপরে আরও কিছু দেখবে?"

"না না।" গোগোল সিঁড়ি দিয়ে নামতে আরম্ভ করল। লোকটি গোগোলের আগে আগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। গোগোল তার পেছনে পেছনে নেমে এল। লোকটি ঘরের বাইরে, বসবার ঘর থেকে কাচের দরজা ঠেলে, বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। গোগোল কী করবে, বুঝতে পারছিল না। পেছন থেকে ব্যানার্জি কাকা বললেন, "চল গোগোল, বাইরে চল। আমরা গাড়িতে চেপে, ম্যালের কাছে যাব। গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গায় গাড়ি পার্ক করে, আমরা ম্যালে বেড়াতে যাব।"

গোগোল ব্যানার্জি কাকার কথা ভালো শুনতে পেল না। ও দরজার দিকে এগিয়ে গেল। লোকটি দরজার বাইরে, পাশে সরে দাঁড়াল। তার অপলক চোখের দৃষ্টি এখন জ্বলজ্বল করছে। সে গোগোলকে দেখছিল না। গোগোল দরজা টেনে খুলে বাইরে বেরোল। লোকটা এবার ওর দিকে তাকাল। অমনি জ্বলজ্বলে ভাবটাও কেটে গেল। শান্ত আর করুণ হয় উঠল। ব্যানার্জি কাকা পেছন থেকে বললেন, "আবার এখানে দাঁড়ালে কেন গোগোল?"

গোগোল সিঁড়ির দু ধাপ নেমে চত্বরে এগিয়ে গেল। পেছন ফিরে দেখল, লোকটি সবাইকে দেখছে। কিন্তু তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছেন না। ময়লি আন্টি এগিয়ে গিয়ে, গেট খুলে দিলেন। বাগডোগরা থেকে যে-গাড়িটি এসেছিল, আর যে ড্রাইভার চালিয়ে নিয়ে এসেছিল, তার কোনো বদল হয়নি। ড্রাইভার গাড়ির এঞ্জিন চালিয়ে, এগিয়ে নিয়ে এল। ব্যানার্জি কাকা সামনের আসনে ড্রাইভারের পাশে বসলেন। গোগোল বাবা মার সঙ্গে পেছনে, দরজার পাশে বসল। দেখল, লোকটি ওদের গাড়ির দিকেই। কিন্তু হঠাৎ সে গাড়ির কাছে দৌড়ে এল। আর দরজাটা খুলে ফেলল। গোগোল প্রায় চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল।

ব্যানার্জি কাকা অবাক হয়ে বললেন, "আরে, দরজাটা ভালো করে বন্ধ করি নি দেখছি। হঠাৎ খুলে গেল।" বলে দরজাটা আবার টেনে, লক করে দিলেন।

গোগোল দেখল, ব্যানার্জি কাকা আর ড্রাইভারের মাঝখানে লোকটা সামনে মুখ করে বসে আছে। কী মতলব লোকটার? কোনো বিপদ-আপদ ঘটবে না তো? গাড়ি তখন হাসপাতালের সামনে দিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠছে। একমাত্র গোগোল ছাড়া কেউ দেখতে পাচ্ছে না, গাড়িতে আর একটা লোক। আশ্চর্য! ব্যানার্জি কাকা বা ড্রাইভারও টের পাচ্ছেন না, তাঁদের মাঝখানে একজন বসে আছে!

ম্যালে যাবার রাস্তার যেখানে গাড়ি পার্ক করা হয়, ড্রাইভার সেখানে গাড়ি দাঁড় করাল। ব্যানার্জি কাকা সামনের সিট থেকে নামলেন। গোগোল বাবা মায়ের সঙ্গে নামল। তখনও রোদ আছে। রাস্তায় বেশ ভিড়। গোগোলের চোখ লোকটার ওপর। দেখল, লোকটা গাড়ি থেকে নেমে, গোগোলের দিকে তাকাল। এবার স্পষ্টই হাসল।

ব্যানার্জি কাকার সঙ্গে তখন বাবা মা ম্যালের দিকে হেঁটে চলেছেন। লোকটি হাত তুলে গোগোলকে ইশারায় সেদিকে দেখাল। বাবাও তখন পেছন ফিরে ডাকলেন, "গোগোল এস, ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

গোগোল তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। লোকটা গোগোলদের ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে গেল। রাস্তায় নানা রকমের, নানা পোশাকের লোকজন। দু পাশে কত রকমের দোকান। গোগোলের কোনোদিকে খেয়াল নেই। ও দেখছে লোকটি আগে আগে চলেছে, আর মাঝে মাঝেই পেছন ফিরে গোগোলদের দেখছে।

গোগোলরা ম্যালে এসে পৌঁছুল। যেদিকে লেবংয়ের ঘোড়দৌড়ের মাঠ আর চা বাগান, সেদিকে দেখতে গিয়ে, কয়েক মুহূর্তের জন্য গোগোল লোকটির কথা ভুলে গেল। বিশেষ করে, পরিষ্কার আকাশে, তখন কাঞ্চনজংঘা দেখা যাচ্ছে। এ সময়ে ময়লি আন্টির মেয়ে মায়াকে কাছে দেখা গেল। ব্যানার্জি কাকা মায়ার সঙ্গে নেপালি ভাষায় কিছু কথা বললেন। মায়াও বলল। গোগোলের দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপরই ওর চোখ পড়ল সেই লোকটির দিকে। সে এই প্রথম হাতছানি দিয়ে গোগোলকে ডাকল।

গোগোল দেখল, বাবা মা ব্যানার্জি কাকা গল্প করছেন। মায়াদিদিও দুই নেপালি মেয়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে বেড়াচ্ছে। গোগোল লোকটির দিকে এগিয়ে গেল। লোকটা লেবংয়ের দিকে, রেলিং ঘেরা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল। আর মাঝে মাঝে গোগোলকে পেছন ফিরে দেখতে লাগল।

গোগোল দেখল, রোদ চলে যাচ্ছে। সন্ধ্যা নেমে আসছে। ও থেমে পড়ল। লোকটাও থেমে পড়ে, গোগোলকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। এমন ভাবে ডাকল, যেন বলতে চায়, "কোনো ভয় নেই। আমার সঙ্গে এস, তোমাকে একটা জিনিস দেখাব।"

গোগোল কৌতূহল দমন করতে পারল না। ও লোকটার পেছন পেছনে চলতে লাগল। বিকেলের আলো খুব তাড়াতাড়ি যেন ম্যাজিকের মতো নিভে গিয়ে, সন্ধ্যা নেমে এল। বাতি জ্বলে উঠতে আরম্ভ করেছে রাস্তার ধারে। নীচের বাড়িগুলিতে। চা বাগানের কোথাও কোথাও। লোকটি যেখানে দাঁড়াল, সেখানে রেলিং শেষ হয়ে ডান দিকে নীচে রাস্তা নেমে গেছে। লোকটা সেই দিকেই চলল। যাবার আগে গোগোলকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। গোগোলের আশপাশ দিয়ে যারা যাতায়াত করছে, তাদের ও দেখতে পেল না। তারাও সব অচেনা লোক। কেউ গোগোলকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখল না।

লোকটি ক্রমেই, আঁকাবাঁকা পথে নীচে নেমে চলেছে। অন্ধকার নেমে এল। এদিকটায় আলোও বিশেষ নেই! কিন্তু গোগোল লোকটিকে দেখতে পাচ্ছে। সে হাতছানি দিচ্ছে। আর গোগোল দমবন্ধ কৌতূহল নিয়ে তার পেছনে পেছনে চলেছে।

এক সময়ে মনে হল, লোকটি একটি পুরোন অন্ধকার বাড়ির, পোড়া লনে গিয়ে দাঁড়াল। গোগোলও সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। লোকটি হাত তুলে সামনে দেখিয়ে, এগিয়ে গেল। গোগোলও গেল। লোকটি লনের নীচে যাবার একটা কাঁচা সরু পথে নামতে লাগল। গোগোলও নেমে চলল।

এমন সময় গোগোলের কানে এল, ক্ষীণস্বরে ওকে যেন কেউ ডাকছে। কিন্তু তখন আর ও থামতে পারছে না। লোকটির পেছনে পেছনে যেন স্বপ্নের ঘোরে চলেছে। ক্রমেই ওর নাম ধরে ডাকা মেয়েলি স্বর কাছে এগিয়ে আসছে যেন। লোকটি পেছন ফিরে গোগোলকে দেখছে, আর পাহাড়ি সরু পথে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে। কাছে-পিঠে আর একটাও বাড়ি নেই।

গোগোল দেখল, লোকটি এবার এক জায়গায় থামল। পেছন ফিরে গোগোলকে ওপরের দিকে হাত তুলে দেখাল। গোগোল দেখল, একটা ছোট চূড়া। লোকটি হাতছানি দিয়ে সেই চূড়োয় উঠতে লাগল। গোগোলও উঠতে লাগল। চূড়োয় উঠে, লোকটি একবার থামল। তারপর হাতছানি দিয়ে, সোজা সামনের দিকে এগিয়ে গেল। গোগোলও গেল। কিন্তু লোকটি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। আর কে যেন পেছন থেকে চিৎকার করে গোগোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, জড়িয়ে ধরল। চিৎকার করে ডাকল, "গোগোল, আর এক পাও বাড়িও না। বহু নীচে পাথরের ওপরে পড়ে যাবে।"

গোগোল দেখল, সেই লোকটি নেই। আর ওর সামনে একটা বিশাল অন্ধকারের শূন্যতা ছাড়া কিছুই নেই। কিন্তু কে ওকে জড়িয়ে ধরেছে? এই সময়েই টর্চ লাইটের আলো পড়ল ওদের গায়ে। ব্যানার্জি কাকার গলা শোনা গেল, "মায়া মায়া।"

গোগোলের কাছ থেকে চিৎকার করে বলল, "আংকল, গোগোল মিলেছে। তবে আর কয়েক সেকেন্ড গেলে, ওকে আর পাওয়া যেত না।"

টর্চের আলো দু-তিনটে এগিয়ে আসতে লাগল। মায়া জিজ্ঞেস করল, "গোগোল, তুমি এখানে কেন এসেছ?"

"আমাকে একজন ডেকে এনেছিল। তাকে আমি ছাড়া কেউ দেখতে পায় নি।"

"সে দেখতে কেমন?"

গোগোল লোকটার চেহারা আর পোশাকের বর্ণনা দিল। মায়া কেঁদে উঠে বলল, "তুমি তো আমার বাবার কথা বলছ। তিনি তো চার-পাঁচ বছর আগে মারা গেছেন!"

"মারা গেছেন?"

"হ্যাঁ, অসুখে ভুগে ভুগে মনের দুঃখে আমার বাবা এখান থেকেই নীচে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মারা গেছলেন। উঃ, আমি না এসে পড়লে তুমিও নিশ্চয় নীচে গিয়ে পড়তে।"

গোগোলের শিরদাঁড়াটা এবার কেঁপে উঠল। ও ভয়ে মায়াদিদিকে জড়িয়ে ধরল। টর্চের আলোয় পথ দেখে, ব্যানার্জি কাকা, মা আর বাবা তখন এগিয়ে আসছেন।

সেবারে তারপরেও যে-কদিন গোগোল দার্জিলিংয়ে ছিল, ওকে সব সময়েই চোখে চোখে রাখা হতো। কিন্তু আশ্চর্য! সেই অন্যের চোখে অদৃশ্য লোকটি আর গোগোলকে দেখা দেয় নি।

ডনের ভূত

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সেদিন সকালে চোখ বুজে একটা রোমাঞ্চকর গল্পের প্লট ভাবছি এবং টেবিলে কাগজ কলমও তৈরি, হঠাৎ পিঠে চিমটি কাটল কেউ। 'উঃ' বলে আর্তনাদ করে পিছনে ঘুরে দেখি, ডন দাঁড়িয়ে আছে। মুখে ধূর্ত এবং ক্রূর হাসির ছাপ। খাপ্পা হয়ে বললুম, 'হতভাগা ছেলে! দিলি তো মুডটা নষ্ট করে?'

ডন আমার ভাগনে। মহা ধড়িবাজ বিচ্ছু ছেলে! তার মাথায় একটা কিছু খেয়াল চাপলেই হল। তাই নিয়ে উঠে পড়ে লাগবে।

তা লাগুক, আপত্তি নেই। কিন্তু প্রতিটি খেয়ালের সঙ্গে আমাকে যে জড়াবে, এটাই হল সমস্যা। ওইরকম নিঃশব্দ হাসিটি হেসে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে দেখে বললুম, 'বুঝেছি। টাকা চাই। কিন্তু এবার কী কিনবি? রামুর গাধা, না সোঁদরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার?'

ডন ফিক করে হেসে অমায়িক ভদ্রলোক হল। বলল, 'না মামা! ভূত কিনব।'

অবাক হয়ে বললুম, 'ভূত কিনবি? কোথায় পাবি ভূত? কে বেচবে?'

ডন কাছে ঘেঁষে এল। টেবিলের কলমটা খপ করে তুলে নিয়ে বলল, 'মোটে তিন টাকা দাম, মামা! যদি এক্ষুণি তিনটে টাকা না দাও, কী হবে বুঝতে পারছ?'

বিপদ ঘনিয়েছে দেখে ঝটপট বললুম, 'বুঝেছি, বুঝেছি। লক্ষ্মী ছেলের মতো আগে আমার কথার জবাব দে। ঠিক ঠিক জবাব হলে তিনটে টাকাই পাবি।'

'শীগগির বলো মামা! দেরি হলে গোগো ভূতটা কিনে ফেলবে।'

'ভূত কার কাছে কিনবি?'

'মোনাদার কাছে।'

'মোনাদা মানে সেই মোনা বুজরুক? মোনা ভূত কোথায় পেল?'

'ঝিলের ধারে বাঁশের জঙ্গলে ফাঁদ পেতে ধরেছে।'

'তুই দেখে এলি?'

'হুঁউ। শিশির ভেতর ভরে রেখেছে। মোনাদা বলল, শিশির দাম পঞ্চাশ পয়সা আর ভূতটার দাম দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা। ইজ ইকোয়্যাল টু তিন টাকা।'

হাসতে হাসতে বললাম, 'বাঃ! অ্যাদ্দিনে অঙ্কে তোর মাথা খুলেছে দেখছি। তা ভূতটা দেখতে কী রকম?'

ডন চটে গেল। 'ভূত কি চোখে দেখা যায়? কৈ, শিগগির টাকা দাও।' বলে সে কলমটা টেবিলে ঠোকার ভঙ্গি করল।

দামি কলম। তাই বেগতিক দেখে তিনটে টাকা দিলুম। টাকা পেয়ে কলমটা রেখে ডন গুলতির বেগে উধাও হয়ে গেল।

গল্পের মুডটা চটে গেল। মনে মনে মোনার মুণ্ডুপাত করতে থাকলুম। মোনা থাকে ঝিলের ধারে পুরোন শিবমন্দিরের কাছে। মোনার মাথায় জটা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পরনে গেরুয়া একফালি কাপড়, কপালে লাল তিলক আঁকা। সে নাকি তন্ত্রসাধনা করে। কারও কিছু চুরি গেলে মোনা নাকি মন্ত্রের জোরে চোর ধরিয়ে দেয়। অসুখবিসুখের চিকিৎসাও করে। তবে কথাটা হল, 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।' কাজেই যারা ওকে বিশ্বাস করে, তারা বলে মোনা ওঝা এবং যারা করে না, তারা বলে মোনা বুজরুক। তবে লোকটাকে যত ভয়ঙ্কর দেখাক, ওপরপাটির দুটো দাঁত নেই বলে যখনই হাসে, তাকে ভালমানুষ মনে হয়। কিন্তু মোনা বুজরুক ডনকে ঠকাবে এবং ডন একটা ছোট ছেলে। এতেই মোনার ওপর খাপ্পা হয়েছিলুম। বড়রা বোকামি করে ঠকে ছোটদের সরলতার সুযোগ নিয়ে ঠকানো ভারি অন্যায়। ভাবলুম, মোনাকে গিয়ে খুব বকে দিয়ে আসি।

কিন্তু ডন তক্ষুণি ফিরে এল। তার হাতে একটা ছোট্ট শিশি। শিশিটা দেখিয়ে সে খুশি খুশি মুখে বলল, 'গোগো টাকা নিয়ে গেছল মামা! মোনাদা ওকে দিল না। বলল, আগে আমি কিনব বলেছিলুম, তাই আমাকেই সে বেচবে।'

সে টেবিলে শিশিটা রাখল। শিশিটার ভেতর কিছু নেই। বললাম, 'হ্যাঁরে, এর ভেতর যে ভূত আছে, কী করে বুঝলি?'

ডন বলল, 'আছে মামা! মোনাদা বলল, সন্ধ্যা হলেই দেখতে পাওয়া যাবে।'

'ঠিক আছে। তা এই যে তুই ভূত পুষবি, ভূতকে কিছু খেতে দিতে হবে না?'

'হবে বৈকি! ভূতেরা দুধ আর মাছ খায়। তা-ই খাওয়াব।'

'কিন্তু খাওয়াতে গেলে যদি ভূতটা পালিয়ে যায়?'

'মোনাদা বলল, আবার ফাঁদ পেতে ধরে দেবে।' ডন চাপা গলায় বলল, 'আমি একটু দুধ নিয়ে আসি মামা! তুমি যেন ছিপি খুলো না।'

ডন দুধ আনতে গেল। আমি সেই সুযোগে শিশির ছিপি খুলে ব্যাপারটা পরীক্ষা করার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। ছিপিটা খুলতেই বোঁটকা গন্ধ টের পেলুম। তারপর দেখি, জানালা গলিয়ে একটা কালো বেড়াল লাফ দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

ব্যাপারটা এমন আকস্মিক যে, চমকে উঠেছিলুম। কালো বেড়াল তো এঘরে দেখিনি। বাড়িতেও কোনো কালো বেড়াল নেই। ওটা এল কোত্থেকে? কখন এ ঘরে ঢুকল? ছিপি খোলার পরই বা জানালা গলিয়ে পালাল কেন?

হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম একেবারে। সেই সময় ডনের আবির্ভাব হল। তার হাতে দুধের বাটি। সে দেখতে পেল আমি ছিপি খুলেছি। অমনি চিক্কুর ছাড়ল, 'মামা! মামা! ছিপি খুললে কেন?' তারপরই তার চোখ গেল জানালার ওধারে পাঁচিলের দিকে। পাঁচিলে কালো বেড়ালটা বসে কেমন জ্বলজ্বলে চোখে এদিকে তাকিয়ে আছে।

ডন দুধের বাটি রেখে আমার হাত থেকে শিশি আর ছিপি ছিনিয়ে নিয়ে বেরুল। পাঁচিলের কাছে যেতেই বেড়ালটা লাফ দিয়ে ওধারে নামল। ডনকেও বেরিয়ে যেতে দেখলুম।

এবার জানি কী কী ঘটবে। আমার কাগজ ছিঁড়ে কুচিকুচি হবে। কলমটা গুঁড়ো হয়ে যাবে। আমিও প্রচুর চিমটি খাব। ডনের নখ যা ধারাল!

কাগজ-কলম সামলে রেখে আমিও পালানো ভূতটা ধরার ছল করে বেরিয়ে গেলুম। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডন এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছে। সে কিছু বলার আগেই বললুম, 'চল! আবার মোনা বুজরুকের কাছে যাই। সে ফাঁদ পেতে পালিয়ে যাওয়া ভূতটাকে ধরুক। টাকা যা লাগে, দেব।'

ডন কাঁদো কাঁদো মুখে এগোল। খেলার মাঠ পেরিয়ে ঝিল। ঝিলের ধারে শিবমন্দিরের ওখানে ঘন জঙ্গল। সেখানে পৌঁছে ডাকলুম,

'মোনা আছ নাকি! ও মোনা!'

সাড়া এল জঙ্গলের দিক থেকে, 'কে ডাকে গো?'

মোনার গলার স্বর কেমন অদ্ভুতুড়ে। বললুম, 'শিগগির একবার এস তো এদিকে। একটা কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে।'

জঙ্গলের ভেতর থেকে মোনার জবাব এল। 'আমিও এক কেলেঙ্কারিতে পড়েছি। জায়গা ছেড়ে নড়ি কী করে?'

অগত্যা মন্দিরের পেছনে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকলুম। বললুম, 'তুমি আছটা কোথায়?'

'শেওড়াগাছের ভেতরে।'

শেওড়াগাছটা দেখা যাচ্ছিল। সেখানে গিয়ে দেখলুম, মোনা গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছে ডালপালার ভেতরে। আমাদের দেখে সে ফিক করে হাসল। ওপর পাটির দুটো দাঁত নেই। তাই তার হাসিটা বেশ অমায়িক দেখাল। বললুম, 'ওখানে বসে তুমি কী করছ মোনা?'

মোনা বলল, 'ফাঁদে একটা পেত্নী পড়েছে। শিশিতে ঢোকাতে পারছি না।' বলেই সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই যাঃ! পালিয়ে গেল।'

সে শেওড়াগাছ থেকে নেমে এল। হাতে একই সাইজের একটা শিশি। হাসি চেপে বললুম, 'তোমার ফাঁদ থেকে পেত্নী পালিয়ে গেল। আর ডনের শিশি থেকে ভূতটা পালিয়ে গেছে। শিগগির একটা ব্যবস্থা করো।'

মোনা বলে উঠল, 'এঃ হে হে হে! সর্বনাশ! সর্বনাশ! খোকাবাবুকে তখন পইপই করে বলেছিলুম, সাবধান!'

ডন কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, 'মামা শিশির ছিপি খুলেছিল।'

মোনা বলল, 'ছোটবাবু! কাজটা ঠিক করেননি। খোকাবাবুকে যে ভূতটা বেচেছিলুম, সে খুব ঘড়েল ভূত। সে কে জানেন? পাঁচু। সেই পাঁচু চোর।'

পাঁচু নামে একটা চোর ছিল আমার ছেলেবেলায়। পাকা সিঁদেল চোর। কত বাঘা বাঘা দারোগাবাবুকে সে নাকাল করে ছাড়ত। বুড়ো হয়ে সে মারা পড়েছিল অসুখ-বিসুখে। যাই হোক, ডনের সামনে মোনার সঙ্গে ভূত নিয়ে তর্ক করা ঠিক নয়। বললুম, 'যাই হোক, পাঁচুকে আবার ফাঁদ পেতে ধরে দাও।'

ডন বলল, 'মোনাদা! পাঁচু কালো বেড়াল সেজে পালিয়ে গেছে।'

'কালো বেড়াল?' মোনা ভুরু কুঁচকে বলল। 'হুঁ, তা হলে তো বড় কেলেঙ্কারি হল। ঠিক আছে, দেখছি। ইঁদুর ধরে ফাঁদে আটকাতে হবে ওকে। এখন ইঁদুর পাই কোথায় দেখি। কৈ, খোকাবাবু! শিশিটা দাও।'

শিশিটা নিয়ে সে জঙ্গলের ভেতরে চলে গেল। গেল তো গেলই। আমরা ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। একসময় হঠাৎ 'ম্যাঁও' শব্দ শুনে দেখি, ঝোপের ভেতর থেকে সেই কালো বেড়ালটা মুখ বের করেছে। দেখামাত্র ডন

তাকে তাড়া করে গেল। তারপর আর তাকেও দেখতে পেলুম না। কিছুক্ষণ তাকে ডাকাডাকি করে মন্দিরের পেছনে বটতলায় গিয়ে বসে পড়লুম।

সেই সময় দেখলুম, একটু দূরে বাঁশবনের ভেতর গুঁড়ি মেরে মোনা বাঘের মতো চুপিচুপি কতকটা চারপায়ে হাঁটছে। তারপর সে লাফ দিয়ে যেন কিছু ধরল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, 'এবার? এবার বাছাধন যাবে কোথায়? খোকাবাবু! ছোটবাবু! চলে আসুন!'

সাড়া দিয়ে বললুম, 'এই যে এখানে আছি।'

মোনা আমাকে দেখতে পেয়ে অদ্ভুত শব্দে হাসতে হাসতে চলে এল। ছিপিআঁটা শিশিটা আমাকে দিয়ে বলল, 'এবার কিন্তু সাবধান। তা খোকাবাবু কোথায় গেল?'

বললুম, 'কালো বেড়ালটা দেখতে পেয়ে ছুটে গেছে। তুমি খুঁজে দেখ তো ওকে।'

মোনা বলল, 'সর্বনাশ! আপনি খোকাবাবুকে যেতে দিলেন? পেত্নীটার পাল্লায় পড়লে বিপদ হবে যে!'

সে হন্তদন্ত হয়ে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল। একটু পরে ডনকে নিয়ে সে ফিরে এল। বলল, 'আর একটু হলেই পেত্নী খোকাবাবুকে ধরে ফেলত। পেত্নীদের স্বভাব জানেন তো? ছেলেপুলে দেখলেই কুড়মুড় করে মুণ্ডু চিবিয়ে খায়। আপনারা শিগগির চলে যান। আর একটা কথা, পাঁচুকে তেরাত্তির উপোস করিয়ে রাখবেন।'

ডন এসেই আমার হাত থেকে শিশিটা ছিনিয়ে নিল।...

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হলে ভাল হতো। কিন্তু তা হল না।

রাত্তিরে ডন আমার কাছে শোয়। শিশিটা বালিশের পাশে রেখে সে ঘুমোচ্ছিল। আমি ঘুমুতে পারছিলুম না। সেই বেড়ালটার কথা ভাবছিলুম। আরও ভাবছিলুম পাঁচু চোরের কথা। পাঁচুকে একটু একটু মনে পড়ে। লম্বা সিড়িঙে চেহারার লোক ছিল সে। মাথার চুল খুঁটিয়ে ছাঁটা। কেউ যাতে চুল ধরে তাকে বেকায়দায় না ফেলে, সেইজন্য ওইরকম করে চুল ছাঁটত। শুনেছি, দুঁদে দারোগা বঙ্কুবিহারী ধাড়া তাকে কিছুটা শায়েস্তা করেছিলেন। কিন্তু কথাটা হল, পাঁচু মরে কালো বেড়াল সেজে বেড়ায় কেন?

হুঁ, ওই যে কথায় বলে, 'স্বভাব যায় না মলে।' মরার পরও পাঁচু বেড়াল সেজে দুধ-মাছ-মাংস চুরি করে বেড়াচ্ছে না তো? তবে তার আগে দেখা দরকার, সত্যি ডনের শিশি থেকে কালো বেড়াল বেরোয় কিনা। দুধ-মাছ-মাংস চুরি করে বেড়াচ্ছে না তো? তবে তার আগে দেখা দরকার, সত্যি ডনের শিশি থেকে কালো বেড়াল বেরোয় কিনা। রাত্তিরটা ছিল জ্যোৎস্নার। জানালার বাইরে ঝকঝকে জ্যোৎস্না। চুপিচুপি বালিশের পাশ থেকে শিশিটা নিয়ে ছিপি খুলে দিলুম।

অমনি দেখলুম, ফের একটা কালো বেড়াল জানালা গলিয়ে পালিয়ে গেল। এবার আমার শরীর শিউরে উঠল। তক্ষুণি ছিপি এঁটে শিশিটা যথাস্থানে রেখে জানালায় উঁকি দিলুম। বেড়ালটা পাঁচিলে বসে নীল জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তক্ষুণি জানালা থেকে সরে এসে শুয়ে পড়লুম। নাহ! সত্যি তাহলে ভূত আছে।

সকালে উঠে শুনি, রান্নাঘরে চোর ঢুকেছিল। সকালের চায়ের দুধ রাখা ছিল। এক ফোঁটা নেই। ন'টার আগে গয়লা দুধ দিতে আসে না। জামাইবাবু—ডনের বাবা খুব বকাবকি করলেন দিদিকে। দিদি নাকি রান্নাঘরের দরজা-জানালা আটকাতে ভুলে গিয়েছিল। শুধু দুধ নয়, ফ্রিজ থেকে মাছ-মাংস সব নিপাত্তা হয়ে গেছে।

ডন ছোটছেলে। সে এ নিয়ে মাথা ঘামাল না। কারণ শিশির ভেতর বন্দী পাঁচুকে তেরাত্তির উপোস রাখতে হবে। কাজেই সে ছিপি খোলেনি। সে তো জানে না, আমি ছিপি খুলে এই কেলেঙ্কারিটি বাঁধিয়েছি। ডন ভেবেছে, পাঁচু শিশির ভেতর রয়ে গেছে।

চুপিচুপি মোনার ডেরায় চলে গেলুম।

মোনা আজ তার ডেরাতে বসে চোখ বুজে জপতপ করছিল। ডেরা মানে মন্দিরের লাগোয়া একটা পুরোন জরাজীর্ণ একতলা ঘর। জপ শেষ হলে সে চোখ খুলে আমাকে দেখে বলল, 'পাঁচু পালায়নি তো ছোটবাবু?'

'হ্যাঁ! পালিয়েছে। আসলে আমারই বোকামি। মোনা, ডন এখনও জানে না আমি ফের ছিপি খুলেছিলুম।' বলে যা ঘটেছে, তার মোটামুটি একটা বিবরণ দিলুম।

মোনা গুম হয়ে গেল। একটু পরে বলল, 'ঠিক আছে। তিনটে টাকা ছাড়ুন ছোটবাবু। আমি পেত্নীটাকে শিশিতে ভরেছি। আপনি বরং এই শিশিটা আপনার ভাগনেবাবাজির শিশির সঙ্গে পালটে ফেলুন। খালি শিশিটা আমাকে ফেরত দিন। আর হ্যাঁ, পেত্নী কিন্তু দুধ-মাছ-মাংস খায় না। একটু শুকনো গোবর আর হাড়গোড় এর খাদ্য।'

তিনটে টাকা গচ্চা গেল। কী আর করা যাবে? বাড়ি ফিরে এক সুযোগে ডনের শিশিটা নিয়ে এই শিশিটা রেখে দিলুম ডনের পড়ার টেবিলে। ডন তখন স্কুলে।

মোনাকে খালি শিশিটা ফেরত দিয়ে এলুম। মোনা আমাকে সাবধান করে দিল।

সে-রাত্তিরে আবার আমার মনে হল, সত্যি এই শিশির ভেতর পেত্নী আছে কিনা পরীক্ষা করা দরকার। ডন যথারীতি বালিশের পাশে শিশি রেখে ঘুমোচ্ছিল। শিশিটা চুপিচুপি তুলে নিয়ে জানালার গ্রিলের ফাঁকে রেখে ছিপি খুলে দিলুম।

তারপর যা দেখলুম, ভয়ে বুকটা ধড়াস করে উঠল।

জ্যোৎস্নায় একটা সাদা কাপড়পরা মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে।

সাহস করে টর্চ বের করলুম। টর্চ জ্বালতেই মূর্তিটা আর দেখতে পেলুম না। চুপিচুপি দরজা খুলে বেরিয়ে গিয়ে দেখি, সাদা মূর্তিটা বাগানের একটা আম গাছে উঠে গেল। একটু পরে আমগাছের ডগায় তাকে দেখা গেল। সেখান থেকে উঁচু একটা বাজপড়া ন্যাড়া তালগাছের মাথায় গিয়ে বসল। তারপর প্যাঁচার ডাক শুনলুম, 'ক্র্যাও! ক্র্যও! ক্র্যও!'

টর্চের আলো ফেললুম। কিন্তু কিচ্ছু দেখতে পেলুম না। আমার চোখের ভুল নয় তো? টর্চ নেভালে সাদা কাপড়পরা পেত্নীকে দিব্যি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আলো জ্বালিয়ে পাচ্ছি না। ব্যাপারটা ভালভাবে পরীক্ষা করা দরকার।

বাজপড়া তালগাছটার কাছে গিয়ে ফের টর্চ জ্বাললুম। কিন্তু জ্বলল না। সুইচ বিগড়ে গেল নাকি? টর্চ নাড়া দিয়ে এবং ব্যাটারি বের করে আবার ঢুকিয়ে অনেক চেষ্টা করলুম, টর্চ আর জ্বলল না। পেত্নীটা বসে ঠ্যাং দোলাচ্ছে।

একটু পরে শুনি, গুনগুন করে মেয়েলি গলায় গান গাইছে সে।

'এমন চাঁদের আলো
মরি যদি সে-ও ভালো
সে-মরণ স্বরগ সমান।।'

এবার আর দাঁড়িয়ে থাকার সাহস হল না। চুপিচুপি ঘরের দিকে পা বাড়ালুম। তারপর এক কাণ্ড ঘটল। ভীষণ ঠান্ডা কী একটা জিনিস আমার মাথার পেছনে চাঁটি মারল। মাথা যেন বরফ হয়ে গেল।

তারপর ঘরের দিকে যত এগোচ্ছি, বারবার তত চাঁটি খাচ্ছি। টলতে টলতে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলুম। শুতে যাচ্ছি, হঠাৎ মনে হল মাথার পেছনদিকে কী একটা আটকে আছে। আঁতকে উঠে হাত দিয়ে সেটা ছাড়িয়ে নিলুম। পেত্নীর হাত ভেবে সেটা মুঠোয় ধরে ঘরের আলো জ্বেলে দিলুম।

কী কাণ্ড! একটা চামচিকে।

চামচিকেটা জানালার বাইরে ছুঁড়ে ফেললুম। কিন্তু এটা না হয় চামচিকে। সাদা কাপড় পরা মূর্তিটা তো পেত্নী।

নাকি পেত্নীটাই চামচিকেটাকে হুকুম দিয়েছে আমার মাথায় চাঁটি মারতে?

কে জানে বাবা! আর ঝুঁকি নিয়ে কাজ নেই। ডন খালি শিশিতে পাঁচুর ভূত আছে ভেবে কিছুদিন শান্ত থাকবে। খামখেয়ালি ছেলে। তারপর এসব ভুলে যাবে। কাজেই আর এ নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই।...

যা ভেবেছিলুম, হলও তা-ই। পরদিন বিকেলে ডন এসে আমার পিঠে চিমটি কাটল। বললুম, 'আমার কী চাই?'

ডন গম্ভীর মুখে বলল, 'পাঁচুর ভূতটা গোগোকে বেচে দিলুম।'

'ভাল করেছিস।'

'মামা, দুটো টাকা দাও।'

'আবার কী কিনবি?'

ডন ফিক করে হেসে বলল, 'ঘুড়ি প্লাস লাটাই প্লাস সুতো। তোমার দুই প্লাস গোগোর তিন। ইজ ইকোয়াল টু পাঁচ।'

দুটো টাকা দিলুম। বললুম, 'হ্যাঁ, ঘুড়ি কেনো। সেটা ভাল। কিন্তু আর যেন ভূত কিনতে যেও না।'

ডন গুলতির বেগে উধাও হয়ে গেল।...

এক ভৌতিক মালগাড়ি আর গার্ড সাহেব

বিমল কর

সে কী আজকের কথা! চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগের ঘটনা। আমার তখন কী বা বয়স; বছর বাইশ। অনেক কষ্টে একটা চাকরি পেয়েছিলাম রেলের। তাও চাকরিটা জুটেছিল যুদ্ধের কল্যাণে। তখন জোর যুদ্ধ চলছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আমাদের এখানে যুদ্ধ না হোক, তোড়জোড়ের অন্ত ছিল না। হাজারে হাজারে মিলিটারি, শয়ে শয়ে ক্যাম্প, যত্রতত্র প্লেনের চোরা ঘাঁটি, রাস্তাঘাটে হামেশাই মিলিটারি ট্রাক আর জিপ চোখে পড়ত।

ওই সময়ে সব জায়গাতেই লোকের চাহিদা হয়েছিল, কলকারখানায়, অফিসে, রেলে। মিলিটারিতে তো বটেই।

চাকরিটা পাবার পর আমাদের মাস তিনেকের এক ট্রেনিং হলো, তারপর আমায় পাঠিয়ে দিল মাকোনা-সাইডিং বলে একটা জায়গায়। সে যে কী ভীষণ জায়গা আজ আর বোঝাতে পারব না। বিহারের একটা জায়গা অবশ্য, মধ্যপ্রদেশের গা ঘেঁষে। কিন্তু জঙ্গলে আর ছোট ছোট পাহাড়ে ভর্তি। ওদিকে মিলিটারিদের এক ছাউনি পড়েছে। শুনেছি গোলা বারুদও মজুত থাকত। ছোট একটা লাইন পেতে মাকোড়া থেকে মাইল দেড় দুই তফাতে ছাউনি গাড়া হয়েছিল।

স্টেশন বলতে দেড় কামরার এক ঘর। মাথার ওপর টিন। ইলেকট্রিক ছিল না। প্লাটফর্ম আর মাটি প্রায় একই সঙ্গে। অবশ্য প্লাটফর্মে মোরাম ছড়ানো ছিল।

স্টেশনের পাশেই ছিল আমার কোয়ার্টার। মানে মাথা গোঁজবার জায়গা। সঙ্গী বলতে এক পোর্টার। তার নাম ছিল হরিয়া। সে ছিল জোয়ান, তাগড়া, টাঙ্গি চালাতে পারত নির্বিবাদে। হরিয়া মানুষ বড় ভাল ছিল। রামভক্ত মানুষ। অবসরে সে আমায় রামজী হনুমানজীর গল্প শোনাত। যেন আমি কিছুই জানি না রাম-সীতার।

হরিয়াকে আমি খুব খাতির করতাম। কেননা সেই আমার ভরসা। হরিয়া না থাকলে খাওয়া বন্ধ। ভাত রুটি, কচুর তরকারি, ভিণ্ডির ঘেঁট, অড়হর ডাল, আমড়ার টক—সবই করত হরিয়া। আহা, তার কী স্বাদ! মাছ মাংস ডিম হরিয়া ছুঁত না। আমারও খাওয়া হত না। তাছাড়া পাবই বা কোথায়! হপ্তায় একদিন করে আমাদের রেশন আসত রেল থেকে। চাল আটা নুন তেল ঘি আলু পিঁয়াজ আর লঙ্কা। ব্যস্।

জায়গাটা যেমনই হোক আমাদের কাজকর্ম প্রায় ছিল না। সারাদিন একটা কি দুটো মালগাড়ি আসত। এসে স্টেশনে থামত। তারপর তিন চারটে করে ওয়াগন্ টেনে নিয়ে ছাউনির দিকে চলে যেত। একসঙ্গে পুরো মালগাড়ি টেনে নিয়ে যেত না কখনো। আর প্রত্যেকটা মালগাড়ি দরজা থাকত সিল করা। ওর মধ্যে কী থাকত জানার উপায় আমাদের ছিল না। বুঝতে পারতাম, গোলাগুলি ধরনের কিছু আছে। হরিয়া তাই বলত।

আমি অবশ্য অতটা ভাবতাম না। মালগাড়ির দরজা 'সিল' করা থাকবে—এ আর নতুন কথা কী! তার ওপর মিলিটারির বরাদ্দ মালগাড়ি। খোলা মালগাড়িতে আমরা যে তারকাঁটা, লোহা লক্কড় দেখেছি।

মালগাড়ি ছাড়া আসত অদ্ভুত এক প্যাসেঞ্জার ট্রেন। জানালাগুলো জাল দিয়ে ঘেরা। ভেতরের শার্সি ধোঁয়াটে রঙের। কিছু দেখা যেত না। দরজায় থাকত রাইফেলধারী মিলিটারি। হপ্তা দু হপ্তা বাদে এই রকম গাড়ি আসত। দু এক মিনিটের জন্যে দাঁড়াত। আমাকে দিয়ে কাগজ সই করাত। তারপর চলে যেত ছাউনির দিকে। গাড়িটা যতক্ষণ স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকত—ততক্ষণে কেমন এক গন্ধ বেরুতো। ওষুধ ওষুধ গন্ধ।

সঙ্গী নেই, সাথী নেই, লোক নেই কথা বলার, একমাত্র হরিয়াই আমার সাথী। দিন আমার বনবাসে কাটতে লাগল। এসেছিলাম গরমকালে, দেখতে দেখতে বর্ষা পেরিয়ে গেল, অতিষ্ট হয়ে উঠলাম। মনে হত পালিয়ে যাই। কিন্তু যাব কেমন করে। চাকরি পাবার লোভে বণ্ড সই করে ফেলেছি। না করলে হয়ত চলত। কিন্তু সাহস হয়নি।

আমার সবচেয়ে খারাপ লাগত মালগাড়ির গার্ডসাহেবগুলোকে। ওরা কেউ মিলিটারি নয়, কিন্তু স্টেশনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে দু চার ঘণ্টা সময় যা কাটাত, কেউ এসে গল্পগুজব পর্যন্ত করত না। ওরা কোন লাট-বেলাট বুঝতাম না। কাজের কথা ছাড়া কোনো কথাই বলত না। আর এটাও বড় আশ্চর্যের কথা, গার্ডগুলো যারা আসত সবই হয় মাদ্রাজী, অ্যাংলোইণ্ডিয়ান, না-হয় গোয়ানিজ ধরনের।

একজন গার্ড শুধু আমায় বলেছিল চুপি চুপি, "কখনো কোনো কথা জানতে চেয়ো না। আমরা মিলিটারি রেল সার্ভিসের লোক। তোমাদের রেলের নয়। আমরা আমাদের ওপরঅলার হুকুমে কাজ করি। আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করবে না। কাউকে কিছু বলবে না।'

সেদিন থেকে আমি খুব সাবধান হয়ে গিয়েছিলাম। সব জিনিসেরই একটা মাত্রা আছে। ওই জঙ্গলে, ওই ভাবে একা পড়ে থাকতে থাকতে ছ'মাসের মধ্যেই আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। পাগল পাগল লাগত নিজেকে। হরিয়াকে বলতাম, "চল পালিয়ে যাই।"

হরিয়া বলত, "আরে বাপ রে বাপ।" বলত, "অমন কাজ করলে হয় ফাটকে ভরে দেবে, না হয়, ফাঁসিতে লটকে দেবে। অমন কাজ করবেন না বাবু!"

ভয় আমার প্রাণেও ছিল। পালাব বললেই তো পালানো যায় না।

সময় কাটাবার জন্যে আমি প্রথমে অনেক বলে কয়ে দু প্যাকেট তাস আনাই। রেশনের চাল ডালের সঙ্গে তাস পাঠিয়ে দেয় এক বন্ধু। পেশেন্স খেলা শুরু করি। তবে কত আর পেশেস খেলা যায়! তাসগুলোয় ময়লা ধরে গেল।

তারপর শুরু করলাম রেলের কাগজে পদ্য লেখা। এগুতে পারলাম না। পদ্য লেখা বড় মেহনতের ব্যাপার।

শেষে পেনসিল আর কাগজ নিয়ে ছবি আঁকতে বসলাম। স্কুলে আমি ছেলেবেলায় ড্রিং ক্লাসে 'কেটলি' এঁকেছিলাম, ড্রয়িং স্যার আমার আঁকা দেখে বেজায় খুশি হয়ে বলেছিলেন, 'বাঃ! বেশ লাউ এঁকেছিস তো! এক কাজ কর—এবার লাউ আঁকতে চেষ্টা কর 'কেটলি' হয়ে যাবে।...তুই সব সময় উল্টে নিবি। তোকে বলল, বেড়াল আঁকতে, তুই বাঘ আঁকা শুরু করবি, দেখবি বেড়াল হয়ে গেছে।

লজ্জায় আমি মরে গিয়েছিলুম সেদিন। তারপর আর ড্রয়িং করতে হাত উঠত না। বন্ধুদের দিয়ে আঁকিয়ে নিতুম।

এতকাল পর আবার ছবি আঁকতে বসে দেখলুম, ভূত-প্রেত দানব-দত্যিটা হাতে এসে যায়। গাছপালা মানুষ আর আসে না।

ছবি আঁকার চেষ্টাও ছেড়ে দিলাম। তবে হিজিবিজি ছাড়তে পারলাম না। কাগজ পেনসিল হাতে থাকলেই কিম্ভুতকিমাকার আঁকা বেরিয়ে আসত।

এই ভাবে শরৎকাল চলে এল। চলে এল না বলে বলা উচিত শরৎকালের মাঝামাঝি হয়ে গেল। ওখানে অবশ্য ধানের ক্ষেত, পুকুর শিউলি গাছ নেই যে চট করে শরৎকালটা চোখে পড়বে। ধানের ক্ষেতে মাথা দুলিয়ে কেউ ডাকার নেই, পুকুর নেই যে শালুকে শাপলায় পুকুর ভরে উঠবে, আর একটাও শিউলি গাছ নেই যে সন্ধে থেকে ফুলের গন্ধে মন আনচান করবে।

ও-সব না থাকলেও, আকাশ আর মেঘ, আর রোদ বলে দিত—শরৎ এসেছে। একটা জায়গায় কিছু কাশফুলও ফুটেছিল।

এই সময় একদিন এক ঘটনা ঘটল।

তখন সন্ধে রাত কি সবেই রাত শুরু হয়েছে, এঞ্জিনের হুইসল শুনতে পেলাম। রাতের দিকে আমাদের ফ্ল্যাগ স্টেশনে ট্রেন আসত না। বারণ ছিল। একদিন শুধু এসেছিল।

কোয়ার্টারে বসে এঞ্জিনের হুইসল শুনে আমি হরিয়াকে বললাম, "তুই কচুর দম বানা, আমি দেখে আসছি।" বলে একটা জামা গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কোয়ার্টার থেকে স্টেশন পঁচিশ ত্রিশ পা।

বাইরে বেরিয়ে যেন চমক খেলাম। মনে হলো যেন সকাল হয়ে এসেছে। এমন ফরসা। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি টলটল করছে চাঁদ। এমন মনোহর চাঁদ জীবনে দেখিনি। কি যে সুন্দর কেমন করে বোঝাই। মনে হচ্ছে, রূপোর মস্ত এক ঘড়ার মুখ থেকে কলকল করে চাঁদের আলো গড়িয়ে পড়ছে নিচে। জ্যোৎস্নায় আকাশ বাতাস মাটি— সবই যেন মাখামাখি হয়ে রয়েছে। এ-আলোর শেষ নেই, অন্ত নেই রূপের। আকাশের দু এক টুকরো মেঘও সরে গেছে একপাশে, চাঁদের কাছাকাছি কিছু নেই, শুধু জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে।

স্টেশনে এসে দরজা খুললাম। তার আগেই চোখে পড়েছে, অনেকটা দূরে এক মালগাড়ি দাঁড়িয়ে। এঞ্জিনের মাথায় আলো জ্বলছে না। ড্রাইভারের পাশের আলোও নয়।

দরজা খুলে আমাদের লণ্ঠন বার করলাম। লাল সবুজ লণ্ঠন। লণ্ঠনের মধ্যে ডিবি ভরে দিলাম জ্বালিয়ে।

বাইরে এসে হাত নেড়ে নেড়ে লণ্ঠনের সবুজ আলো দেখাতে লাগলাম। মানে, চলে এসো, স্টেশন ফাঁকা, লাইন ফাঁকা।

ট্রেনটা এগিয়ে এল না।

কিছুক্ষণ পরে দেখি মালগাড়ির দিক থেকে কে আসছে। হাতে আমার মতনই লাল-সবুজ লণ্ঠন। তার হাঁটার সঙ্গে লণ্ঠন দুলছিল।

আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলাম না। এ-রকম ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি।

লোকটা কাছাকাছি আসতে চাঁদের আলোয় আমি তার পোশাকটা দেখতে পেলাম। সাদা পোশাক। গার্ড সাহেবের পোশাক।

দেখতে দেখতে গার্ডসাহেব একেবারে কাছে চলে এল। সামনে।

আমি অবাক হয়ে লোকটাকে দেখতে লাগলাম। লম্বা দেহারা, ফরসা, মাথায় কোঁকড়ানো চুল। বাঁ হাতে এক টিফিন কেরিয়ার।

গার্ডসাহেব কাছে এসে দাঁড়াল। দেখল আমাকে। "তুমি এই ফ্ল্যাগ স্টেশনে আছ?"

"হ্যাঁ, স্যার।"

"আমাদের এঞ্জিন বিগড়ে গেছে। মাইল চারেক আগে এঞ্জিনের কী হলো কে জানে। থেমে গেল। ড্রাইভাররা চেষ্টা করেও চালাতে পারল না।"

"আচ্ছা!"

"বিকেল থেকে জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছি। কোনো সাহায্য নেই। পাবার আশাও নেই। সন্ধের আগে এঞ্জিন আবার চলতে শুরু করল। ধীরে ধীরে চাকা ঘষটে। কোনো রকমে এই পর্যন্ত এসেছি। আর এগুনো গেল না।"

আমি বললাম, "তা হলে খবর দিতে হয়, স্যার!"

"হ্যাঁ, মেসেজ দিতে হয়। চলো মেসেজ দাও।"

স্টেশনের ঘরে এসে টরে টক্কা যন্ত্র নিয়ে বসলাম। খবর দিতে লাগলাম। ভাগ্যিস টরে টক্কা যন্ত্রটা ছিল। তিন জায়গায় খবর দিয়ে যখন মাথা তুলেছি—দেখি গার্ড সাহেব চেয়ারে বসে বসে ঝিমোচ্ছে।

"দিয়েছ খবর?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"এবার তা হলে খাওয়া দাওয়া করা যাক। তোমার এখানে নিশ্চয় জল আছে?"

"ওই কলসিতে আছে।"

"ধন্যবাদ।"

গার্ডসাহেব উঠে গিয়ে রেল কোম্পানীর মগ আর অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসে করে জল নিয়ে বাইরে গেল।

লোকটা বাঙালী নয়। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানও নয়। ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে কথা বলছিল। কোথাকার লোক আমি বুঝতে পারছিলাম না। তার হিন্দি বুলিও স্পষ্ট নয়।

হাত মুখ ধুয়ে.এসে লোকটা বলল, "আমি বড় হাংগরি। আমি খাচ্ছি। তুমি কিছু খাবে?"

"না স্যার। আপনি খান।"

"তুমিও একটু খেতে পার। আমার যথেষ্ট খাবার আছে।"

"থ্যাংক ইউ স্যার। আমার কোয়ার্টার কাছে। আমাদের রান্না হয়ে গেছে। আপনি খান, আপনার খিদে পেয়েছে। আগে যদি বলতেন— আপনাকে আমার কোয়ার্টারে নিয়ে যেতাম। খাবারগুলো গরম করে নিতে পারতেন।"

গার্ড সাহেব আমার দিকে চোখ তুলে কেমন করে যেন হাসল। বলল, "তোমার হাতটা বাড়াবে? বাড়াও না?"

আমি কিছু বুঝতে না পেরে হাত বাড়ালাম।

গার্ডসাহেব টিফিন কেরিয়ার থেকে একটুকরো মাংস তুলে আমার হাতে ফেলে দিল। হাত আমার পুড়ে গেল যেন। মাটিতে ফেলে দিলাম।

হাসতে লাগল গার্ড সাহেব। হাসতে হাসতে খাওয়াও শুরু করল। আমি কাগজে হাত মুছতে লাগলাম। হাতে না ফোস্কা পড়ে যায় আমার।

খেতে খেতে গার্ড সাহেব বলল, "তোমার নাম কী ছোকরা?"

নাম বললাম।

"এখানে কত দিন আছ?"

"ছ মাসের কাছাকাছি।"

"ভাল লাগে জায়গাটা?"

"না।"

"তা হলে আছ কেন?"

"কী করব! চাকরি স্যার!"

"চাকরি।" গার্ড সাহেব খেতে লাগল। দেখলাম সাহেব খুবই ক্ষুধার্ত। খেতে খেতে সাহেব বলল, "তোমাদের এখানে আজ কোনো ট্রেন এসেছে?"

"না স্যার। আজ কোনো গাড়ি আসেনি।"

"আমি বুঝতে পারছি না—আমার গাড়িটার কেন এ-রকম হলো? ভাল গাড়ি, ঠিকই রান করছিল। হঠাৎ থেমে গেল কেন?"

"এঞ্জিন ব্রেক ডাউন?"

"কিন্তু কেন?....আমরা যখন ওই ছোট নদীটা পেরোচ্ছি, জাস্ট একটা কালভার্টের মতন ব্রিজ, তখন একটা শব্দ শুনলাম। এরোপ্লেন যাবার মতন শব্দ। কিন্তু শব্দটা জোর নয়, তোমরা উড়ে বেড়ালে যেমন শব্দ হয় সেই রকম। ব্রেকভ্যান থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। আকাশে কিছু দেখতে পেলাম না।"

"নদীর শব্দ?"

"না না, জলের শব্দ নয়। .....আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানো, দু এক ফার্লং আসার পর এঞ্জিন বিগড়ে গেল।"

"হঠাৎ?"

"একেবারে হঠাৎ। আর একটা ব্যাপার দেখলাম। খুব গরম লাগতে লাগল। এই সময়টা গরমের নয়, জায়গাটাও পাহাড়ী। বিকেলও ফুরিয়ে আসছে। হঠাৎ অমন গরম লাগবে কেন? সেই গরম এত বাড়তে লাগল—মনে হলো গা হাত পা পুড়ে যাবে। ড্রাইভাররা পাগলের মতন করতে লাগল। পুরো গাড়িটাও যেন আগুন হয়ে উঠল।"

অবাক হয়ে বললাম, "বলেন কি স্যার?"

"ঘন্টাখানেক এই অবস্থায় কাটল। আমরা সবাই নিচে নেমে দাঁড়িয়ে থাকলাম।"

"তারপর?"

"তারপর গরম কমতে লাগল। কমতে কমতে প্রায় যখন স্বাভাবিক তখন দেখি এঞ্জিনটাও কোনোরকমে চলতে শুরু করেছে।"

"এ তো বড় অদ্ভুত ঘটনা।"

"খুবই অদ্ভুত। আরও অদ্ভুত কী জানো! আমরা গাড়ি নিয়ে খানিকটা এগুবার পর কোথা থেকে মাছির ঝাঁক নামতে লাগল।"

"মাছির ঝাঁক?" আমার গলা দিয়ে অদ্ভুত শব্দ বেরুলো।

"ও! সেই ঝাঁকের কথা বলো না। পঙ্গপাল নামা দেখেছ? তার চেয়েও বেশি। চারদিকে শুধু মাছি আর মাছি। আমাদের গাড়িও ছুটতে পারছিল না যে মাছির ঝাঁক পেছনে ফেলে পালিয়ে আসব। অনেক কষ্টে তাদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি। আমি তো ব্রেক-ভ্যানের জানালা টানালা বন্ধ করে বসেছিলাম। ড্রাইভাররা মরেছে। জানি না, মাছিগুলো এঞ্জিনের কিছু গোলমাল করে দিয়ে গেল কিনা। তবে, আগেই তো এঞ্জিন খারাপ হয়েছিল।"

আমি চুপ। অনেকক্ষণ পরে বললাম, "এ-রকম কথা আমি আগে শুনিনি, স্যার।"

"আমারও ধারণা ছিল না।"

গার্ড সাহেবের খাওয়া শেষ। জল খেল। হাত ধুয়ে এল বাইরে থেকে।

"তুমি জানো, এখানের ক্যাম্পে কী হয়?" গার্ড সাহেব জিজ্ঞেস করল।

"না স্যার। শুনি মালগাড়ি ভরতি করে গুলিগোলা আসে।"

"ননসেন্স। ..এখানে প্রিজনারস অফ ওয়ার রাখা হয়। যুদ্ধবন্দী। ক্যাম্প আছে। বিশাল ক্যাম্প।

আমার মনে পড়ল প্যাসেঞ্জার ট্রেনের কথা। জানালার জাল, ধোঁয়াটে কাচ। বললাম, "এখন বুঝতে পারছি, স্যার।"

"তাছাড়া, হাত পা কাটা, উণ্ডেড সোলজারদের চিকিৎসাও করা হয়। মরে গেলে গোর দেওয়া হয়। জান তুমি?"

চমকে উঠে বললাম, "আমি কিছুই জানি না। মালগাড়ি দেখে ভাবতাম...."

'মালগাড়িতে হাজার রকম জিনিস আসে। খাবার-দাবার বিছানা,ওষুধপত্র ক্যাম্পের নানা জিনিস।" টিফিন কেরিয়ার গোছানো হয়ে গিয়েছিল গার্ড সাহেবের। একটা সিগারেট ধরাল। আমাকেও দিল একটা। বলল, "থ্যাংক ইউ বাবু।...আমি আমার গাড়িতে ফিরে চললাম। ড্রাইভাররা কী অবস্থায় আছে দেখি গে। কিন্তু তোমায় সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছি বাবু। বী কেয়ারফুল। ....আমার মনে হচ্ছে, এদিকে কিছু একটা হয়েছে। কী হয়েছে—আমি বলতে পারব না। সামথিং পিকিউলিয়ার। ম্যাগনেটিক ডিস্টারবেন্স, না কেউ এসে নতুন ধরনের বোমা ফেলে গেল—কে জানে! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। অত মাছি...হাজার হাজার...লাখ লাখ।"

গার্ড সাহেব চলে গেল।

স্টেশন ঘরের দরজা বন্ধ করে আমি কোয়ার্টারের দিকে আসছিলাম। দূরে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। জ্যোৎস্নার আলোয় ধবধব করছে সব। হঠাৎ চোখে পড়ল, মালগাড়িটা কিসে যেন ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। তারপর দেখি মাছি। মাছির বন্যা আসছে যেন। দেখতে দেখতে আমার কাছে এসে পড়ল। বৃষ্টি পড়ার মতন মাছি পড়ছিল। ভয়ে ঘেন্নায় আমি ছুটতে শুরু করলাম।

ছুটতে ছুটতে এসে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। মরে যাবার অবস্থা।

ঘুম ভাঙল পরের দিন। হরিয়া ডাকছিল।

দরজা খুলে বাইরে আসতেই হরিয়া বলল, "বাবু, জলদি....গাড়ি আয়া।"

স্টেশনে গিয়ে দেখি একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন। সেই জানালায় জাল লাগানো, ধূসর কাচের আড়াল দেওয়া। ওষুধের গন্ধ ছড়াচ্ছে প্লাটফর্মে।

গার্ড সাহেব কাগজ সই করাতে এগিয়ে এল।

তাকিয়ে দেখি, গতকালের সেই গার্ড সাহেব নয়, নতুন মানুষ। কিছু বলতে যাচ্ছিলাম আমি, গার্ড সাহেব এমন চোখ করে তাকাল—যেন আমাকে ধমক দিল। কথা বলতে বারণ করল। আমি চুপ করে গেলাম।

কাগজ সই করে ফেরত দিলাম গার্ডকে। কিন্তু বুঝতে পারলাম না, গতকালের মালগাড়ির গার্ড সাহেব আর অত মাছি কোথায় গেল।

ভুলো ভূত

মহাশ্বেতা দেবী

তপন বাবু জীবনে কিছু ভোলেন নি। ওঁর জন্ম ১৯১২ সালে। এ গল্প যখন লেখা হচ্ছে, তখন তিনি সত্তর পেরিয়েছেন। কিন্তু ক্লাস ফাইভে পড়ার সময়ে কোন বইয়ের কোন পাতায় কোন কবিতা পড়েছিলেন, সব বলে দিতে পারেন।

সারা জীবনে উনি একবারও ছাতা ট্রামে রেখে নেমে পড়েন নি, বাজার থেকে কি কি আনতে হবে তা ভোলেন নি। এসব খুবই ভালো গুণ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সবাই তাঁকে যথেষ্ট ভয় করে।

কেননা, কেউ কিছু ভুলে গেলে তপনবাবু বেজায় চটে যান। ভুলে যাওয়াটা ওঁর মতে সবচেয়ে বড় দোষ। এ হেন তপনবাবু সেদিন এক ভীষণ বিপদে পড়লেন। ওঁর নাতি বাবুয়া বয়স এগারো। সে আবার বেজায় রকম ভুলো। এই নিয়ে যথেষ্ট বকাবকি করে একশো আটবার বাবুয়াকে দিয়ে "হে রাম। আর ভুলবনা" বলিয়ে উনি যেই নিজের ঘরে ঢুকেছেন, সেই আলো নিভল।

যা হোক, রাতটা চাঁদনী ছিল। ঘরে বেশ স্বচ্ছ একটা আলোও আসছিল। হঠাৎ তপনবাবু দেখলেন, ওঁর ঘরে চেয়ারের ওপর একটা মাথা ভেসে আছে, এবং মাথাটি কাঁদছে। যথেষ্ট ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদছে।

—এর মানে কি?

তপনবাবু যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন। লোডশেডিং হোক বা না হোক, এখন উনি বজ্রাসন করবেন, জল খাবেন, তারপর শোবেন। রুটিনে বাগড়া পড়লে ওঁর মেজাজ ঠিক থাকে না।

—আমার ঘরে একটা মুণ্ডু কেন?

—সার! আমি বড় বিপদে পড়েছি।

—তুমি কে হে?

—আজ্ঞে আমি এখন ভূত।

—আহাহা! কান জুড়িয়ে গেল।

—আমি ভূত, সার!

—বলি ধড়টা কোথায়?

—মনে করতে পারছি না।

—তার মানে?

—সার! একটু শুনবেন?

—বলো। শুনে ধন্য হই।

—আমি....মানে.... আমার মাথা তো কাটা গিয়েছিল কি না। মানে ডাকাতরা আমার মাথা কেটে ফেলেছিল।

—কেমন করে?

—আমি জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছিলাম তো!

—কেন? জঙ্গল ছাড়া যাবার পথ ছিল না?

—ছিল .... তবুও.....

—বেশ! মাথা কেটেছিল, বুঝলাম।

—সেই থেকে যখনি মানুষকে .....মানে আপনাদের ভয় দেখাতে যাই, ধড়ের একটু উপরে মাথাটা ....ভাসতে থাকে।

—আজই বা এমন মূর্তিতে এলে কেন বাপু?

—সেই তো বলতে চাইছি সার। আজ আমি ধড়টা ভুলে ফেলে এসেছি।

—কি বললে?

—অত ধমকে কথা বলবেন না সার। আমার ভীষণ ভয় করে।

—ভয় করে! লজ্জা করে না?

—লজ্জা?

—আবার জিগ্যেস করছ? মানুষের মধ্যে রাতদিন দেখছি ভুলো স্বভাব। অপদার্থ সব! ভূতের মধ্যেও সেই স্বভাব? ধড়টা ভুলে চলে এসেছ?

—হ্যাঁ সার।

মুণ্ডুটি গভীর অনুশোচনায় কাঁদতে থাকে। সে এক দৃশ্যই বটে। কাঁদতে কাঁদতে সে বলে, কিছু মনে করতে পারছি না সার! কোথায় রেখে এলাম ধড়টা। আসলে, আজ যে আমার মানুষকে ভয় দেখাবার কথা, তাই ভুলে গিয়েছিলাম।

—বটে!

এতক্ষণে তপনবাবুর গভীর কৌতূহল হল। বলতে কি, এই প্রথম তাঁর মনে হল যে ভূতদের বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। সন্ধেবেলা লেকে হাঁটতে যান। তাঁর কয়েকজন বন্ধুও আছেন। তাঁদের এ সব কথা বললে তাঁরা অবাক হয়ে যাবেন।

—ভয় দেখাবার কি দিনক্ষণ থাকে না কি? গভীর দুঃখে মুণ্ডুটি বলতে লাগল, মানুষকে ভয় দেখাতে আসা তো নিয়ম সার! তা আমি মানুষদের বেজায় ভয় পাই তো। বার তিনেক ভয় দেখাবার চেষ্টা করে ছেড়ে দিয়েছিলাম। সেদিন তা নিয়ে খুব গণ্ডগোল হল।

—ছেড়ে দিয়েছিলে কেন?

—মানুষ আজকাল ভালো নেই সার। ভয় পাবে কি, তারাই উলটে ভয় দেখায়। এই দেখুন না, কত দেখেশুনে ঢুকেছিলাম একটা এঁদোপড়া বাড়িতে। সেখানে দেখি তিনটে ভয়ানক চেহারার ছোকরা বসে তাড়া তাড়া নোট ভাগ করছে। আমি তো কথাবার্তায় বুঝলাম যে ওরা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে এখন নোট ভাগ করছে। আমাকে দেখে তারা ছোরা নাচিয়ে বলে কি, ব্যাঙ্ক ডাকাতি করব আমরা আর তুমি বেটা ভূত সেজে তাতে বখরা বসাতে এসেছ? কত বললাম যে আমি ভূত। আমি টাকা চাই না, আমি ভয় দেখাতে চাই।

—ওরা শুনল না?

—না না। এমন খেঁকাল যে আমি পালিয়ে বাঁচলাম। তারপর দেখুন না, ক'দিন বাদে পুলিস অফিসারের ঘরে গিয়েছিলাম। যথেষ্ট বন্ধুভাবেই বললাম, ব্যাঙ্ক ডাকাতরা কিন্তু অমুক জায়গায় আছে।

—সে কি বলল?

—আমলই দিল না। সে কি জঘন্য ভাষা। "ফোটো ফোটো" বলে চেঁচাতে থাকল। বলল, ধড়ে মাথা বসানো নেই, কোন আক্কেলে থানায় ঢুকছে? নাম কি? নিবাস কোথায়? ঠিকানা কি? ব্যাঙ্ক ডাকাতদের ঠিকানা তুমি কোথায় পেলে?

—তখন?

—তখন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলাম। আচ্ছা, "ফোটো" বলছিল কেন? আমি কি ফুল যে ফুটব?

—ওটা এখনকার বুলি। ওর মানে সরে পড়ো, চলে যাও।

—দু-বার দু-বার এ রকম হল যখন, তখন আমি বেজায় মুষড়ে পড়লাম। কিন্তু আমাদের ইউনিয়ানে এখন সব চ্যাংড়া ভূত।

—ইউনিয়ানও করা হয়?

—করাকরির কি আছে সার? ভূত হলেন যখন, তখনি আপনি এ ইউনিয়ানের লোক।

—একটা ইউনিয়ান, না অনেক?

—একটাই। চ্যাংড়াগুলো অসম্ভব গোলমাল করে। তারা বলল, তুমি ভয় দেখাতে যাবে না, মজা পেয়েছ? যত বলি, ওরে! মানুষ আজকাল ভয় পায় না। কে কার কথা শোনে।

—তারপর কোথায় গেলে?

—আপনার বাড়ির উলটো দিকে। ওই তেতলা বাড়িতে। সে এক দজ্জাল মেয়েমানুষ বটে। ভয় পাওয়া দূরস্থান। সে বঁটি নিয়ে আমায় তাড়া করল।

—ওখানে গিছলে কেন বাপু? বোসবাবুর গিন্নি নামকরা দজ্জাল।

—তারপর আমি একেবারে বেঁকে বসেছিলাম। আর আমি ভয় দেখাতে যাব না। মানুষ এখন খুব খারাপ হয়ে গেছে। ছোট ছেলেরাও ভূত দেখলে ভয় পায় না। কিন্তু আজ শুনলাম, ভয় দেখাতে না বেরোলে আমাকে একঘরে করা হবে।

—তাতে কি?

—ভূত হয়ে ভূতের সমাজে থাকতে পাব না, এটা তো খুবই অপমানজনক। না কি বলুন? ওরা সব বলেও দিল অমুক জায়গায় যাও, ওই ঠিকানায়। সেখানে যাবার পথেই ধড়টা ফেলে গেলাম, না সেখানে গিয়ে তবে ফেলে এলাম, কিছু মনে করতে পারছি না। সব ভুলে গেছি।

—সেখানে গিয়েছিলে?

—মনে হচ্ছে, গিয়েছিলাম।

—সে কোথায়?

—মনে নেই সার।

—তা আমার মনে হয়, তোমার এখন ফুটে যাওয়াই ভালো। তোমার সমস্যা খুবই জটিল। কিন্তু এ সমস্যার বিষয়ে আমার কিছুই করার নেই।

—সার!আমি কি ধড় ছাড়া ফিরতে পারি! শুধু মুণ্ডুকে কোনো ভূত সম্মান করবে কি?

—এতো ভেলা জ্বালা হল।

—রাস্তাটার নামটা যদি মনে পড়ত।

—তোমরা কি নাম ঠিকানা নিয়ে ভয় দেখাতে বেরোও!

—হ্যাঁ সার। আগে যার যা ইচ্ছে হত তাই করত। এখন খুব কড়াকড়ি। প্রত্যেকদিন প্রত্যেককে কোথায় যাবে, কার বাড়ি, সব জেনে বেরোতে হয়। এ তো মানুষের কাণ্ড নয় সার, যে যার ইচ্ছে তাই করবে। আমরা খুব ডিসিপ্লিনে থাকি।

—কি রকম ডিসিপ্লিন?

—সব তো বলা যাবে না সার। তবে কিছু কিছু বলতে পারি। আমরা, যারা ভূত, তারা বাঁধাধরা, এলাকায় ঘুরব। যেমন আমি কলকাতা থেকে ক্যানিং, এর মধ্যে থাকব। আবার, যারা ধরুন শাঁকচুন্নি,বা পেতনি, বা মেছো ভূত, তারা থাকবে গ্রামে।

—এ সব নিয়ম কেউ ভাঙে না?

—কে ভাঙবে তা বলুন? পুঁচকে ভূতরা রাত দশটা বাজলেই ফিরে যাবে, এও একটা নিয়ম। মানুষদেরকে এত কথা বোঝানো মুশকিল।

—তোমার এই ভুল সারানোর দাওয়াই ভূতের রাজ্যে নেই?

—না সার।

—কোন রাস্তা তাও মনে নেই?

—না সার।

—তোমার ভুল সারাবার দাওয়াই আমি জানি।

—একটু দেবেন?

—দেবার দাওয়াই নয়, বলতে হবে।

—কি?

—দাওয়াই অব্যর্থ, তবে তোমার পক্ষে .... যাক!

—একশো আটবার হেঁকে বলো দেখি "রাম!"

—কি বললেন!—মুণ্ডুটি আর্তনাদ করে ওঠে।

—বলো "রাম!"

—হ্যাঁ হ্যাঁ, রামময় রোডই বটে...গলার শব্দ তীক্ষ্ণ হয় এবং মুণ্ডুটি মিলিয়ে যেতে থাকে।

—রামময় রোডে যাবে তাই ভুলে গিয়েছিলে? তপনবাবু যথেষ্ট হেঁকে বলেন। মুণ্ডুটি কি যেন বলে! তা বোঝা যায় না।

এবং আলো জ্বলে ওঠে। তপনবাবু ভালো করে দেখে নেন ঘরটা। নাঃ কোথাও কিছু নেই। এবার বজ্রাসন করে জল খেয়ে শুয়ে পড়া যাক। কাল সকলকে গল্পটা বলতে হবে। নাতিকে আর ধমকধামক দেবেন না তপনবাবু। ভুলে যাওয়াটা, বোঝা যাচ্ছে একটা গুরুতর ব্যাধি। রীতিমত গুরুতর।

একখানি মুখ

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

একমাথা ঝাঁকড়া চুল। মুখ ভর্তি কাঁচা পাকা দাড়ি মুখটাকে যেন সবটাই গ্রাস করেছে। কবল সেই ঝাঁকড় রুক্ষ চুল ও কাঁচা-পাকা দাড়ির ভিতর থেকে চোখ দুটোর ধারালো ছুরিরর ফলার মত শাণিত দৃষ্টি যেন দুটো ক্ষুধার্ত অগ্নিগোলকের মতই তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ সেই দৃষ্টির সঙ্গে চোখাচোখি হলে গায়ের ভেতরটা কেমন যেন শিউরে ওঠে। কানাই মিস্ত্রী।

আঁকাবাঁকা অপরিসর গলিটা ঘুরপাক খেতে খেতে যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে ঠিক সেইখানে টিনের চালের একটা ছোট খুপরি ঘর, চারপাশে পুরাতন টিনের বেড়া, তারই মধ্যে কানাই মিস্ত্রীর কাঠের কারখানা। কানাই ছুতোর মিস্ত্রী।

আলো বাতাসের সঙ্গে সম্পর্কহীন, স্যাঁতসেঁতে আধো-ছায়ায় ঘেরা সেই ঘরখানির মধ্যে কানাই মিস্ত্রী তার কারখানা খুলে বসেছে। মালিক বলতেওসে, কারিগর বলতেও সে।

চারিপাশে ছোট বড় মাঝারি সব কাঠের টুকরো ছড়ানো, তুরপুণ, বাটালী, করাত, ছেনী, সব যন্ত্রপাতি। একধারে ছোট একটা দড়ির খাটিয়া বিছানা—তার উপরে অত্যন্ত মলিন ছিন্ন একটি শয্যা। তারই পাশে একটি তোলা উনান, একটি এলুমিনিয়ামের কালিপড়া হাঁড়ি ও দু-চারটি অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য্য তৈজসপত্র।

কাঁচা-পাকা চুল ও দাড়ি দেখেই কানাই মিস্ত্রীর সত্যিকারের বয়সটা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। কেননা পাকানো রুক্ষ হাড়সর্বস্ব দেহটার মধ্যে এখনো যে কোথাও ঘুণ ধরেনি সেটা দেখলে আর বুঝতে কারোরই কষ্ট হয় না।

কাজ কারবারও কানাই মিস্ত্রীর এমন কিছু একটা ভারি বা দামী নয়। কাঠের পুতুল, জল-চৌকি, বাতিদান, ফুলদানী, দোয়াতদানী ঠাকুরের সিংহাসন এই সবই সে তৈরি করে।

কিন্তু ছোট কাজ হলে কি হবে—সেই সব ছোট ছোট জিনিসের গায়ে এমন সব বিচিত্র আশ্চর্য রকমের ফুল লতা পাতা প্রভৃতি কারু শিল্প সে কুঁদে তোলে যে দেখলে চোখ আর ফিরানো যায় না।

নিজে কখনো সে বেচতে যায় না তার তৈরি জিনিস। সাহেবপাড়া ও অন্যান্য বনেদী পাড়া থেকে বড় বড় নামকরা দোকানদারেরাই এসে খুঁজে পেতে কিনে নিয়ে যায় কানাই মিস্ত্রীর হাতরে তৈরি সব জিনিসগুলো।

তারপর সেইগুলো যখন বিরাট দোকানের আলো ঝলমল সব সুদৃশ্য কাচের শো-কেসের মধ্যে সাজিয়ে রাখা হয় দামের কার্ড সুতো দিয়ে গেঁথে, তখন তার আভিজাত্যের পাতায় কোথাও কানাই মিস্ত্রীর নাম গন্ধও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সকাল থেকে রাত নয়টা এবং কোন কোন দিন হয়ত সারাটা রাতই কেটে যায় কাজের মধ্যে।

তবে ওই গলির বাসিন্দারা মধ্যে মধ্যে কোন স্তব্ধ নিশীথে শুনতে পায় একটি করুণ বেহালার সুর।

একটি কান্নার ধ্বনি। স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে যেন বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে চলেছে।

আজ প্রায় বার তের বৎসরের উপরে গলির অধিবাসীরা দেখে আসছে কানাই মিস্ত্রী ও তার ঐ খুপরির মধ্যে ছোট কারখানাটা। কারো সঙ্গেই তার আলাপ নেই, কারো সঙ্গেই তার ভাব নেই। একা কানাই মিস্ত্রী। ইহ সংসারে কানাই মিস্ত্রীর আপনার জন কেউ আছে কিনা তাও কেউ জানে না বা শোনেনি। ঘরটার অপরিসর খোলা দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই দেখা যায় একটি হাঁটু একপাশে ভেঙে ও অন্য হাঁটুটি ভাঁজ করে কানাই মিস্ত্রী আপন মনে কাজ করে চলেছে টুকটুক করে। কখনো কেউ গিয়ে সেই খোলা দরজার সামনে দাঁড়ালে বা নাম ধরে ডাকলে একবার হয়ত চোখ তুলে তাকাবে। খরিদ্দার হলে দুটো একটা কথায় কাজ সেরে আপন কাজে মন দেবে—অন্য কেউ হলে কথাই বলবে না। যেন ভ্রূক্ষেপও নেই কে এলো।

সেদিনও শীতের মাঝ রাতে একটা ময়লা চাদর গায়ে কানাই মিস্ত্রী আপন মনে একটা কাঠের বাতিদানের উপরে একটি মালতীলতা কুঁদে কুঁদে তুলছিল।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে যে একজন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে তা টেরও পায়নি।

হঠাৎ এক সময় কাজ করতে করতে সামনের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই কানাই মিস্ত্রী দেখল, একজোড়া কোমল শান্ত চোখের দৃষ্টি তার প্রতিই নিবদ্ধ।

বারো তেরো বৎসরের একটি মেয়ে। রোগাটে চেহারা। গায়ের রঙ কালো, কিন্তু অপরাজিতা ফুলটির মতই যেন স্নিগ্ধ-শ্যাম। মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল গালের দুপাশ দিয়ে ও কাঁধের সবটাই ঢেকে গুচ্ছে গুচ্ছে নেমেছে। মুখের আদলটি গোল কিন্তু চোখ দুটির বুঝি তুলনা হয় না। গায়ের কোথায়ও কোন অলঙ্কার নেই, একমাত্র দুটি চারু কোমল মণিবন্ধে একগাছি করে লাল রেশমী চুড়ি ছাড়া। পরণে একটি মলিন রঙিন মিলের শাড়ী। গায়ে ততোধিক মলিন ছিন্ন একটি ব্লাউজ।

হাঁটু ভেঙ্গে বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল মেয়েটি কানাই মিস্ত্রীর হাতের মধ্যে ধরা অসমাপ্ত বাতিদানটার দিকেই!

কানাই মিস্ত্রী অবাক হয়ে খানিকক্ষণ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলো।

সে একটু বেশ আশ্চর্যই হয়েছিল। এ পাড়ার ছেলে-মেয়েরা কখনো তার ছায়াও মাড়ায় না। তাকে ভয়ের সঙ্গেই দূর থেকে বরাবর পরিহার করে চলে।

আর এও সে শুনেছে এ পাড়ার মায়েরা তাদের অশান্ত দামাল ছেলে মেয়েদের জুজুবুড়ো বলে তার নাম বলে ভয় দেখিয়ে শান্ত করে।

কিন্তু ঐ বারো তেরো বছরের মেয়েটির শান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে কানাই মিস্ত্রী যেন কেমন একটু অবাকই হয়ে যায়, এবং কয়েক মুহূর্ত সম্মুখে উপবিষ্ট নির্বাক মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থেকে আবার নিজের কাজে মন দেয়। আরো মিনিট পনের কেটে গেল। আবার কানাই মিস্ত্রী মুখ তুলল। তেমনি করেই ঠিক বসে আছে মেয়েটি। কি চাও, জিজ্ঞাসা না করে পরে না কানাই মিস্ত্রী!

কানাই মিস্ত্রীর কথায় মেয়েটি ওর মুখের দিকে তাকাল। কি যেন বলবার চেষ্টা করে প্রত্যুত্তরে, কিন্তু ঠোঁট দুটি সামান্য একটু কেঁপে ওঠা ছাড়া আর কোন শব্দই বের হয় না। তারপর একসময় মেয়েটি নিঃশব্দে যেমন এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে উঠে চলে গেল। পরের দিনও আবার হঠাৎ একসময় কাজ করতে করতে চোখ তুলে কানাই দেখলো সেই মেয়েটি আজও তেমনি ওর সামনে নিঃশব্দে বসে আছে। তার পরের দিনও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সেদিন আর কানাই মিস্ত্রী চুপ করে থাকতে পারল না। প্রশ্ন করে, কে তুমি বলত! কাদের বাড়ির মেয়ে?

আজও মেয়েটির ঠোঁট দুটি বারেকের জন্য কেবল নিঃশব্দে কেঁপে উঠলো মাত্র, কিন্তু শব্দই বের হলো না। কি নাম তোমার খুকি? আশ্চর্য! তবু মেয়েটি কথা বলে না। এমন সময় একটি প্রৌঢ়া দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ডাকে, নারাণী ও নারাণী হতাভাগী তুই এখানে এসে বসে আছিস। আর খুঁজে খুঁজে আমি হয়রান। বুড়ি এসে একেবারে সোজা মেয়েটির সামনে দাঁড়াল।

আপনার মেয়ে বুঝি? কানাই জিজ্ঞাসা করে।

হতভাগী আমার নাতনী। বড় লক্ষ্মী মেয়ে। হাঁ। লক্ষ্মীই বটে। সব খেয়ে বসে আছে। আহা! তাও যদি কথা বলতে পারতো। বুড়ি বলে।

চমকে তাকায় বুড়ির মুখের দিকে কানাই মিস্ত্রী। জিজ্ঞাসা করে, কেন, ওকি কথা বলতে পারে না?

না বাবা।

চমকে উঠলো যেন কানাই মিস্ত্রী। নারাণীকে নিয়ে বুড়ি চলে গেল।

পরের দিন দ্বিপ্রহরে কানাই গত কয়েকদিনের অর্দ্ধ সমাপ্ত বাতিদানটার উপরে সূক্ষ্ম মালতীলতার ধারে ধারে ছোট ছোট ফুলগুলি কুঁদে তুলছিল, নারাণী এসে সামনে দাঁড়াল। কানাই নারাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, বোস!

নারাণী বসে ভীরু কম্পিত হাতে একটি কাঠের টুকরো আঁচলের তলা থেকে বের করে ,গিয়ে দিল কানাইয়ের দিকে। কি হবে এটা দিয়ে? আঙ্গুল তুলে নিঃশব্দে একটি পুতুলের দিকে দেখাল নারাণী। পুতুলটি একটি মেয়ে। কানাইয়ের হাতে তৈরি।

মৃদু হাসল কানাই। তারপর হঠাৎ কি ভেবে নারাণীর হাত থেকে কাঠের টুকরোটা নিয়ে হাত বাড়িয়ে পুতুলটা তুলে এগিয়ে ধরল নারাণীর দিকে। বললে, এই নাও। কিন্তু নিঃশব্দে মাথা হেলিয়ে প্রতিবাদ জানাল বোবা মেয়ে। না এটাই নাও না। না। মাথা হেলায় বোবা মেয়েটি। কানাই এবারে যেন কি ভাবে। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলে, বেশ। নতুনই একটা তোমাকে তৈরি করে দেবো।

নারাণীর দেওয়া কাঠের টুকরোটা হাতে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ দেখে নিল কানাই মিস্ত্রী, তারপর বাটালীটা পাশ থেকে তুলে নিয়ে হাতুড়ির সাহায্যে কাঠের টুকরোটা কাটতে শুরু করল। একদিন দুদিন তিনদিন চারদিন কেটে যায়, কানাই একটা নতুন পুতুল গড়তে ব্যস্ত। রোজ বোবা মেয়েটি সামনে এসে বসে থাকে—নিষ্পলক দৃষ্টিতে কার্যরত কানাইয়ের দুটি হাতের দিকে তাকিয়ে থাকে। কাঠের টুকরো আজ আর নেই! ফুটে উঠছে শিল্পীর হাতের কারুকার্য করা একটি মুখ। কানাই যেন মেতে উঠেছে কি এক নেশায়। চোখ দুটি যেন ঠিক আসছে না। ওষ্ঠের নীচে কোমল ভাঁজটি যেন ঠিক ফুটছে না। কানাইয়ের মন খুঁত খুঁত করে। পঞ্চম দিনে বোবা মেয়েটি এলো না। ষষ্ঠ দিনেও না। কানাইয়ের হাতের কাজ কিন্তু এদিকে শেষ হয়েছে। ঐ কাজটি শেষ হবার পর আর যেন কিছুতেই কানাইয়ের কাজে মন বসছে না। সর্বক্ষণ কেবল তৈরি পুতুলটি সামনে বসিয়ে রেখে নির্নিমেষে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে কানাই। আর কান দুটো তার ক্ষীণ একটি পদশব্দের আশায় আশায় উদগ্রীব হয়ে থাকে। কিন্তু কোথায় সেই বোবা মেয়ে নারাণী। মেয়েটি আসত এই মাত্র।

জানেও না কানাই কোথায় ঐ গলির মধ্যে কোন বাড়িতে থাকে মেয়েটি। ঠিকানা তার জিজ্ঞাসাও করেনি এবং জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজনও কোনদিন বোধ করেনি। নয় দিনের দিন সন্ধ্যার পর এলো একজন চেনা খরিদ্দার। প্রায়ই লোকটা এসে কানাইয়ের হাতের তৈরি জিনিস তার দোকানের জন্য কিনে নিয়ে যায়, আজও

সে এসেছিল নতুন কিছু কিনতেই। কিন্তু এসে দেখলো বাহ্যজ্ঞানরহিত হয়ে মিস্ত্রী যেন বসে আছে। মিস্ত্রী! চমকে মুখ তুলে তাকাল কানাই মিস্ত্রী আগন্তুকের দিকে।

ইতিমধ্যে সামনের কাঠের তৈরি মুখখানার দিকে নজর পড়েছিল আগন্তুকের; বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বলে ওঠে, বাঃ চমৎকার। শুধু একটি মেয়ের মুখ। কিন্তু মনে হয় যেন একেবারে জীবন্ত। চমৎকার মুখখানি ত করেছো মিস্ত্রী, বলতে বলতে নীচু হয়ে জিনিসটা তুলতে যেতেই কানাই হা হা করে চেঁচিয়ে ওঠে,—ছুঁয়োনা, ছুঁয়ো না বলছি। কি হলো। কানাইয়ের মেজাজে চমকে অবাক হয়ে যায় আগন্তুক। কি! কি চাও এখানে। যাও। যাও বলছি। তবুও সেই আগন্তুক বলবার চেষ্টা করে, কি হলো মিস্ত্রী আমি যে কিছু সওদা করতে এসেছিলাম। বেচবো না, বেচবো না তোমাদের আর কিছু, যাও—যাও এখান থেকে। আগন্তুককে অগত্যা স্থান ত্যাগ করতেই হয়। কিন্তু তারপর আরো সাতটা দিন কেটে যায়, বোবা মেয়ে নারাণীর কিন্তু পাত্তা পাওয়া যায় না। আবার একদিন তারপর মিস্ত্রী কাজে হাত দেয়।

সুন্দর একটি নক্সা-কাটা কাঠের জলচৌকি তৈরি করে তারই উপরে কাঠের মুখখানি বসিয়ে একধারে রেখে দেয় কানাই মিস্ত্রী। দেখতে দেখতে ক্রমে চারটে মাস কেটে যায়, জলচৌকির উপরে সেই কাঠের মুখখানি তেমনিই বসান আছে।

কানাই মিস্ত্রী অপেক্ষার উগ্রতাটা যদিও আজ অনেক কমে এসেছে কিন্তু আজও মধ্যে মধ্যে কোন কাঠের টুকরোর বুকে কিছু কুঁদে তুলতে তুলতে অন্যমস্ক মিস্ত্রী অদূরে জলচৌকির উপরে রক্ষিত কাঠের সেই মুখখানি দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে।

দাড়ি গোঁফ ভরা মুখখানির মধ্যে ধারোলো ছুরির ফলার ঝকঝকে চোখের তারা দুটো হঠাৎ যেন কেমন জলে চক চক করে ওঠে মুহূর্তের জন্য। আরো দশ বছর পরে। গলির মধ্যে কানাই মিস্ত্রীর সেই কাঠের ছোট্ট কারখানাটি তেমনিই আছে। তবে লোকটার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। শীর্ণ পাকানো দেহটা যেন কেমন ধনুকের মত বেঁকে গিয়েছে। ঝাঁকড়া চুল ও গোঁপ দাড়ি পেকে সব সাদা শণের মত হয়ে গিয়েছে।

চোখের ক্ষীণ দৃষ্টিতে আজকাল আর নজর চলে না বললেও হয়। তবু সেই ক্ষীণ দৃষ্টি দিয়েই ঠুক ঠুক করে কাজ করে কানাই মিস্ত্রী। তবে আগের চাইতে অনেক ধীরে অনেক আস্তে। সামান্য একটা ফুল লতা তুলতেই প্রায় দশ পনের দিন লেগে যায়। তাও আগের মত হয় না। সেই অত্যাশ্চর্য কারু শিল্পকে সে যেন আর ফুটিয়ে তুলতে পারে না। গলির মধ্যেও অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

নতুন যে চওড়া রাস্তা বের হয়েছে, পূর্ব দিকের কিছুটা অংশ তার কবলে পড়েছে। দু-চারটে নতুন বাড়িও উঠেছে। ইদানীং আর তেমন কাজ না করতে পারার জন্য অত্যন্ত অভাব দেখা দিয়েছে। মাঝে মাঝে তাই কতকটা বাধ্য হয়েই শীর্ণ বার্দ্ধক্য পীড়িত দেহেও উপোস দিতে হয় কানাই মিস্ত্রীকে। আগের সেই শিল্প প্রতিভাকে ফুটিয়ে তুলতে পারে না বলে ইদানীং কয়েক বছর ধরেই তার হাতের তৈরী জিনিসের দাম ও চাহিদা দুটোই কমে এসেছিল।

পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। শেষ পর্যন্ত একদিন কানাই মিস্ত্রীকে বের হতে হলো গোটা দুই কাঠের ফুলদানী ও সেই মুখখানি একটা জীর্ণ থলির মধ্যে নিয়ে। কিন্তু দীর্ঘ দিনের অনভ্যাসের ফলে ও অনাহারের ক্লান্তিতে পা দুটো কাঁপতে থাকে। প্রথম প্রথম নিজেই সে বহুকাল আগে হাতের তৈরি জিনিস কলেজ স্ট্রীটে কমলা ষ্টোর্সে বিক্রি করতে যেত। তারপর তাঁর হাতের কাজের সুখ্যাতি ও প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ায় তাকে আর বিক্রি করবার জন্য যেতে হতো না। দোকানদাররাই খোঁজ নিয়ে নিয়ে তার ঘরে আসত মাল কিনতে! বহুকাল পরে

কানাই মিস্ত্রী কমলা ষ্টোর্সের সামনে এসে দাঁড়াল। কিন্তু দোকানের আজ অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে দীর্ঘ কয়েক বৎসরের ব্যবধানে।

সুদৃশ্য আলো ঝলকিত সব শো কেসগুলি রকমারী সব দামী দামি জিনিসপত্র ঝলমল করছে যেন। কাউন্টারে সব সেলসম্যানরা ব্যস্ত খরিদ্দারদের নিয়ে। নানা বয়েসী অগুন্তি সব খরিদ্দারের ভিড়ে কমলা ষ্টোর্স যেন গম গম করছে। কমলা ষ্টোর্সের মালিক অরবিন্দবাবুরই খোঁজ করে কানাই মিস্ত্রী কাউন্টারে যায়। ছোকরা মত একজন সেলসম্যান মৃদু হেসে বলে, অরবিন্দবাবু। তিনি ত এখন আর এ দোকানের মালিক নন! এখন নতুন মালিক— রমেন বাবু! কিন্তু কি দরকার তোমার মালিককে?

কিছু কাঠের তৈরি জিনিস এনেছিলাম। ওসব জিনিস আমরা রাখি না, তুমি অন্য কোথাও চেষ্টা কর। ভাল জিনিস ছিল বাবু। না। না—তুমি অন্য জায়গায় দেখ। বাধ্য হয়েই তখন কানাই মিস্ত্রীকে বের হয়ে আসতে হয় দোকান থেকে। ফুটপাথটা ক্রস করতে গিয়ে মাথার মধ্যে হঠাৎ যেন কেমন ঝিম ঝিম করে ওঠে— ঘুরে টলে পড়ে যায় কানাই। আর ঠিক সেই সময় একটা গাড়ি এসে ধাক্কা খেয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে কানাইবার হাতের থলি থেকে ছিটকে কাঠের ফুলদানী দুটো ও সেই মুখ খানা রাস্তায় গিয়ে পড়ে। কাঠের তৈরি মুখটা গড়াতে গড়াতে এসে একটি লোকের পায়ের উপরে পড়তেই তিনি উঃ করে ওঠেন।

তারপর রাস্তার আলোয় পায়ের কাছে নজর পড়তেই যেন চমকে ওঠেন। দোকানের শো-কেসের উজ্জ্বল আলো পায়ের কাছে এসে পড়েছে। সেই আলোয় কাঠের তৈরি মুখখানির দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ভদ্রলোক। তারপর ধীরে ধীরে নীচু হয়ে কাঠের মুখখানি তুলে নিলেন। নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলেন সেই মুখখানির দিকে। পাশেই দণ্ডায়মান তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন, কি ! কি হলো!

দেখো! দেখো সীতা!

কি? স্ত্রী শুধান স্বামীকে।

দেখছো না অবিকল—সেই মুখ!

কার। কার মুখ গো!

না। না—তুমিত দেখনি তাকে সীতা। আমার এক বোবা বোন ছিল, নারায়ণী!—গাড়ি চাপা পড়ে দশ বছর আগে হঠাৎ মারা যায়, আশ্চর্য! অবিকল যেন নারায়ণীরই মুখখানি। চেপে ধরেন ভদ্রলোক মুখখানি বুকের মধ্যে। দুচোখের কোলে জল ভরে আসে।

ওদিকে ততক্ষণে রক্তাক্ত-কানাই মিস্ত্রীকে যে ভদ্রলোকের গাড়ির তলায় সে একটু আগে চাপা পড়েছিল তাঁরই গাড়িতে ধরাধরি করে তুলছে সকলে। অস্ফুট ক্ষীণ কণ্ঠে কানাই মিস্ত্রী বলতে থাকে—না, না—তোকে আমি বেঁচবো না—নারাণী তোকে আমি বেচবো না!

হুড়কো ভূত

অমিতাভ চৌধুরী

আমার মেজ পিসিমার বাড়িতে একবার ভূতের উপদ্রব হয়েছিল। ঠিক ভূত নয়, শিবের চেলা নন্দী-ভৃঙ্গীর উৎপাত। এই উৎপাতে সারা গাঁ যেমন ভীত, তেমনি বিস্মিত।

ছেলেবেলার কথা বলছি। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনা। আমি তখন আছি মামাবাড়িতে। গ্রামের নাম শ্রীগৌরী। ওখানকার ইস্কুলে পড়ি। আমার মামাবাড়ির ঠিক পিছনটাতে ফার্লংখানেক দূরে মেজ পিসিমার বাড়ি। পিসিমা সাদা-সিধে ভালো মানুষ। দেব-দেবী ভূত-প্রেত সাধু সন্ন্যাসীতে অগাধ বিশ্বাস। পিসেমশাই আরও ভালো মানুষ। গ্রামের পাঠশালার গরীব মাস্টার। মাস মাইনে বারো টাকা। ছোট্ট বাড়ি অল্প জমি সামান্য চাকরি নিয়ে কষ্টে-সৃষ্টে দিন চলে।

তাঁদের একমাত্র ছেলে বেণুলাল—আমার রাঙাদা।

রাঙাদা বয়সে আমার চেয়ে আড়াই বছরের বড়। পড়াশোনার নাম নেই, টো টো করে ঘুরে বেড়ান, গুলতি দিয়ে পাখি মারেন, অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প বলেন এবং চকখড়ি দিয়ে বাড়ির যত্রতত্র ছবি আঁকেন।

ছোট্ট একতলা বাড়ি। টিনের চাল, একটি ঘরকেই দরমার বেড়া দিয়ে তিনটি ঘর। সামনে দুটি ঘরের একটিতে রাঙাদা, অন্যটিতে পিসিমা-পিসেমশাই এবং পেছনের তিনদিক খোলা টানা লম্বা ঘরে রান্নাবান্না। রান্নাঘর দরমার বেড়া দিয়ে আলাদা করা। বাড়ির পেছনে গাছপালা আগাছার জঙ্গল। ছোট্ট একটা মজাপুকুরও সেই জঙ্গলের গায়ে।

টানাটানির সংসার, কিন্তু এক ছেলে বলে রাঙাদার আদরের শেষ নেই। তার আবদারেরও শেষ নেই। 'অমুকটা চাই' বলা মাত্র এনে দিতে হবে। বেচারা পিসেমশাই। যে সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, সেখানে আদুরে ছেলের আবদার মেটাতে গিয়ে তিনি জেরবার।

মেজ পিসিমার বাড়িতে হঠাৎ হাজির হলেন এক সন্ন্যাসী। গায়ে লাল কাপড়, মাথায় জটা, হাতে ত্রিশূল। সাক্ষাৎ শিব। পিসিমা তো তাই ভেবে বসলেন। সাধুবাবা বললেন, এইমাত্র কৈলাস থেকে তিনি আসছেন। একটু আশ্রয় দরকার। এই গ্রামে পাপ ঢুকেছে। পাপ তাড়াতে কিছুদিন থাকতে হবে।

পিসিমা তো বিশ্বাস করার জন্যে বরাবরই প্রস্তুত। লম্বা প্রণাম ঠুকে সাধুবাবাকে আশ্রয় দিলেন। তাঁকে শাক ভাত ডাল খাইয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলেন।

সাধুবাবা ওই বাড়িতে থেকে গেলেন। খানদান, মাঝে মাঝে 'দেহি ভবতি ভিক্ষাং' বলে গাঁয়ে ঘোরেন এবং কেউ কটু কথা বললে ত্রিশূল নিয়ে তাড়া করেন। গাঁয়ের অবিশ্বাসীরা সন্দেহের চোখে তাকায়, ভাবে কোন ফেরারি আসামি নয়তো? সাধু সেজে গা ঢাকা দিয়ে আছে? আর বিশ্বাসীরা তো শিবজ্ঞানে ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজো করতে লাগল।

সাধুবাবার কাছে আমিও যাই। তিনি আমাদের প্রায়ই কৈলাসের কথা শোনান। তোফা জায়গা। ওয়েদার

ভাল, খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট নেই। নেহাৎ এক কঠিন প্রয়োজনে তাঁকে কৈলাস ছেড়ে আসতে হল। পিসিমার ভাইপো বলে আমাকে অধিক স্নেহ করেন, বলেন, কিছু ভাবিস না, তোর হবে। আমার কী যে হবে আমি নিজেই জানি না। তবে সাধুবাবাকে পুরো অবিশ্বাসও করি না। বলা যায় না, হয়তো শিবই। নইলে সেদিন রূপসী গাছের তলা থেকে সাপ ধরে আনলেন কী করে?

সাধুবাবা মেজ পিসিমার বাড়িতে থেকে গেলেন। তাঁর আনা ভিক্ষের চাল সংসারে লাগে। তিনি নানা রকম গল্প শোনান এবং মাঝে মাঝে 'বোম বোম' বলে কৈলাসের স্মৃতি রোমন্থন করেন। সাধুবাবা আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন, একদিন তিনি আমাকে কৈলাস দেখিয়ে আনবেন।

আমার সোনামামা থাকতেন বাইরে। সেবার পূজোর সময় বাড়িতে এসে সাধুবাবার খবর পেলেন। তিনি দেখেই বললেন, ভণ্ড প্রতারক। সাধুবাবাকে একদিন বাড়িতে ডেকে এনে বেশ দু-চার কথা শুনিয়ে দিলেন। আমি তো ভয়ে মরি, যদি শাপ দিয়ে ভস্ম করে ফেলেন সোনামামাকে।

সাধুবাবা কিছু মনে করেন না, স্মিত হেসে চলে যান। সোনামামাও ভস্ম হন না। বিশ্বাস-অবিশ্বাস মিলিয়ে সাধুবাবা গ্রামে থেকে গেলেন। আর আমার মেজ পিসিমা ও পিসেমশাই শিবঠাকুরের দয়ায় অচিরে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের অপেক্ষায় থাকেন। আগের জন্মে কী কী অপরাধের জন্যে তাঁদের এই আর্থিক দুর্দশা, একথা সাধুবাবা স্মরণ করিয়ে দেন এবং আশ্বাস দেন এত বছর এত দণ্ড এত পল পেরিয়ে গেলে সব দুঃখমোচন হয়ে যাবে।

ইস্কুল ফেরৎ আমি মাঝে মাঝে সাধুবাবার কাছে যাই। আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেন, আমি যেন শাপভ্রষ্ট দেবশিশু। সাধুবাবা কথা বলতে বলতে কী যেন বিড়বিড় করেন। পিসিমা বলেন, মা দুর্গার সঙ্গে কথা বলছেন। হতেও পারে। প্রলাপেই সংলাপ।

রাঙাদার দুষ্টুমিতে গ্রামের লোকজনেরা তিতিবিরক্ত হলেও সাধুবাবা ক্ষমাশীল। বলেন, ওটা হনুমান ছিল ত্রেতাযুগে। বাঁদরামি করলেও ভক্ত মানুষ। একথায় আমারও বিশ্বাস হয়েছিল। কেননা, দেখতাম রাঙাদা হনুমানের ছবি খুব ভালো আঁকতে পারেন।

রাঙাদা আমায় খুব ভালোবাসেন। অনেক সময় আমাকে তাঁর দুঃসাহসী অভিযানের সঙ্গী করতে চান। অন্যের নৌকো নিয়ে নদী পাড়ি কিংবা আমগাছের ডগায় উঠে পাখির ছানা ধরে আনা কিংবা পানাপুকুর সাঁতরে এপার ওপার হওয়া তার কাছে নৈমিত্তিক ব্যাপার। আমি ভীতু মানুষ, কোনটাতেই রাজি হই না। আর যদিও বা সাহস করে সঙ্গী হতে চাই, জানি তাহলে দিদিমা ও সোনামামা বকবেন। ওদের ধারণা বেণুলাল বখাটে ছেলে।

রাঙাদার উপর মাঝে মাঝে ভড় হত। ঘুমের মধ্যে কী সব বিড়বিড় করতেন। সাধুবাবা মন্ত্র পড়ে ঠান্ডা করতেন। একবার রাঙাদা মাঝরাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে সামনের বড় পুকুরে ঝাঁপ দেন। পেছন পেছন ছোটেন পিসেমশাই ও সাধুবাবা। পিসেমশাই জলে নেমে তাকে ধরবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পারবেন কেন। বাকি রাত জলের মধ্যে দাপাদাপি চলল। বেচারা পিসেমশাই! রাঙাদা যখন পাড়ে উঠলেন, তখন চোখ বুঁজে শুয়ে পড়লেন ঘাটে। যেন ঘুমের মধ্যেই সবকিছু হয়েছে। অনেক দিন পর রাঙাদা আমার কানে কানে বলেন, মজা করার জন্যেই রাতভর সাঁতার কেটেছিলেন।

সেই রাঙাদার বাড়িতে হঠাৎ শোনা গেল ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে। রোজ রাত্তিরে সবাই যখন ঘুমে অচেতন, ঠিক তখন শোবারঘর ও রান্নাঘরের মাঝের দরমার দরজা ধাক্কা দিয়ে খোলার চেষ্টা হয়। এপাশের

লম্বা বাঁশের হুড়কো নড়তে থাকে এবং প্রবল হাতে হুড়কো চেপে না ধরলে ভূত হুড়মুড় করে শোবার ঘরে ঢুকে যেতে পারে। ওই লম্বা বাঁশের হুড়কো এমনিতেই নড়বড়ে। চোর আটকাবার জন্যে নয়, শেয়াল কুকুর যাতে ঢুকতে না পারে তার জন্যেই।

সারা গ্রামে আতঙ্ক। এমনিতে ভূত-প্রেতেরা সব গ্রামের রাস্তাতেই ঘুরে বেড়ায়। বেহ্মদত্যি বেলগাছের ডালে বসে থাকে, শাঁকচুন্নি বোয়ালমাছ ভাজা খাওয়ার জন্যে লম্বা হাত বাড়ায়, পেত্নী বাঁশঝাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে ভয় দেখায়। অন্ধকার, ঝোপঝাড়, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক, হুতোম প্যাঁচার ডানা ঝটপটানি—সব বললেন, 'বুঝলে দিদি, যত গণ্ডগোলের মূল তোমাদের ওই সাধুবাবা। ওকে বাড়ি থেকে তাড়াও, নইলে উপদ্রব কমবে না।'

পিসিমা জিব কেটে বলেন, 'ওরে ভূপেন্দ্র, এমন কথা বলিস না। বাবা সাক্ষাৎ শিব।'

বড়কাকাবাবু : 'শিব তো এ বাড়ি কেন? ওকে শ্মশানে পাঠিয়ে দাও।'

পিসিমা : 'শ্মশানে তো যেতেই পারেন, কিন্তু আমার কত সৌভাগ্য বল দিকিনি, তিনি আমার বাড়িতে অন্নগ্রহণ করছেন।'

বড়কাকাবাবু : 'নিজের অন্ন জোটে না, আবার অন্যকে অন্নদান। হুঃ তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কোনদিনই হবে না।'

রাত্রে বড়কাকাবাবুর উপস্থিতিতে আবার ভূতের আবির্ভাব হল। সেই হুড়কো নড়া, পিসেমশাইয়ের ছুটে গিয়ে ধস্তাধস্তি, নিস্তব্ধতার মাঝখানে সাধুবাবার 'বোম—বোম' চিৎকার। বড়কাকাবাবু সব ভালো করে দেখলেন। তিনি বরাবরই সাহসী মানুষ, ভূতপ্রেতকে মনে করেন বুজরুকি। তিনি হুড়কো খুলে নিজে যেতে চাইলেন রান্নাঘরের দিকে। কিন্তু পিসিমার মিনতিতে নিরস্ত হলেন।

বড়কাকাবাবু দেখলেন সবাই ব্যতিব্যস্ত, কেবল তাঁর ভাগনে শ্রীমান বেনুলাল কোন কথাটি না বলে নিজের ঘরে শুয়ে আছে। তিনি 'বেনু বেনু' বলে ডাকলেন, কিন্তু পিসিমা বললেন, ওকে ডাকিস না, বড় ঘুমকাতুরে। আর ভূতের ভয় ভীষণ। কেন মিছিমিছি বেচারাকে কষ্ট দেওয়া।

বড়কাকাবাবু কী একটা যেন আন্দাজ করলেন, পরের রাত্তিরে তিনি বললেন, বেনুর সঙ্গে এক বিছানায় আমি শোব। রাঙাদা খুব আপত্তি করলেন, কিন্তু বড় কাকাবাবুর তিন ধমকে রাজি হতে হল।

দু'জনে একসঙ্গে শুলেন, তবু যে—কে সেই। আবার একইভাবে হুড়কোর জাড়াজড়ি। তবে সেই রাত্তিরে টিনের চালে ঢিল পড়ল না।

বড়কাকাবাবু একটু চিন্তিত হলেন। তাহলে! ব্যাপারটা কী? তার সন্দেহ কি ঠিক নয়? সাধুবাবার ওপর কড়া নজর রাখলেন এবং রান্নাঘর, দরমার বেড়া, হুড়কো, রাঙাদার ঘর, তার ঘরের বেড়া ভালোভাবে পরীক্ষা করলেন। পিসিমা এসব দেখে একটু বিরক্ত হলেন কিন্তু ছোটভাইকে কড়া করে কিছু বলতেও পারলেন না।

ওদিকে বড়াকাকাবাবু রাঙাদাকে বললেন, 'চল আমার সঙ্গে শিলচরে। কয়েকদিন থেকে আসবি।'

রাঙাদা কিছুতেই রাজি না। বলেন, 'অনেক কাজ আছে মামাবাবু, পরে যাবে খন।' বড় কাকাবাবু আর কিছু বললেন না, শুধু রাত্রে রাঙাদার সঙ্গে এক বিছানাতেই শুতে গেলেন। আগের দিনের চেয়ে একটু তফাৎ করলেন। রাঙাদাকে অন্যপাশে দিয়ে নিজে শুলেন দরজার বেড়ার দিকটায়। তক্তপোষটা বেড়ার গা ঘেসেই। ওপাশে রান্নাঘর এবং হাত তিন চার দূরে অন্য শোবার ঘরে যাওয়ার জন্যে রান্নাঘরের সেই দরজা।

বড়কাকাবাবু লণ্ঠন জ্বালিয়ে ঠায় বসে রইলেন বিছানায়। কড়া নজর রাঙাদার দিকে। মাঝরাত্তির আসে। ও

ঘরে পিসিমা পিসেমশাই ও গাঁয়ের দু-চার জন লোক বসে। কিন্তু কি আশ্চর্য, হুড়কো নড়ল না। আরও অপেক্ষা তবু নড়াচড়া নেই। সবাই কেমন যেন হতাশ হয়ে গেলেন। একটু বাদে গাঁয়ের লোকেরা চলে গেলেন যে যার বাড়ি। পিসিমা পিসেমশাই বসে রইলেন হুড়কোর দিকে তাকিয়ে। যদি নড়ে।

নড়লো না। এবং রাতও পুইয়ে আকাশ ফর্সা হল। বড়কাকাবাবু রাঙাদার কান ধরে টেনে এনে হাজির করলেন পিসিমা পিসেমশাইয়ের কাছে, তারপর দুই গালে বড় চড়।

সবাই হতভম্ব। রাঙাদা ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলেন। বড় কাকাবাবু তাঁকে তখনও ধমকে চলেছেন।

আরও অবাক কাণ্ড। পিসিমা পিসেমশাইকে রান্নাঘরে নিয়ে দেখালেন, হুড়কোর সঙ্গে বাঁধা একটা শক্ত কালো গুলি সুতো। সেই সুতো দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে রাঙাদার বিছানার পাশে এক খুঁটিতে বাঁধা।

বড়কাকাবাবু বললেন, 'এবার বুঝলে তো দিদি, ভূতটা কে। তোমার গুণধর পুত্র। আমি তাই তো বলি, সারা বাড়ি তোলপাড় আর বেনু কী করে নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। তোমরা যখন ভূতের অপেক্ষায় বসে থাকো, তখন সে শুয়ে শুয়ে ওই কালো সুতো ধরে টান মারে। মারলেই হুড়কো নড়ে। বুড়ো বাপ ওর গায়ের জোরের সঙ্গে পারবেন কেন? তোমরা তো বিশ্বেস করার জন্যে বসেই আছ, আর ওই পাজিটা শুয়ে শুয়ে তোমাদের নাকাল করছে। আর তোমরা যখন হুড়কো টানাটানিতে ব্যস্ত তখন একবার অন্ধকারে বাইরে গিয়ে টিনের চালে ঢিল মেরে আবার এসে শুয়ে পড়ে এবং আবার ওর সুতোর কেরদানি দেখায়। দেখো, আজ রাত থেকে আর কিছু হবে না। এই দেখো সেই সুতো। যত বদ বুদ্ধি সব মাথায়। কোথায় গেল সেই হতভাগা?'

হতভাগা ততক্ষণে বাড়িতে নেই। ছুটে বাইরে। বড়কাকাবাবু সকালের ট্রেনেই শিলচর ফিরে গেলেন। রাঙাদা হেলতে দুলতে তারপর বাড়ি এলেন। মুখের ভাবখানা এমনই যেন কিছুই হয়নি।

তবে সত্যি সত্যি সেদিন রাত থেকে মেজ পিসিমার বাড়িতে ভূতের উপদ্রব থেমে গেল। মেজ পিসিমা বললেন, 'ভূপেন্দ্র বলল বটে, সুতোটাও দেখাল, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না, আমার বেনুলাল এই সব করেছে।'

সাধুবাবা বললেন, 'অবিশ্বাসী নাস্তিকদের কথায় বিশ্বাস রাখতে নেই। নন্দী—ভৃঙ্গীই এসেছিল। না, আর এখানে নয়, কালই কৈলাসে ফিরে যেতে হবে দেখছি।'

কোন কথা বললেন না শুধু পিসেমশাই। বহুদিন পর তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমোতেও পারলেন।

অদৃশ্য হাত

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

রাজহাটি গ্রামের শেষ প্রান্তে একটি ছিটেবেড়ার ঘরে বুড়ি থাকত। বুড়ির কেউ কোথাও নেই। সারাদিন গ্রামে গ্রামে ভিক্ষে করে সন্ধের পর ঘরে ঘিরত। আজ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে গ্রামগুলোর যে কি চেহারা ছিল তা আশা করি কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। গ্রাম তখন গ্রাম ছিল। গ্রামের বাইরে মাঠ ছিল, বন ছিল, জঙ্গল ছিল—দুর্ভেদ্য অরণ্য ছিল। এই ছিল তখনকার প্রকৃতি। সে যাক। বুড়ির ঘরের কাছে মস্ত একটি বটগাছ ছিল। আর সেই বটগাছের ছায়ার নিচে ছিল বুড়ির কুঁড়ে ঘর। খুবই দুঃখে দিন কাটত তার। ভোরবেলা উঠে মাঠে গোবর কুড়োত। কাঠ কুড়োত। তারপর দুটো শুকনো মুড়ি জল দিয়ে ভিজিয়ে খেয়ে ভিক্ষেয় বেরতো। ভিক্ষেয় বেরিয়ে দোরে দোরে ঘুরে যা জুটত তাই খেত। আর সারাদিনের ভিক্ষার সামগ্রী যা জুটল রাত্রে ঘরে ফিরে সেগুলো কাঠ কুটো জ্বেলে ফুটিয়ে ফাটিয়ে খেত। চাল ডাল আলু বেগুন সব একসঙ্গে খিচুড়ির মতো করে রেঁধে পেট ভরে খেয়ে মাটির দাওয়ায় শুয়ে ঘুমোত বুড়ি।

হঠাৎ একদিন বুড়ির মনে হ'ল সে যা কিছুই খায় খেয়ে তার পেট আর ভরে না। খেয়ে দেয়ে শুয়ে এক ঘুম দেবার পরই খিদেয় চন চন করে পেটের ভেতরটা। এই না দেখে বুড়ি ক্রমশ তার খাওয়া বাড়িয়ে যেতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য! সে যত খেতে লাগল ততই তার খিদে বাড়তে লাগল। কিন্তু না। তাতেও কোন সুরাহা হ'ল না। চারজনের রান্না একসঙ্গে রেঁধে খেয়েও পেট ভরাতে পারল না বুড়ি। তাই মনের দুঃখে একদিন গ্রামের দু'চারজন লোকের কাছে কথাটা বলেই ফেলল। সবাই শুনে অবাক হয়ে বলল—বলো কি! চারজনের রান্না একজনে খেয়েও পেট ভরাতে পার না? তার ওপর তোমার মতো বুড়ি মানুষ। এ হতে পারে না।

নিরাপদ মাস্টার এস গ্রামেরই পাঠশালার গুরুমশাই ছিলেন। বললেন—বেশ, দেখব বুড়ি তুমি কত বড় খাইয়ে। আজ তুমি ভিক্ষেয় বেরিও না। আমার ঘরে এসো। আজ তোমার নেমন্তন্ন। দেখব তুমি কত খাও।

বুড়ির তো আনন্দ আর ধরে না।

সে রাতে নিরাপদ মাস্টারের বাড়িতে খেতে এল বুড়ি। কিন্তু কি আশ্চর্য! চারজন কেন, একজন মানুষের খাবারও খেতে পারল না বুড়ি। সামান্য দু'চার গ্রাস মুখে দিতেই পেট ভরে গেল।

নিরাপদ মাস্টার বললেন—আসলে কি জান? তোমার এবার মতিভ্রম হয়েছে। বয়স কত হল?

—তা ধরো না কেন, তিন কুড়ি আর দশ।

—তা হলে এমন আর কি? সত্তর বছর। চোখে দেখতে পাও?

—একেবারে কানা নই, তবে ঠাওর হয় কখনো হয় না। কিন্তু বাবা, বিশ্বাস করো আমার কিচ্ছু হয়নি। ঘরে আমার খেয়ে পেট ভরে না।

—ভরবে ভরবে। আসলে তুমি বুড়ি মানুষ। নিজের ঘোরে থাকো। চাল ডাল ঠিক মতো নাও না।

—সে কি বাবা! আমার সারাদিনের ভিক্ষের চাল, সে বড় কম নয়। এত বড় একটা হাঁড়িতে করে সব

রেঁধেও খেয়ে আমি পেট ভরাতে পারি না।

—কিন্তু এই তো, আমার এখানে পোয়াটাক চালের ভাতও তুমি খেতে পারলে না।

বুড়ি আর কি করে, ঘরে ফিরে এসে মাটির দাওয়ায় আঁচল বিছিয়ে শুয়ে নানা রকম চিন্তা ভাবনা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন সকালে আবার মাঠে গিয়ে গোবর কুড়িয়ে বাগান থেকে কাঠ কুড়িয়ে দু'মুঠো শুকনো মুড়ি চিবিয়ে ভিক্ষেয় চলল বুড়ি। সারাদিন ভিক্ষে করে দিন শেষে ঘরে ফিরে ভিক্ষার সমস্ত চাল ডাল আলু বেগুন একসঙ্গে বড় হাঁড়িতে ফুটিয়ে নিয়ে খেতে বসল। কিন্তু আশ্চর্য! দু এক গ্রাস মুখে দিতে না দিতেই খাবারও ফুরিয়ে গেল, পেটও ভরল না তার—। আর যা ঘটল তা ভারি মজার।

বুড়ি যখন খাচ্ছিল আর মনে মনে কাঁদছিল তখন তার মনে হ'ল একটা অদৃশ্য হাত যেন তার পাত থেকে মুঠো মুঠো করে খাবারগুলো তুলে খেয়ে নিচ্ছে। বুড়ি যতবার হাতটা ঠেলে দিতে লাগল হাতটা ততবারই ওর পাত থেকে খাবার তুলে নিতে লাগল।

বুড়ি বুঝতেও পারল না কেন এমন হ'ল আর কেই বা সব খেল।

এই কথাটা বুড়ি পরদিন গিয়ে বলল নিরাপদ মাস্টারকে।

নিরাপদ মাস্টার চোখ কপালে তুলে বললেন—বলো কি! একটা হাত তোমার পাত থেকে খাবার তুলে খেয়ে নিতে লাগল, আর তুমি বসে বসে তাই দেখলে?

—কী করব বাবা?

—তা কে সে? চিনতে পারলে তাকে?

—কি করে চিনব? অন্ধকারে কি কিছু দেখা যায়? আমার ঘরে লম্ফ পিদিম কিছুই নেই।

—বুঝেছি। এ নিশ্চয়ই কোন চোর ছ্যাঁচড়ের কাজ।

—তা যদি হয় বাবা তাহলে তো তার আসা যাওয়ার বা মুখ নেড়ে নেড়ে খাবার শব্দ শুনতে পেতুম। কিন্তু শুধু একটা হাত ছাড়া আর কিছুই তো টের পেলুম না অন্ধকারে। হাতটাকে যত ঠেলে দিই সেটা ততই এগিয়ে আসে।

নিরাপদ মাস্টার বললেন—দেখ বুড়ি, তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে তোমার খাবার সত্যিই কেউ খেয়ে নিচ্ছে। হয় কোন চোর নয়তো হনুমানে। তোমার বাড়ির পাশেই যে বট গাছটা আছে সেই বটগাছে নিশ্চয়ই একদল হনুমান আছে। এ তাদেরই কাজ।

—না বাবা। হনুমান নয়। ও গাছে বাঁদর হনুমান মাঝে মধ্যে আসে বটে তবে সন্ধে হলেই দীঘির পারে চলে যায়। এখানে থাকে না। তাছাড়া আমি নিজে হাত দিয়ে ঠেলে দেখেছি ও মানুষের হাত।

—বেশ। তবে তুমি এক কাজ করো, আমার চিমনিটা নিয়ে যাও। ওটা জ্বেলে রেখে আজ রাত্রে খেতে বসে দেখো দেখি কে কিভাবে আসে।

বুড়ি তাই করল।

নিরাপদ মাস্টারের কথা মতো সে রাতে চিমনি লণ্ঠনটা জ্বেলেই খেতে বসল। কিন্তু কই? কেউ তো এল না। না কোন মানুষ, না বাঁদর হনুমান। এমন কি একটা কুকুরকেও আসতে দেখা গেল না। আর বুড়ি যা রান্না করেছিল তার প্রায় সবই ফেলা গেল। কেন না আলো জ্বেলে রাখার ফলে কেউই না আসায় যেমনকার খাবার তেমনিই রইল। বুড়ি আগে যেমন খেত তেমনই খেতেই পেট ভরে গেল তার। সে আর কত? সামান্য দু'এক মুঠো।

এর পর থেকে বুড়ি রোজই কম করে রাঁধতে লাগল। আর আলো জ্বেলে খেতে থাকল। ফলে কাউকেই আসতে দেখা গেল না।

তবে মুশকিল হ'ল এই তেলের অভাবে বুড়ি যেদিনই আলো জ্বালতে পারত না সেদিনই অনুভব করত একটা অদৃশ্য হাত তার পাত থেকে খাবার তুলে খেয়ে নিচ্ছে। কিন্তু যেদিন আলো জ্বেলে খেত সেদিন কিছুই হোত না। বুড়ি তাই নিরাপদ মাস্টারের কথা মতো রোজই আলো জ্বেলে খেতে লাগল।

এইভাবে প্রায় দিন দশেক কাটবার পর একদিন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। এক গভীর রাতে সবাই শুনতে পেল একটি করুণ কান্নার সুর। কে যেন ইনিয়ে বিনিয়ে গ্রামের পথে ঘাটে আনাচে কানাচে কেঁদে বেড়াচ্ছে এই কথা বলে 'বুড়িকে এমন বুদ্ধি কে দিলিরে? খিদেয় আমি মরে গেলুম। তার সর্বনাশ হোক—তার সর্বনাশ হোক—তার সর্বনাশ হোক।'

গ্রামের লোকেরা সবাই তখন সচকিত হয়ে উঠল। কে!কে কাঁদে? কে ওই কেঁদে কেঁদে অভিশাপ দেয়। বিলাপ করে আর অমঙ্গলের কথা বলে?

এক জ্যোছনা রাতে নিরাপদ মাস্টার নিজেই দেখলেন দৃশ্যটা। রাত তখন একটা। কি একটা কাজে বাইরে বেরিয়েছিলেন। এমন সময় দেখতে পেলেন একটা প্রকাণ্ড সাইজের কুলোর ওপর কালো কিম্ভুতকিমাকার বিচ্ছিরি চেহারার মানবাকৃতি কি যেন একটা বসে আছে। চেহারার তুলনায় হাত দুটো তার বিশাল। কুলোটা বাতাসে ভেসে ভেসে গ্রামের পথ পরিক্রমা করছে। আর সেই কিম্ভুতকিমাকার তার হাত দুটো দুলিয়ে কখনো নৌকো বাওয়ার মতো করে, কখনো কপাল চাপড়ে সুর করে কেঁদে কেঁদে বলছে বুড়িকে 'এমন বুদ্ধি কে দিলিরে? খিদেয় আমি করে গেলুম। তার সর্বনাশ হোক—তার...।'

এই দৃশ্য শুধু নিরাপদ মাস্টার নয় ওই গ্রামের আরও অনেকেই প্রত্যক্ষ করল। নিরাপদ মাস্টারের বউ অনেক ঠাকুর দেবতা ওঝা বদ্যি করতে লাগলেন যাতে তাঁদের সংসারে কোন অমঙ্গল না হয়। কিন্তু না, কিছুতেই কিছু হ'ল না। শাপ শাপান্তও কমল না। তাই দেখে অনেকেই অবশ্য বলল, ওর কথায় কান দিও না। আসলে ওটা একটা উজবুক তাস ওই সব বলে বেড়াচ্ছে। তোমরা তো ওর কোন ক্ষতি করো নি। তবে ভয় কি। শকুনির শাপে গরু মরে না। ওর যা ইচ্ছে বলুক।

এইভাবে আরও দু'তিন মাস কেটে যাবার পর এক ঝড় জলের রাতে বট গাছের একটি ডাল ভেঙে পড়ল বুড়ির কুঁড়ে ঘরের ওপর। ঘুমন্ত বুড়ি ঘর চাপা পড়ে মরে গেল। আর বলতে নেই সে রাত থেকেই সেই বিচ্ছিরি চেহারার কিম্ভুতকিমাকারটাকে কুলোয় দেখা গেল না। এমন কি তার শাপ শাপান্ত কান্নাকাটি সব কিছুই থেমে গেল চিরতরে। তবে সেই ঘটনার পর থেকে রাজহাটি গ্রামের লোকেরা আজ পর্যন্ত সন্ধের পর আলো না জ্বেলে কখনো খেতে বসে না কেউ।

অবুঝ ভূতের গল্প

বাণী রায়

সবুজ সাহিত্যের পাতায় নানা অবুঝ ভূতের গল্প পড়ে পড়ে আমার মনেও অবুঝ ভূতের গল্প দানা বাঁধে। 'অবুঝ' মানে ঠিক বুঝেছ, পাঠক-পাঠিকা? এমন গল্প, যার কোন যুক্তিগত অর্থ খোঁজা শক্ত।

এমনি একটি শোনা ভূতের গল্প লিখছি আজ। প্রথমেই বলে নিচ্ছি সত্যমিথ্যা প্রমাণের দায়িত্ব আমার নয়। পশ্চিমে বহুদিন প্রবাসিনী আমার জ্যাঠাইমা সম্পর্কিতা এক চমৎকার মজলিসী মহিলার মুখে গল্পটি শুনেছিলাম। বিচিত্র গল্পটি মনেও রেখেছি, বহুবার বহু লোককে শোনানোর পরেও।

পশ্চিমের কোনও একটা শহরে কোনও এক ভদ্রলোকের কথা।

লোকটি অফিসে চাকরি করত। বাড়িতে একমাত্র স্ত্রী ছিল। অফিস থেকে একদিন ফেরার পর বড় গরম বোধ হতে লাগল ওর। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়।

সে স্ত্রীকে ডেকে বলল, "ওগো, আমি একটু বাইরে ঘুরে ঠান্ডা হয়ে আসি গো। তুমি রুটি বানাও, ফিরে এসেই একেবারে রাতের খাওয়াটা সেরে নেব। স্ত্রী গজ গজ করতে লাগল, "অফিস থেকে ফিরে মাত্র এককাপ চা খেয়ে আবার বার হচ্ছ? তাড়াতাড়ি ফিরো কিন্তু। আমি এক্ষুনি রান্নাবান্না সেরে রাখছি।"

লোকটি রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে খানিকটা দূরেই চলে এল। রাস্তা তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। ও অঞ্চলের টিমটিমে গ্যাসবাতি তখনও জ্বলেনি।

রাস্তার পাশে মাঠ। দুদিকে রাস্তায় বড়-বড় গাছ লাগানো। আধো-অন্ধকারে এক ঝাঁকড়া ঝুরি-ঝোলানো বটগাছের তলায় চানাচুরওলাকে দেখা গেল।

লোকটি ভাবল : পায়ে-পায়ে অনেকটা দূরই এসেছি। আবার অনেকটা দূরই ফিরতে হবে। একঠোঙা চানাচুর কিনে খেতে খেতে যাই। খালি পেটে খিদের জ্বালা এখন বোঝা যাচ্ছে। বউ-এর কথা শুনে নিলেই হ'ত।

চানাচুরওলার কাঠের বারকোষে ঠকাস করে একটা দোয়ানী রেখে (তখন দোয়ানী ছিল, হালের পয়সার আমল নয়) লোকটি চাইল একঠোঙা চানাচুর।

চানাচুরওলার গায়ে ময়লা জামায় গা-ঢাকা, মাথায় সাদা ময়লা কান-ঢাকা টুপি। মাথা নামিয়ে একমনে গরম চানায় ঝাল-ঝাল মসলা মাখছে। গাছের ঝুরি-ঝোলা আবছা অন্ধকারে লোকটির দিকে দেখছি। মুখে কোনও কথা নেই।

গরম গরম লালচে মটরের দানা অন্ধকারেও দেখা যায়। লোকটি ক্ষুধার্ত ও লোভার্ত হয়ে হাত বাড়িয়েই চমকে উঠল।

চানাওলা দু'হাতে ঠোঙা ধরেছে। তখন দু'আনার চানাবেশ অনেকটা হ'ত। যে হাত দু'খানি ঠোঙাধরে এগিয়ে দিচ্ছে, চানাওলার সেই হাত দু'খানি মোটেই মানুষের হাত নয়।

ওরে বাবা!

আগাগোড়া মানুষের চেহারা চানাওলার। হাত দু'খানি কব্জী পর্যন্ত মানুষের।

তারপরেই গলদ!

কব্জী থেকে হাতের পাতা আরর হাত নয়। ঘোড়ার ক্ষুর দু'খানা!!

লোকটি ভয়ে-বিস্ময়ে পাগল হয়ে বাড়ির পথে ছুটে ফিরতে লাগল। চানার ঠোঙা যেমন তেমনি পড়ে রইল।

খানিকটা পথ এসে দেখল এক পাহারাওলা চারিদিকে দৃষ্টি রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গদাইলস্করী চাল। হাত প্যান্টের পকেটে পোরা। যেন পুরো সাহেব।

পাহারাওলাকে দেখে লোকটির দেহে প্রাণ এল ফিরে। এইবার ভরসা পেলাম, বাবা!

সে তাড়াতাড়ি পাহারাওলার কাছে এগিয়ে এসে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, "ও দাদা, এক কাণ্ড হয়েছে!"

"কী কাণ্ড?"

লোকটি সমস্ত খুলে বলল যা দেখেছে।

পাহারাওলার মুখে হাসি।

লোকটি অধীর হয়ে বলল, "না দাদা, হাসবেন না। আমি মোটেই ভুল দেখিনি। চোখ রগড়ে রগড়ে দেখেছি। প্রথমটা চোখকে বিশ্বাস করিনি কিনা!"

এবার পাহারাওলার অট্টহাস। হাসতে হাসতে সে ধীরে-সুস্থে প্যান্টের পকেট থেকে নিজেই হাত দু'খানা বার করে লোকটি নাকের ডগায় ধরে জিজ্ঞাসা করল, "ভায়া, দেখতো এই হাত নাকি?"

সেই ঘোড়ার ক্ষুর!

পাহারাওলার কব্জীতে বসানো সেই একজোড়া নালবাঁধা ঘোড়ার ক্ষুর!

"ওরে বাবা, গেছি, মরেছি!"

লোকটি ছুটতে ছুটতে বাড়ির দরজায় এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, 'খোলো, দরজা খোলো।"

লোকটি পাগলের মতো দরজায় ঘা দিতে দিতে চিৎকার করতে লাগল। যদিও চানাওলা বা পাহারাওলা একবারও তাকে তাড়া দেয়নি, তবু সে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। কী জানি ধরে ফেলে যদি?

তার বাড়িটি শুধু নিরাপদ। এখানে স্ত্রী আছে, গরম খাবার আছে। আর সে বাড়ি থেকে বেরোবে না। কালই সে এ শহর ছেড়ে বউকে নিয়ে চলে যাবে অন্য কোথাও।

স্ত্রী চট করেই দরজা খুলে দিল। বেচারী বোধহয় স্বামীর পায়ের শব্দের আশায় বসেছিল।

লোকটির তখন কথা বলার সাধ্য নেই। হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে সে হাঁ করে। মোটা মানুষ, তার বয়স চল্লিশ হয়েছে। এক ছুটে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে এতটা পথ ঠেঙিয়ে ছুটে এসে বেজায় কাবু হয়ে পড়েছে।

মুখে কথা সরছে না। তবু বউকে দেখে লোকটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল, "জানো, কি হয়েছে? কী ভয়ানক সব পথে দেখলাম!"

কোন মতে গল্পটা সে বলে দিল।

স্ত্রী তখন কাপড়েরর মধ্য থেকে নিজের দু'খানা হাত বা'র করে তার চোখের সম্মুখে মেলে ধরল।

"দেখ তো, এই হাত নাকি?"

লোকটির আর কথা বলার ক্ষমতা হ'ল না। এক চিৎকার দিয়ে সে ধরাস করে পড়ে গেল দরজায়।

শব্দ শুনে তার আসল স্ত্রী রান্নাঘর থেকে এসে দেখল, সে আর নেই, সে মরে গেছে। একা পড়ে আছে দরজায়।

এখানেই গল্পটা শেষ। যে-কোন ভূতের গল্পে নাই। কিন্তু 'অবুঝ' অংশটা যে, লোকটি অভিজ্ঞতার কথা অন্য কেউ জানল কেমন করে? চানাওলার হাতে ক্ষুর দেখে সে বলল পাহারাওলাকে। পাহারাওলা তো ভূত। আবার পাহারাওলার হাতে ঘোড়ার ক্ষুর দেখে সে বলল কাকে? স্ত্রীকে। যে-স্ত্রী সেজে এসেছে আবার ওই ভূতই।

আসল স্ত্রী যখন এল, তখন সে তো বলাকওয়ার অতীত হয়ে গেছে।

তবে এটা নিছক গল্প? যে-লেখক সমস্ত অদেখা জিনিস দেখতে পান, সমস্ত অজানা জিনিস জানতে চান, তিনি এটি সৃষ্টি করেছেন।

কিন্তু, বিজ্ঞানের যুগে তোমরা মেনে নেবে? 'অবুঝ' অংশ থেকেই যায় তাহলে।

যুক্তি দিয়ে বোঝা যাক।

লোকটির শরীর সারাদিন অফিসের পরিশ্রমে ও গরমে খারাপ হয়েছিল। তাই সে বিকালের জলখাবার না খেয়েই ঠান্ডা হতে গেল মাঠেঘাটে।

অসুস্থ শরীরে আবছা আলোয় সে ভুত দেখেছিল যে চানাওলার হাতে ঘোড়ার ক্ষুর বসানো। ভয় পেয়ে এসে আরও মাথা গুলিয়ে গেল ওর। পাহারাওলা হেসে হেসে ঠাট্টা করে নিজের হাত দেখাল। সে হাতে নিশ্চয় নূতন ধরনের দস্তানা আঁটা ছিল। চল্লিশের বছরে চোখে চালসে পড়ে কিনা।

আরও ভয় পেয়ে যখন সে বাড়ি এল তখন তার অবস্থা চরমে। আধ-বুড়ো লোকটা অসুস্থ মোটা দেহ নিয়ে গরমে অতটা ছুটেছে। স্ত্রী ও ঠাট্টা করে নিজের হাত দেখিয়েছিল নির্ঘাত। আজগুবী কথা শুনলে সবাই তাই করে থাকে। আসল স্ত্রীই দরজা খুলেছিল। তখন লোকটা চোখে-কানে দেখছিল না ভয়ে আর অসুস্থতায়। যা দেখছে তাতেই ঘোড়ার ক্ষুর আঁকা দেখছে। একে বিকার বলে।

মোটা প্রৌঢ় লোক ছুটে বেদম হয়ে ভয় পেয়ে হার্টফেল করে মরল।

এর মধ্যে ভূত কোথায়?

যাই হোক, শৈশবে শোনা আমার জ্যাঠাইমা 'নেবুর মা' নামে খ্যাত তরুলতা রায়ের মুখে শোনা গল্পটার এমনি এক যুক্তি ভিত্তি নিজের মনে খাড়া করলাম।

তোমরা যা ইচ্ছা ভেবে নাও।

রামকিঙ্করবাবুর অদ্ভুত ভাড়াটে

হিমানীশ গোস্বামী

ভাড়াটে লক্ষ্মণ বাবুর মৃত্যু ঘনিয়ে আসছিল। তিনি ইঙ্গিতে রামকিঙ্কর বাবুকে আসতে বললেন। লক্ষ্মণবাবুর সঙ্গে রামকিঙ্করবাবুর সম্পর্ক যদিও ভাড়াটে-বাড়িওলার, কিন্তু ছত্রিশ বছর ধরে এত পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও কখনও কলহ বিবাদ হয়নি। আর হবেই বা কেন বাড়িওলা রামকিঙ্করবাবুর মেজাজ ছিল নরম, ভাড়াটের মেজাজও পাল্লা দিয়ে আরও নরম। দু-তিন বছর পর পর লক্ষ্মণবাবু রামকিঙ্করবাবুর কাছে এসে বলতেন আগামী মাস থেকে ভাড়াটা বেশি নেবেন রামবাবু, যে-রকম খরচা বাড়ছে, আপনার নইলে চলবে কেন? আর রামবাবু বলতেন, কী বলছেন লক্ষ্মণবাবু, এ কি কথা। এই তো তিন বছর আগে কুড়ি টাকা ভাড়া বাড়ানো হয়েছে, না-না, আর নয়। পরে দেখা যাবে। কিন্তু পরে দেখা যাবে বললেই তো হয় না, লক্ষ্মণবাবু একেবারে যেন মরীয়া! তিনি বলেন, ঠিক আছে যদি এই মাস থেকে আরও তিরিশ টাকা বেশি না নেন তা হলে অন্য পন্থা ভাবতে হবে। অন্য পন্থার কথা শুনে রামকিঙ্করবাবু হাঁ হাঁ করে ওঠেন। তিনি বলেন, না লক্ষ্মণবাবু অমন কর্মটি করবেন না। ঠিক আছে, আপনি ভাড়া বাড়াতে চান ঠিক আছে, কিন্তু তাই বলে এক ধাক্কায় ত্রিশ টাকার দরকার কি। পোনের টাকাই যথেষ্ট। ওই কথা শুনে গুম হয়ে যান লক্ষ্মণবাবু। তিনি বলেন, হয় ত্রিশ টাকা বাড়াতে হবে নয়তো...।

লক্ষ্মণের এই নয়তোটাই মারাত্মক এক শক্তিশেলের মতো রামকিঙ্করবাবুকে আঘাত করে। এই 'নয়তো' ব্যাপারটা আর কিছু নয় লক্ষ্মণ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার ইঙ্গিত করছেন। রামকিঙ্করবাবু বলেন, ঠিক আছে পরশু থেকে আপনার ফ্ল্যাটটির চুনকাম করিয়ে দেব, তা ছাড়া দরজা জানালাগুলোও রঙ করিয়ে দেব।

—উহুঁ! লক্ষ্মণবাবু বলেন, পাগল হয়েছেন রামবাবু? এই তো আড়াই বছর আগে চুনকাম করিয়ে দিয়েছেন, তার উপর আবার রঙও করিয়েছেন। মুখ ধোয়ার বেসিনটা একটু চিড় ধরেছিল সেটাও বদলে দিয়েছেন। বলব কি এর উপর বাড়াবাড়ি করে একটা গীজার পর্যন্ত বসিয়েছেন, এ বছরটা আর রঙ করানো কেন চুনকামই বা করা কেন।

রামকিঙ্করবাবু বলেন, ঠিক আছে। আগামী বছরে আমাকে আর বারণ করবেন না। আর একটা কথা, কখনও এই বাড়ি ছেড়ে দেবার কথা বলবেনও না ভাববেনও না। তা হলে কিন্তু মনে ব্যথা পাব।

লক্ষ্মণবাবু আশ্বাস দেন। বলেন, কিছু মনে করবেন না রামকিঙ্করবাবু, আপনি এমন ভাল লোক যে আপনার সঙ্গে বিবাদ করতে ইচ্ছেই করে না। কিন্তু আপনি যে একটু অবুঝ হয়ে পড়েন। সামান্য একটু ভাড়া বাড়ানো এমন কিছু অন্যায় অনুরোধ তো নয়। যাক আপনার কথাই আমি মেনে নিচ্ছি, আপনার মতো ভাল বাড়িওলার বাড়ি কখনই ছাড়ব না, মরে গেলেও না।

প্রায় ত্রিশ বছর আগে এই রকম কথাবার্তা হয়েছিল আদর্শ বাড়িওলা এবং আদর্শ ভাড়াটের মধ্যে। তারপর

আস্তে আস্তে সময় বদলেছে। লক্ষ্মণবাবুর স্ত্রী মারা গেছেন, বড় ছেলে চলে গেছে আমেরিকায় অধ্যাপনার কাজে, মেয়েরও বিয়ে হয়ে চলে গেছে, তবে কাছেই থাকে। রামকিঙ্করবাবুও প্রায় একা হয়ে পড়েছেন। তাঁর দুই মেয়ের এক মেয়ে থাকে বোমবাইয়ে, আর একজন কাছেই থাকে, সে মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে এক ছেলে আর দুটি মেয়ে নিয়ে। সেই সময়টা ভারি খুশি হয়ে পড়েন রামকিঙ্করবাবু। লক্ষ্মণবাবুরও তখন আনন্দ বেড়ে যায়। বাড়িতে সব সময়ের জন্য থাকে একজন ঠাকুর। তারও বয়স হয়েছে। তার নাম দুখিরাম। বাংলাদেশে তার কিছু আত্মীয়-স্বজন থাকে, বছরে একবার চলে যায়, সেই সময়টা মেয়ে এসে থাকে। আর সেই কারণেই বাড়িওলা আর ভাড়াটের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও বেড়েছে। খাওয়া দাওয়াও দুজনে এক সঙ্গে করেন। ওঁদের যে-সব বন্ধুবান্ধব আছেন তাঁরা এলে এক সঙ্গে প্রায়ই তাস খেলায় মেতে ওঠেন ওঁরা। কখনও বা দাবা নিয়ে খেলতে বসেন। কারও অসুখ হলে দেখাশোনা করেন, ডাক্তারকে খবর দেন। এই রকমই চলছিল গত কয়েক বছর। এই সময় লক্ষ্মণবাবুর খুব একটা অসুখ করে। তিনি বুঝতে পারেন তিনি আর বেশিক্ষণ বাঁচবেন না। তিনি রামকিঙ্করবাবুকে ডেকে বলেন, ভাই রাম আমি তো চল্লাম। যাওয়ার আগে বলতে চাই বড় আরামে ছিলুম ভাই। এমন চমৎকার ব্যবহার! আমার মরেও শান্তি হবে না। স্বর্গে না নরকে কোথায় যে শালারা ফেলবে কে জানে, কিন্তু যেখানেই থাকি আমার ভাল লাগবে না।

—না না কি বলছ ভাই লক্ষ্মণ। তুমি থাকবে। মরবে কেন? আমি থাকতে তোমার যাওয়া চলবে না। সে বড় অন্যায় হবে।

—আমি কি যেতে চাই রাম? কিন্তু যমদূতেরা শিওরে দাঁড়িয়ে, এখন তো আর বাঁচার কোন কায়দা নেই।

—দাঁড়াও আমি বঙ্কিম ডাক্তারকে ডাকি। ধন্বন্তরি ডাক্তার। বহু যমদূতকে যমের বাড়ি পাঠিয়েছেন তিনি!

—ও সবে কাজ নেই। বঙ্কিম ডাক্তার আমাকে ক-দিন সুস্থ রাখবেন? আর বড় জোর তিন দিন, কি ধরো তিন মাস? ওতে আমি নেই। আমি চললাম। আর আমি এখানেই থাকব। তোমার কোনও অসুবিধে হবে না। কেবল দেখো যেন আমার শ্রাদ্ধটা ঠিক মতো না হয় ব্যাস তা হলেই হবে!

—তার মানে? শ্রাদ্ধ ঠিক মতো না হয় এর মানে কি? তুমি ভুল বলছ লক্ষ্মণ। আসলে তুমি বলতে চাও শ্রাদ্ধ যেন ঠিক মতো হয় এই তো?

—না না। আমি ঠিকই বলছি। শোন রাম, ছত্রিশ বছরের সম্পর্ক তোমার সঙ্গে। বড় জড়িয়ে গেছি। আমার আত্মার শান্তি হলে, মানে শ্রাদ্ধ ঠিক মতো হলে আমার আত্মার শান্তি হবে, কিন্তু সে শান্তি আমি চাই না। আমি এই পৃথিবী ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না। পৃথিবী নয়, এই চারের একের এক বিড়িওলা রোড থেকে কোথাও গেলে আমি আর বাঁচব না। যমদূতেরা নিয়ে যাক যেখানে ইচ্ছে। বেটারা বাপ বাপ বলে ফেরত দিয়ে দিতে বাধ্য হবে যদি আমার আত্মার শান্তি না হয়। দেখো রাম জগতে থেকে এইটেই সার বুঝেছি শান্তি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি একঘেয়ে জিনিস। কোনও চিন্তা নেই, আর তাই দুশ্চিন্তাও নেই। শান্তিতে থাকা মানেই সর্ব ব্যাপারে তৃপ্তি। সেটা মোটেই একটা সুখের ব্যাপার হবে না। আমি সুখই চাই, শান্তি চাই না। যারা সুখ আর শান্তি দুইই চায় তারা মূর্খ। তারা জানে না সুখ আর শান্তি দুটি আলাদা ব্যাপার। যেখানে সুখ সেখানে শান্তি থাকতেই পারে না। শান্তি মানে সমস্ত ইচ্ছের পরিসমাপ্তি...।

হাঁপাতে লাগলেন লক্ষ্মণ।

—থাক থাক আর কথা বলো না ভাই লক্ষ্মণ, আর কথা বলো না। আমি সব বুঝে গিয়েছি। জানি না এর

ফলে কি হবে, হয়তো ভয়ঙ্কর কোন কাণ্ড হবে, কিন্তু তোমার অনুরোধ আমি ঠেলতে পারব না। তুমি যা বলছ তাই করব।

—তা হলে আমি চোখ বুজলাম। এই বলার পরই তাঁর দেহ স্তির হয়ে গেল। রামকিঙ্করবাবুর চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল পড়তে লাগল।

শ্রাদ্ধ যথানিয়মে হয়ে গেল। অনুষ্ঠান সবই হল তবে রামকিঙ্করবাবু আসল পুরোহিত না এনে এক অভিনেতাকে পুরোহিত সাজিয়ে নিয়ে এলেন। তারপর যে-সব সামগ্রীর প্রয়োজন, যা না হলে শ্রাদ্ধ হয় না এমন সব সামগ্রীর বদলে অন্য রকম সব সামগ্রী সংগ্রহ করলেন। দুধের বদলে সাদা রঙ গোলা জল, চন্দনের বদলে সেগুন কাঠ, আতপ চালের বদলে গমের তৈরি খুদে খুদে সব চালের মতো দেখতে জিনিস আনলেন। গঙ্গা জলের বদলে এক ডোবা থেকে জল এনে তাতে কাদা মিশিয়ে দিলেন, একবার পূজা হয়ে গেছে সেই সব ফুল জোগাড় করলেন, আর পুরোহিত যে মন্ত্র পড়ল তার কোনও মানে হয় না। এক সংস্কৃত রামায়ণ থেকে বাংলায় কিছু পৃষ্ঠা নিয়ে তাই পড়লেন। ছেলে আমেরিকায় থাকে, সে অতি আধুনিক। সে মাথাও কামাল না। তাতে রামকিঙ্করবাবু খুশি হলেন। তবে মেয়ে তার অংশটি পালন করল শুদ্ধ ভাবেই। লক্ষ্মণবাবুর ছেলে বলল, এ বাড়ির সব জিনিসপত্র তার বোন নিয়ে যাবে। যে সব জিনিস দরকার নেই সে-সব জিনিস বিক্রি করে সেই টাকাটা তার বোন নিয়ে নেবে। বলে সে নিজের জায়গা আমেরিকায় চলে গেল ফের।

২

এর সপ্তাহ তিনেক পর রামকিঙ্করবাবু বাড়িতে রাত্রে ঘুমোচ্ছেন এমন সময় হঠাৎ তাঁর মনে হল তাঁর ঘরে কেউ এসেছে। কেমন যেন আওয়াজ হচ্ছে। তিনি চমকে চমকে বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন। ভয়ে ভয়ে বললেন, কে?

—আহা আমি, ঘুম ভাঙালুম বুঝি রাম? ভারি অন্যায় হয়ে গেছে আমার।

রাম বললেন, কে লক্ষ্মণ? এসো এসো। বাঃ আসতে পারলে?

—পারব না? শ্রাদ্ধ যা করেছিলে তাতে না এসে কি পারি? ব্যাপারটা কি হয়েছিল শুনবে?

—শুনবে বই কি! বাঃ তোমার কথা শুনব না?

—কিন্তু তার আগে এক কাপ চা হলে হত না?

—চা খাবে? বাঃ বেশ তো। চা খাবে বই কি।

—বড় তেষ্টা। সেই কোথায় যমের বাড়ি। সেখান থেকে এতটা পথ প্রায়ই উড়তে উড়তে এসেছি। ক্লান্তি নেই বেশি, তবে তেষ্টা বেশ পেয়েছে।

রামবাবু উঠে পড়েছে বিছানা ছেড়ে। বললেন আমিই চা করে দেব। দুখিরামকে ডাকার দরকার নেই। তোমার কথা শুনলে সে হয়তো ভয়েই অজ্ঞান হয়ে যাবে।

লক্ষ্মণবাবু বললেন, আরে এ-সব কাজ আমিই করতে পারতাম। আমারই করবার কথা। কিন্তু জানো তো মরবার কতদিন পর পর্যন্ত যেন আত্মার শারীরিক ক্ষমতা তেমন থাকে না। মন আমার আগের মতো হলেও আত্মার বয়স তো কম। সবে তিন সপ্তাহ! মনে হয় লাগবে গায়ে জোর হতে।

সে রাতে দুজনে মিলে অনেক কথা হল চা খেতে খেতে।

তারপর লক্ষ্মণবাবু বললেন, আমি চল্লাম।

—কোথায় যাবে এত রাত্রে?

—কেন আমার ঘরে? আমার ঘর ঠিক আছেতো?

—ঘর তো ঠিক আছে, কিন্তু আসবাবপত্র তো কিছু নেই।

—সর্বনাশ! গেল কোথায়, সে-সব?

—তোমার মেয়ে সব বিক্রি করে দিয়েছে। ঘর এখন খালিই বলতে পার।

—তা হলে তো ভারি বিপদ! সব নিয়ে গেছে?

—সব।

—আমার টেলিফোন?

—সেটাও।

—গুম হয়ে গেলেন লক্ষ্মণবাবু। বললেন, তুমি একটু বুদ্ধি খরচ করতে পারলে না? আমি তোমাকে এত করে বলে গেলাম ফিরে আসব।

—ভুল হয়ে গেছে ভাই, আমাকে মাপ করো।

—আবার নতুন করে সব সংগ্রহ করা কি সোজা কথা? খুব দুঃখের সঙ্গে বললেন লক্ষ্মণবাবু।

—আজকের মতো এই আমার ঘরেই কাটিয়ে দাও। কালই তোমার জন্য সব ব্যবস্থা করে দেব। নতুন খাট আলমারি চেয়ার টেবিল সব এসে যাবে।

—তা হলে ভাড়াটা কি রকম হবে?

—ভাড়া? ভাড়ার কথা উঠছে কোত্থেকে? তুমি আমার বন্ধু বন্ধুর কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া হয় কখনও? তাছাড়া আগে সে অন্য রকম ব্যাপার ছিল, এখন তোমার...।

চুপ করে গেলেন রামকিঙ্করবাবু।

—আমার কি?

—তোমার...মানে তোমার স্ট্যাটাস বদলে গেছে না?

—হুঁ বললেই হল স্ট্যাটাস বদলে গেছে?

রামকিঙ্করবাবু বললেন, নিশ্চয়ই বদলে গেছে। আগে তুমি ছিলে শরীরী। এখন তুমি হচ্ছ গিয়ে অশরীরী।

—তাতে কি হয়েছে? ওজনটা একটু হালকা হয়েছে বলতে পারো। উঃ শরীরটা যখন ভারি ছিল তখন চলতে ফিরতে বেজায় কষ্ট হত। এত হালকা হওয়া ছাড়া আর কি আমার বদল ঘটেছে?

—ঘটেনি বলতে চাও?

—ঘটেনি। আমি আগে যা ছিলাম তাই তো আছি।

—ঠিক তাই কি আছ? আচ্ছা একটা পরীক্ষা করব তোমাকে, রাজি?

—রাজি!

—আমার নাম জানো?

—জানি বই কি?

—বলতো?

—রামকিঙ্কর!

—মোটেই না। রামকিঙ্কর আমার নাম নয়।

—ঘামকিঙ্কর।

—হলো না।

—দামকিঙ্কর? হল না? গামকিঙ্কর তবে। অ্যাঁ তাও হল না?

—তুমি নিজের নাম বলতো?

—বক্ষণ মুখোপাধ্যায়।

হা হা করে হাসলেন রামকিঙ্কর। বুঝতে পারলে কেন হাসলাম?

—না।

—তোমার স্ট্যাটাস বদলে গেছে বন্ধু! তুমি রাম লক্ষ্মণ কিছুই উচ্চারণ করতে পারবে না।

লক্ষ্মণবাবু এরপর অনেক চেষ্টা করেও রাম বা লক্ষ্মণ উচ্চারণ করতে পারলেন না।

—আচ্ছা আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তুমি যে চা খেলে সেটা কেমন লাগল?

—যাচ্ছেতাই।

—কেন জানো? চা কিন্তু চমৎকার দার্জিলিংই ছিল।

—দার্জিলিং চা এমন খারাপ লাগবে কেন?

—তোমার পরিবর্তন হয়েছে। দেহের এবং মনের। দেহ অবশ্য নেই। আছে দেহের একটা আবছা আভাস। এখন তোমার অন্যরকম জিনিস খেতে ভাল লাগবে।

একটা পুরো ফ্ল্যাট দখল করে থাকা নয়, নতুন আসবাবপত্র তার উপ দু বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা, না ঘামবাবু তোমাকে এই হাজার পাঁচেক টাকা মাসে নিতেই হবে।

রামকিঙ্করবাবু প্রায় আঁতকে উঠলেন। বললেন, বলো কি লক্ষ্মণ, তা কখনো হয় নাকি? পাঁচ হাজার টাকা!

—আরে আমার কি টাকার ভাবনা আছে নাকি? লক্ষ্মণবাবু বললেন, তুমি শুধু বলবে অমুক লোক বদমায়েশ, তমুক লোক বউকে মারে, কিংবা কেউ ঘুম খায়, বাস আমি তাদের বাড়ি থেকে সব নিয়ে আসব জিনিসপত্র। আচ্ছা হরিদাস বাবুতো অন্যের ফ্ল্যাট করিয়ে দেবে বলে কত লোককে ফাঁকি দিয়ে কত লক্ষ টাকা গায়েব করেছিল, তার বাড়িতে কালই যাব। গিয়ে মজা দেখাব যা একখানা!

—না না লক্ষ্মণ, অমন কাজও করো না। অন্যের জিনিসপত্র এ বাড়িতে এনে রাখলে আমাকে চুরির দায়ে জেলে পুরে দেবে। সে এক কেলেঙ্কারি হবে। না লক্ষ্মণ ও সব বদ মতলব ছেড়ে দাও।

লক্ষ্মণ বলল, তা হলে আর কি কেবল টাকাই নিয়ে আসব। সুহাসবাবু আদালতে সামান্য কেরানিগিরি করে গোলপার্কের কাছে এক বিঘে জমি কিনেছে, হুঁ, ওর বাড়িতে কাল রাত্রেই হানা দেব। বাড়িতে নিশ্চয় টাকার পাহাড় আছে শয়তানের...।

রামবাবু বললেন, দ্যাখো লক্ষ্মণ যখন তুমি জ্যান্তো ছিলে তখন তো এসব আইডিয়া মাথায় আসেনি। তখন তো কারুর বিরুদ্ধে কোনও কিছুই করনি। এখন হঠাৎ এই বাতিক উঠল কেন?

হঠাৎ নয়। আমি যমেরবাড়ি থেকে ফিরবার পথে এই সব কথা নতুন করে মনে উদয় হচ্ছিল। ভাবলাম

সারা জীবনটা নিজের নিজের করেই গেলাম। নিজের কথা ছাড়া ভাবিনি অন্য কারুর কথা। কত লোক কত ভাবে অত্যাচারিত, শোষিত! আর আমরা কি করেছি?

রামকিঙ্করবাবু বললেন,... তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো সারাদিন বাজাইলি বাঁশি! এখন আর আক্ষেপ করে কি হবে?

—এখন কি কিছুই করা যায় না?

—ভয় দেখিয়ে লোককে অজ্ঞান করতে পার। কিন্তু তাতে কি দেশ থেকে পাপ উধাও হয়ে যাবে?

লক্ষ্মণবাবু অনেকক্ষণ কি ভাবলেন। বললেন, মানুষের দুঃখ দুর্দশা এসব এই রকমই বলতে থাকবে।

—কি জানি। রামকিঙ্করবাবু বললেন। যা হচ্ছে তা ঠেকাবার উপায় তো নেই। এখন একটু ঘুমনো যাক।

—আমি কোথায় শোব?

—কেন পাশের ঘরে একটা খাট আছে বিছানাটা একটু ঝেড়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছি।

—না না পরিষ্কার করার কি দরকার। একটু ধূলো বালি থাকা ভাল।

রামকিঙ্করবাবু বললেন, গুড নাইট।

লক্ষ্মণবাবু পাশের ঘরে চলে গেলেন।

সকাল হলে রামকিঙ্করবাবু ফ্রিজ থেকে একটা মাছ বের করে পুড়িয়ে লক্ষ্মণবাবুকে ডাকতে গেলেন দুখিরাম ঘুম থেকে ওঠার আগেই। দুখিরাম ব্যাপারটা জানতে পারলে কি কাণ্ড করে বসবে কে জানে?

পাশের ঘরে গিয়ে ডাকলেন, ও লক্ষ্মণবাবু?

কোনও উত্তর নেই।

অনেকক্ষণ ডাকবার পর ব্যাপারটা বোঝা গেল। দিনের আলোয় অশরীরীদের পাত্তা পাওয়া যায় না।

যাই হোক, তিনি সকালেই পাড়ার একটা ফার্নিচারের দোকান থেকে আনালেন একটা ভাল খাট, গদি, বিছানার চাদর, বিছানা-ঢাকা, বালিশ। এমনকি মশারিও একটা কিনে ফেললেন। ভাবলেন কি জানি যদি দরকার হয়। পাড়ার লোক একটু অবাকই হলেন। কেউ কেউ প্রশ্ন করলেন, কি রামবাবু বাড়িতে নতুন ভাড়াটে বসাচ্ছেন বুঝি?

—না না। নতুন ভাড়াটে কোথায়। বলে অপ্রস্তুতের হাসি হাসলেন।

অনেকেরই লোভ ছিল রামকিঙ্করবাবুর বাড়ির ওই ফ্ল্যাটটায়। ফ্ল্যাট তো চমৎকার, তা সে তো কত চমৎকার ফ্ল্যাটই পাওয়া যায় কিন্তু অমন বাড়িওলা আর ভূভারতে পাওয়া যায় না যে সে বিষয়ে কারও সন্দেহ ছিল না।

অনেকে এসে অনুরোধ উপরোধ করেন, কিন্তু রামকিঙ্করবাবু একেবারে অনড়। তিনি কোনও কথাই কানে তোলেন না। না, ফ্ল্যাট যেমন আছে তেমনি থাকবে, ও ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া সম্ভব নয়। না না না!

এই ভাবে চলছে বেশ। দুখিরামকেও শেষ পর্যন্ত বলতে হয়েছে ব্যাপারটা। লোকটি সরল আর একটু বোকা বোকা হলেও সে বুঝে নিয়েছে লক্ষ্মণবাবুর ব্যাপারটা। তা ছাড়া রামকিঙ্করবাবুর প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস। আর লক্ষ্মণবাবুর প্রতিও তার ছিল দারুণ একটা আকর্ষণ। লক্ষ্মণবাবু বেঁচে থাকতেই তার প্রতি কখনও খারাপ ব্যবহার করেননি, আর মরে গিয়ে সূক্ষ্ম শরীরে খারাপ ব্যবহার করবেন সেটা দুখিরাম বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে না বটে তবে সে এক গুণিনের কাছ থেকে একটা সাধারণ শক্তির তাবিজ নিয়ে পরেছে।

গুণিন বলেছে ভাল ভূত হলে এতেই কাজ হবে। তবে যদি ভূত ভাল না হয় তা হলে আরও অন্য রকম সব তাবিজ আছে সেগুলো দরকারমতো দেওয়া যাবে।

ফলে দুখিরামের মনে যেটুকু ভয় ছিল তাও চলে গিয়েছিল।

এই রকমই চলছিল বেশ। অবশ্য পাড়ার লোকেরা বুঝতে পারত না প্রায় রোজ দুখিরাম শেয়ালদার বৈঠকখানায় গিয়ে গাদা গাদা শুঁটকি মাছ কেনে কেন? কয়েকদিন পাড়ার শিবেন সমাদ্দারের সঙ্গে দুখিরামের দেখাও হয়ে গেছে শুঁটকি মাছ কেনার সময়। একদিন তো তিনি বলেই বসলেন, ও দুখিরাম বলি ব্যাপার কি বলো তো, অ্যাত অ্যাত শুঁটকি মাছ নিয়ে কি করো তুমি। দুখিরাম বোকা বোকা হলে কি হবে, সে বলেছিল ওই একটু ব্যাবসা করি। শিবেন সমাদ্দার বলেছিল, ব্যবসা করার আর জিনিস পেলে না? দুখিরাম বলেছিল, এই ব্যবসায়ে লাভ হয় বাবু। দিনে দশ বারো টাকার উপর লাভ থাকে।

এই ভাবেই চলছিল। একবার একটা কাণ্ড হল।

রামকিঙ্করবাবুর এক যাত্রাওলা বন্ধু এসে অনেক করে বলে গেল নন্দীভৃঙ্গি যাত্রা দেখতে। তা সে তো কাছে নয় শ্রীরামপুরের এক মাঠে। খুব নাকি চলছে। ওঁর বন্ধুর সামান্য একটা পার্ট আছে, তবে আসলে সগৌরব শততম রজনী অভিনয়ের রাত্রে দুশোর উপর বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, যাত্রা শেষ হওয়ার পর ছিল খাওয়া দাওয়ার এলাহি ব্যবস্থা। আগে রামকিঙ্করবাবুর যাত্রাওলা বন্ধু বলেছিলেন খুব তাড়াতাড়িই সব শেষ হয়ে যাবে। শীতের সন্ধে সাতটায় যাত্রা শুরু করে সাড়ে নটায় শেষ, তারপর খাওয়া দাওয়া শেষ করে, ভাড়া করা লাকসারি বাসে করে সব কলকাতায় ফেরত পাঠানো হবে। তারা এগারোটা সাড়ে এগারোটায় সবাই বাড়ি পৌঁছে যাবেন। কিন্তু সেদিন শীতকাল হলেও খুব বৃষ্টি পড়ছিল, আর যাত্রা শেষ হবার পর শুরু হয়েছিল প্রবল ঝড়। কোনও মতে খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাসে উঠেও সুবিধে হল না; ফেরার পথে ওঁদের বাস অন্ধকারে আর বৃষ্টিতে একেবারে এক খানায় গিয়ে পড়ল। রাত্রে আর তাঁদের ফেরা হল না।

আর এই দুর্যোগে তিন তিনটে চোর রামকিঙ্করবাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির। তারা ঠিক চুরি করতে নয় ঝড় বৃষ্টিতে আশ্রয় নেবার জন্যই বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল। দরজা খোলাই ছিল। রাত্রে সব দিন সদর দরজা বন্ধ করাও হত না, কেননা লক্ষ্মণবাবু সারারাত জেগে থাকতেন, আর বাড়িতে চোর কেন বেড়াল কুকুর কিচ্ছু ঢোকার সাধ্য ছিল না।

একবার একটা চোর এসেছিল বাড়িতে ঢুকে একটা রেডিওয়ো আর গোটা দুয়েক ঘড়ি নিয়ে সরে পড়ার চেষ্টা করতেই অকস্মাৎ সে বুঝতে পারল কে যেন তাকে ধরে একটু উড়িয়ে নিয়ে কোথায় যেন ফেলে দিয়ে এল। সে সেখানে পড়তেই কারা সব ছুটে এল। চোর বুঝতে পারল এক বিচ্ছিরি জায়গায় তাকে এনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে! জায়গাটা তার চেনা। বার পাঁচেক এখানে সে আগে এসেছে, সব সমেত আড়াই বছর তার এখানে কেটেছে। দমদম সেন্ট্রাল জেল!

তা এই বাড়িতে তিনটে চোর ঢুকে দেখল ভারি মজা। বাড়িতে জিনিসপত্র অঢেল কিন্তু একটাও লোক নেই! চোররা করল কি এ আলমারি সে আলমারি খুলে ঘড়ি, কয়েক হাজার টাকা, দুটো ট্র্যানজিস্টর রেডিয়ো এই সব বার করে এক জায়গায় জড়ো করে রেখে যেমনি সেই লোকে একটা বিরাট বস্তায় ঢোকাতে যাবে এমন সময় জিনিসগুলো অদ্ভুত আচরণ শুরু করল। রেডিয়ো দুটি হালকা হয়ে উড়তে উড়তে যথাস্থানে গিয়ে

স্থির হল। টাকা-গুলি শাঁ করে উড়ে গিয়ে আলমারির মধ্যে আগে যেখানে ছিল সেখানে ঢুকে গেল। তিন তিনটে ঘড়ি অন্য আলমারিতে চলে গেল। দরজা খুলে ঢুকল, ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল! চোরেরা তো ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে রয়েছে। বুঝতে পারছে এ কোনও অপদেবতার কাজ হবে। তারা তো রাম রাম রাম বলছে আর আতঙ্কে তাদের দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। এদিকে তারা দেখে কখন ঘরের আলো গেছে নিভে আর তাদের কোন এক অদৃশ্য শক্তি ধপাধপ করে কিল মারছে আর চটাপট চটাপট করে চড় মারছে। কখনও কখনও তাদের চুল ধরে শূন্যে তুলছে আর ধপ করে ফেলছে, তারা ব্যথায় চিৎকার করতে গিয়েও ভয়ে তাদের চিৎকার বন্ধ হয়ে আসছে। এইভাবে ঘণ্টা তিনেক তাদের নাস্তানাবুদ করার পর যখন ভোর হয়ে এল তখন তারা সব ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল মেঝেতে। সকালবেলায় রামকিঙ্করবাবুরা ফিরে এসে চোরদের ওই অবস্থায় দেখে সবই বুঝতে পারলেন। তাছাড়া কানের কাছে লক্ষ্মণবাবুর আওয়াজ পেলেন। লক্ষ্মণবাবু বললেন, উঃ বড় মেহনত গেছে রাত্রে। বড় গায়ে ব্যথা। আমি শুতে চললুম। আমবাবু, দিনের আলোয় আর কথা বলব না, ভূত সমাজে তা হলে ভারি নিন্দে হবে। সন্ধে বেলা সব বলব যখন সে ভারি মজা!

এই রকম কত ঘটনা যে ঘটেছিল ওই বাড়িতে। মনে করে লিখতে পারলে একখানা বড় বই হয়ে যায়। আমার আরও লেখার ইচ্ছে ছিল কিন্তু এখন তো আর জায়গাও নেই।

ছেলেটার মুখ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আজ গুরু নানকের জন্মদিন উপলক্ষে স্কুল ছুটি। ভাগ্যিস ছুটি ছিল, তাই বম্বেতে ভারত-ইল্যান্ড ক্রিকেট সেমি- ফাইনালের রিলে দেখা গেল টিভিতে। ছোটকাকার অফিস ছুটি নয়, কিন্তু তিনিও ছুটি নিয়েছেন এই খেলা দেখার জন্য। আজকের খেলা এমনই দুর্দান্ত যে, মা আর ছোড়দিও এসে উঁকি দিয়ে যাচ্ছেন মাঝে-মাঝে।

বসবার ঘরে যখন-তখন বাইরের লোক এসে পড়ে বলে আজ টিভিটা সরিয়ে আনা হয়েছে ছোটকাকার ঘরে। কিন্তু টিভিটা একটু গোলমাল করছে মাঝে-মাঝে, হঠাৎ-হঠাৎ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে ছবি, লম্বা হয়ে যাচ্ছে খেলোয়াড়দের মুখগুলো। অন্য কোনও একটা প্রোগ্রাম এসে মিশে যাচ্ছে। বোধহয় ঢাকার প্রোগ্রাম। ছোটকাকা টিভির পেছনটায় কী সব খুটখাট করে অনেকটা ঠিক করে দিলেন।

ছোটকাকা বসেছেন ঘরের মাঝখানে একটা বেতের চেয়ারে আর বুবাই বসেছে পাশের খাটে। সুনীল গাওস্কার মাত্র চার রানে আউট হতেই ছোটকাকা বুবাই-এর পিঠে এক কিল মেরে বললেন, "কী করলি, অ্যাঁ? ছি ছি!"

বুবাই তাড়াতাড়ি দেওয়ালের দিকে সরে গেল। ছোটকাকার এই একটা বাজে স্বভাব, কেউ আউট হলেই বুবাইকে কিল মারবেন। যেন দোষটা বুবাইয়েরই!

ছোটকাকা বললেন, "এবার যদি শ্রীকান্ত তাড়াতাড়ি আউট হয়ে যায়, তা হলে তোর কান মলে দেব!"

বুবাই বলল, "তা হলে আমি টিভি ভেঙে দেব! খেলা বন্ধ হয়ে যাবে!

ছোটকাকা হাসতে-হাসতে বললেন, "টিভি ভাঙলেই খেলা বন্ধ হয়ে যাবে, না রে? অ্যাই বুবাই, এক গেলাস জল নিয়ে আয় তো!"

বুবাই বলল, "না, আমি এখন জল আনতে পারব না! তুমি উঠে গিয়ে খেয়ে এসো!"

ছোটকাকা বললেন, "এখন তো বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছে! এই এক জ্বালা!"

সত্যি খেলার মাঝখানে বিজ্ঞাপন দেখালে খুব রাগ ধরে যায়। এর মধ্যে যদি আউট হয়ে যায় কেউ?

ছোটকাকা বুবাইকে রাগাবার জন্যই জল আনার কথা বলেন। তিনি নিজেই উঠে গেলেন জল খেতে।

বিজ্ঞাপন দেখাতে-দেখাতে টিভিটা হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল। আর কোনও শব্দ নেই। এই রে, আবার খারাপ হয়ে গেল নাকি? কিংবা চ্যানেল বদলে গেলে এইরকম হয়। বুবাই কাছে গিয়ে চ্যানেল ঘোরাতে যেতেই আবার ফুটে উঠল ছবি।

একটা শুধু মুখের ছবি। মনে হয় বাচ্ছা ছেলের। ফর্সা মুখ, কিন্তু মাথায় একটাও চুল নেই, ভুরুও নেই। আঁকা ছবি নয়, জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছে। কিন্তু কোনও শব্দ হচ্ছে না।

এ আবার কীরকম বিজ্ঞাপন? কোনও লেখা-টেখাও ফুটে উঠছে না!

"এই বুবাই, টিভির অত কাছে গিয়ে কী করছিস?"

ছোটকাকা ফিরে এসে ধমক দিতেই বুবাই চমকে পেছন ফিরে তাকাল। সঙ্গে-সঙ্গে টিভিতে আবার শুরু হয়ে গেল খেলার রিলে!

বুবাই বলল, "হঠাৎ সাউন্ড বন্ধ হয়ে গিয়েছিল!" ছোটকাকা বললেন, "তা বলে তোকে হাত দিতে হবে না!" খানিক বাদে চারখানা উইকেট পড়ে যেতেই ছোটকাকা দু'হাতে মাথা চাপড়াতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, "ওরে বুবাই, এবার কী হবে রে? তোর কপিলদের পারবে জেতাতে?"

বুবাই বলল, "নিশ্চয়ই! ইন্ডিয়া জিতবেই!"

"আর যদি হেরে যায়, তুই ক'টা কিল খাবি?"

"খবর্দার, ছোটকাকা, ও-কথা উচ্চারণ করবে না! তা হলে আমি তোমাকে কিল মারব!"

ছোটকাকাকা পিঠ ফিরিয়ে বসলেন, "তাই মার তো! দেখি তাতে কোনও লাভ হয় কি না!"

বুবাই সত্যি এসে ছোটকাকার পিঠে একটা কিল কষাল। আর তক্ষুনি কপিল মারল একখানা বাউন্ডারি!

ছোটকাকা লাফিয়ে উঠে বললেন, "মার আরও জোরে মার, বুবাই!"

এই সময় ছোড়দি এসে বলল, 'ছোটকাকা, তোমাকে একজন ডাকছে!

ছোটকাকা বললেন, "না, না, আমি এখন কারও সঙ্গে দেখা করতে পারব না। বলে দে, আমি বাড়িতে নেই!" ছোড়দি বলল, "যিনি ডাকছেন, তিনি দিল্লি থেকে এসেছেন বললেন!"

তা হলে তো আর ফেরানো যায় না। ছোটকাকাকে যেতেই হল। ছোড়দি একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে খেলা দেখে জিজ্ঞেস করল, "কে ব্যাট করছে রে?"

বুবাই বলল, "তুমি কপিলদেবকেও চেনো না! তুমি কি মানুষ ছোড়দি?"

ছোড়দি বললেন, "যা যা, ভারি তো খেলা! তোরা নিজেরা তো কিছু খেলতে পারিস না, শুধু টিভি দেখে লাফাস! একটাও বাঙালি ক্রিকেট খেলতে পারে না কেন?"

বুবাই বলল, "ছোড়দি, প্লিজ, এখন চুপ করো!"

একটু বাদে কপিলদের একটা ফুল টস বল হাঁকড়েছেন বিরাট জোরে। বুবাই ভাবল, এবার নিশ্চয়ই ছক্কা হবে। মাইক গ্যাটিং ক্যাচ ভেবে ছুটেছেন বলটার পেছনে, এমন সময় টিভিটা আবার অন্ধকার! কোনও মানে হয়! এতে রাগে গা জ্বলে যায় না? বুবাই ছুটে এসে অন্য চ্যানেল ঘোরাবার জন্য হাত দিতেই ফুটে উঠল ছবি।

সেই শুধু একটা বাচ্চা ছেলে মুখ, মাথায় চুল নেই, ভুরু নেই। চোখ পিটপিট করছে। কোনও কথা নেই, পাশে কিছু লেখা নেই। এটা কিসের বিজ্ঞাপন? এই বিচ্ছিরি বিজ্ঞাপনটা খুব জ্বালাতন করছে তো! সে হাত নেড়ে ধমক দিয়ে বলল, "এই যাঃ যাঃ যাঃ!"

তখন সেই বাচ্চা ছেলেটার মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ বেরোল!

সে খুব তাড়াতাড়ি ঠোঁট নাড়তে নাড়তে বলল, "পিঠ, কিটু, সিটু, মিটু, গিটু!'

এ আবার কী ভাষা, জাপানি নাকি? খেলার মধ্যে এ কী উৎপাত!

ছোটকাকা তাঁর দিল্লির বন্ধুকে নিয়ে ঘরে ঢুকেই বললেন, "আউট হয়ে গেল? তোর কপিল আউট? রাস্তায় এত চ্যাঁচামেচি হচ্ছে!"

আবার খেলার ছবি ফিবে এসেছে টিভিতে। ব্যাট বগলে নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন কপিলদেব, মুখখানা

একেবারে কুঁচকে গেছে। বুবাইয়ের যত রাগ হল ওই বাচ্চা ছেলের মুখখানার ওপর। ওই বিকট বিজ্ঞাপনটাই যত নষ্টের গোড়া!

খেলার শেষে এমনই মন খারাপ হয়ে গেল বুবাইয়ের যে, প্রায় কান্না পেয়ে গেল! কান্না লুকোবার জন্য সে চোখে জল দিলে বাথরুমে গিয়ে।

খেলা শেষ হয়ে গেছে, আর কেউ টিভি দেখছে না, কিন্তু টিভিটা কেউ বন্ধও করেনি। ছোটাকাকা বেরিয়ে গেলেন তাঁর বন্ধুর সঙ্গে। ছোড়দি আর মায়ের তো আগে থেকেই ভবানীপুরে ভন্টুমামার বাড়িতে যাবার কথা ছিল। সেখানে যাবার জন্য তৈরি হয়ে মা বললেন, "বুবাই তুই কিন্তু এখন বাড়ি থেকে একদম বেরোবি না! আজেবাজে লোক এলে দরজা খুলে কথা বলবি না। তোর বাবা ফিরলে বলবি, গাড়িটা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে!

বাবা অফিস থেকে ফিরবেন সাতটার সময়। ততক্ষণ বুবাইকে থাকতে হবে বাড়ির মধ্যে। আজ অবশ্য বুবাইয়ের খেলতে যেতেও ইচ্ছে করছে না।

টিভির আওয়াজ শুনে বুবাই সে-ঘরে ঢুকল বন্ধ দেবার জন্য। একটা দাড়িওয়ালা লোক কী যেন বকবক করছে! বুবাই টিভির গায়ে হাত ছোঁয়াতেই ছবিটা বদলে গিয়ে ফুটে উঠল সেই বাচ্চা ছেলেটার মুখ।

বুবাই ভাবল, এবারে দেখা যাক তো, এটা কিসের বিজ্ঞাপন! বাচ্চা ছেলেটি একদৃষ্টিতে বুবাইয়ের দিকে চেয়ে আছে। চোখ পিটপিট করছে তার, সে যেন বুবাইকে দেখে বেশ অবাক হয়েছে। সব বিজ্ঞাপনেই গান থাকে কিংবা টুংটাং বাজনা হয়। এটাতে কিছুই নেই কেন?

বাচ্চা ছেলেটা বলে উঠল, "পিটু, কিটু, সিটু, মিটু, গিটু!"

বুবাই বলল, 'তোমার মাথা আর মুন্ডু।"

এক মিনিটের বেশি হয়ে গেল টিভির পর্দায় আর কোনও ছবির বদলে শুধু ওই বাচ্চা ছেলেটার মুখ ফুটে রইল। এতক্ষণ তো কোনও বিজ্ঞাপন থাকে না!

বুবাই খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল সেদিকে। ছবিটা মুছছে না, আরও জোরে জোরে বলছে, "পিটু, কিটু, মিটু, গিটু! পিটু, কিটু, সিটু, মিটু, গিটু!"

বুবাইয়ের এবার হাসি পেয়ে গেল। টিভির লোকরা কেউ খেয়ালই করছে না। তাদের প্রোগ্রাম নষ্ট করে একটা বাচ্চা ছেলে দুষ্টুমি করছে। এই ন্যাড়া-মাথা ছেলেটা টিভি-অফিসে ঢুকে পড়ল কী করে?

খাবার-ঘরের টেবিলে দুধ ঢাকা আছে। মা বলেছেন, খিদে পেলে নারকেল-নাড়ু খেতে। কিংবা চিজ বিস্কুট আছে। খাওয়ার সময় বুবাইয়ের বই না পড়লে চলে না, সে একটা বই খুঁজে নিয়ে এল।

একবার একটা নারকেল-নাড়ু মুখে দিচ্ছে আর একবার করে দুধে চুমুক দিচ্ছে বুবাই। এমন সময় ছোককাকার ঘরে গোঁ-গোঁ শব্দ হতে লাগল।

তা হলে কি টিভিটা ঠিক বন্ধ হয়নি? আওয়াজ হচ্ছে কেন? দুধের গেলাস হাতে নিয়ে এ-ঘরে এসে বুবাই চমকে গেল। টিভি থেকে গোঁ-গোঁ আওয়াজ তো হচ্ছেই, ঝলকে ঝলকে রঙিন আলোও বেরোচ্ছে। এক-একবার খুব উজ্জ্বল লাল নীল আলো বেরিয়ে আসছে গাড়ির হেডলাইটের মতন, আবার নিভে যাচ্ছে হঠাৎ। বুবাই ভাবল, ছোটকাকা এ-ঘরে টিভিটা ঠিক মতন লাগাতে পারেননি, সেই জন্যই এরকম গন্ডগোল হচ্ছে সারাদিন। এরপর যদি টিভিটাতে আগুন লেগে যায়, তারপর কী হবে?

বুবাই জানে যে, প্লাগ খুলে দিলে ইলেকট্রিকের জিনিসের আর তেজ থাকতে পারে না! সুইচটা টিভির

প্রায় পাশেই। বেশ ভয়ে-ভয়ে পা টিপে-টিপে এগোল বুবাই। আলো আর শব্দ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। তবু বুবাই একটানে প্লাগ খুলে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল সব কিছু। যাক বাঁচা গেল!

তারপরেই আরও বিরাট জোরে আওয়াজ হতে লাগল খাওয়ার ঘর থেকে। কী যেন ঝনঝন করছে। এক্ষুনি ভেঙে পড়বে।

বুবাই ছুটে এসে দেখল, তাদের রেফ্রিজারেটারটা মৃগি রুগির মতন কাঁপছে। ভেতরের জলের বোতল-টোতলে ঠোকাঠুকি শব্দ হচ্ছে।

বুবাই ফ্রিজের এরকম ব্যবহার কোনদিন দেখেনি। ভেতরে কি কোন ইঁদুর আর বেড়াল মিলে যুদ্ধ করছে? ফ্রিজের দরজাটা খুলে দেখতে ভয় করল বুবাইয়ের।

কিন্তু ফ্রিজটা জিনিসপত্রে ভর্তি, তার মধ্যে বেড়াল ঢুকবে কী করে? শব্দটা বেড়ে যাচ্ছে ভীষণভাবে। এখানেও ইলেকট্রিক কানেকশনের কোনও গোলমাল হয়নি তো? ফ্রিজের প্লাগটা বেশ অনেকটা দূরে বুবাই সেটাকে খুলে ফেলল এক হ্যাঁচকা টানে।

আশ্চর্য, ফ্রিজটা এতেই শান্ত হয়ে গেল একেবারে!

বুবাই এবার ফ্রিজের দরজাটা খুলে ফেলল। না, বেড়াল-টেড়াল কিছু নেই। কয়েকটা ডিম ভেঙে গেছে। মা এসে নিশ্চয়ই বুবাইকেই বকবেন। ফ্রিজটা যে হঠাৎ পাগলামি শুরু করে দিল, তা কি বিশ্বাস করবেন? বুবাই শুধু-শুধু ডিম ভাঙতে যাবে কেন?

এবারে সে নিশ্চিন্তে বইটা খুলে দুধ খেতে বসল।

দু-তিন চুমুক দেবার পরেই সে চমক মুখ তুলে তাকাল। আপনি-আপনি একটা-একটা করে আলো জ্বলে উঠছে। রান্নাঘরের আলো, বসবার-ঘরের আলো, সব ঘরের আলো।

এবার বুবাই সত্যি-সত্যি ভয়ে শিউরে উঠল। এসব কী ব্যাপার হচ্ছে। সুইচ না টিপলে আলো জ্বলে কী করে নিজে-নিজে?

ছোটকাকা টিভিটা সরাতে গিয়ে সারা বাড়ির কনেকশান লুজ করে দিয়েছেন? তাতে কি এমনি আলো জ্বলে?

বাড়িতে আর কেউ নেই। বুবাই এখন কী করবে? দরজা খুলে পাশের ফ্ল্যাটে চলে যাবে?

সে এই কথা ভাবছে, এমন সময় ঘরের কোণ থেকে কে যেন বলে উঠল, "পিটু, কিটু, সিটু, মিটু, গিটু!"

বুবাইয়ের সারা গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল। এ তো টিভির সেই বাচ্চা ছেলেটার গলা! টিভি বন্ধ, তবু শোনা যাচ্ছে, এই ঘরের মধ্যেই!

এক চুমুকে দুধটা শেষ করেই বুবাই দৌড় মারল দরজার দিকে। ঠিক তক্ষুণি কে তাকে পরিস্কার গলায় ডাকল, "বুবাই!"

বুবাই মুখ ফিরিয়ে না তাকিয়ে পারল না। কে ডাকল তাকে? প্রথমে সে কাউকে দেখতে পেল না। তারপর দ্বিতীয়বার ডাক শুনে তাকাল ওপরের দিকে। খাবার ঘরের আলোটা একটা গোল সাদা শেড দিয়ে ঢাকা। সেই গোল আলোটা হয়ে গেছে টিভির সেই বাচ্চা ছেলেটার মুখ। মাথায় একটাও চুল নেই, চোখ পিটপিট করছে।

বুবাইকে যেন একটা চুম্বক টেনে ধরেছে, সে আর নড়তে পারছে না।

সেই বাচ্চাটা খিলখিল করে হেসে বলল, "এই বুবাই!"

বুবাই আস্তে-আস্তে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে?"

বাচ্চাটা সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "এই বুবাই! পিটু, কিটু, সিটু, মিটু, গিটু!"

বুবাইয়ের হঠাৎ যেন ভয় চলে গেল। সে ভূত-টুতের ভয় পায় না। কী হচ্ছিল, এতক্ষণ বুঝতে পারছিল না।

সে ওই বড় আলোটার সুইচটা অফ করে দিতেই মুখটা মিলিয়ে গেল। বুবাইয়ের মুখে হাসি ফুটে উঠল। এইবার সে বুঝেছে।

আবার আর-একটা আলোর বালবে ফুটে উঠল সেই মুখ। আবার সে বলল, "এই বুবাই, পিটু, কিটু, সিটু, মিটু, গিটু!"

বুবাই সেই আলোটারও সুইচ অফ করে দিল।

কিন্তু ফট করে আগের আলোটা আবার জ্বলে উঠে সেখানে ফিরে এল মুখটা। সে খিলখিল করে হাসতে লাগল।

বুবাই বলল, "তবে রে, আয় তোর মজা বার করছি!"

রান্নাঘরে এখটা টুল আছে। সেটা টেনে বুবাই নিয়ে এল সদর দরজার কাছে। তারপর টুলে উঠে মেইন সুইচের দিকে হাত বাড়াল। বুবাইয়ের এখনও ঠিক হাত যায় না, সামনের বছরেই হাত পৌঁছে যাবে।

সে ছোট্ট করে দু'বার লাফাতেই সুইচটা ছুঁয়ে ফেলে একটা হ্যাঁচকা টান দিল। সঙ্গে-সঙ্গে একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল পুরো বাড়ি। সেই বাচ্চাটার মুখও মিলিয়ে গেল একেবারে।

টুল থেকে নেমে বুবাই বলল, "এবার? কই আয় দেখি, কী রকম দুষ্টুমি করতে পারিস দেখি!"

কেউ কোনও সাড়া দিল না!

বুবাই রান্নাঘর থেকে নিয়ে একটা মোটা মোমবাতি জ্বালল। বেশ আলো হয়েচে, এতেই বই পড়া যাবে!

আর পনেরো মিনিটের মধ্যেও কিছু গন্ডগোল হল না। বুবাই ঘড়ি দেখল, বাবা ফিরতে আরও প্রায় আধঘণ্টা দেরি আছে।

এখনও অনেকটা সময়। ছেলেটা কিছু বলতে চাইছিল, বাংলা বোধহয় জানে না। ছেলেটা ক্ষতি কিছু করেনি। আরও কিছুটা সময় ছেলেটাকে নিয়ে মজা করলে মন্দ হত না।

বুবাই আবার টুলটা টেনে নিয়ে মেইন সুইচটা অন করে দিল। জ্বলে উঠল বাড়ির সব আলো। বুবাই সব ক'টা আলোর দিকেই মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

ছেলেটার মুখ আর ফিরে এল না। বুবাই ছুটে গিয়ে কাকার ঘরের টিভিটা আবার চালু করে দিল। তাতে একটা বিচ্ছিরি প্রোগ্রাম হচ্ছে। ছেলেটাকে আর দেখা গেল না।

ছেলেটা অভিমান করে চলে গেল!

দুই পালোয়ান

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পালোয়ান কিশোরী সিং-এর যে ভূতের ভয় আছে তা কাক পক্ষিতেও জানে না। কিশোরী সিং নিজেও যে খুব ভাল জানত এমন নয়।

আসলে কিশোরী ছেলেবেলা থেকেই বিখ্যাত লোক। সর্বদাই চেলাচামুণ্ডারা তাকে ঘিরে থাকে। একা থাকার কোন সুযোগই নেই তার। আর একথা কে না জানে যে একা না হলে ভূতেরা ঠিক সুবিধে করে উঠতে পারে না। জো পায় না।

সকালে উঠে কিশোরী তার সাকরেদ আর সঙ্গীদের নিয়ে হাজার খানেক বুকডন আর বৈঠক দেয়। তারপর দঙ্গলে নেমে পড়ে। কোস্তাকুস্তি করে বিস্তর ঘাম ঝরিয়ে দুপুরে একটু বিশ্রাম। বিকেলে প্রায়ই কারও না কারও সঙ্গে লড়াইতে নামতে হয়। সন্ধের পর একটু গান-বাজনা শুনতে ভালবাসে কিশোরী। রাতে সে পাথরের মতো পড়ে এক ঘুমে রাত কাবার করে। তখন তার গা হাত পা দাবিয়ে দেয় তার সাকরেদরা। এই নিশ্ছিদ্র রুটিনের মধ্যে ভূতেরা ঢুকবার কোনও ফাঁকই পায় না।

গণপতি মাহাতো নামে আর একজন কুস্তিগীর আছে। সেও মস্ত পালোয়ান। দেশ বিদেশের বিস্তর দৈত্য দানবের মতো পালোয়ানকে সে কাৎ করেছে। কিন্তু পারেনি শুধু কিশোরী সিংকে। অথচ শুধু কিশোরী সিংকে হারাতে পারলেই সে সেরা পালোয়ানের খেতাবটা জিতে নিতে পারে।

কিন্তু মুস্কিল হল নিতান্ত বাগে পেয়েও নিতান্ত কপালের ফেরে সে কিশোরীকে হারাতে পারে নি। সেবার লক্ষ্ণৌতে কিশোরীকে সে যখন চিৎ করে প্রায় পেড়ে ফেলেছে সেই সময়ে কোথা থেকে হতচ্ছাড়া এক মশা এসে তার নাকের মধ্যে ঢুকে এমন পন পন করতে লাগল হাঁচি না দিয়ে আর উপায় রইল না তার। আর সেই ফাঁকে কিশোরী তার প্যাঁচ কেটে বেরিয়ে গেল। আর দ্বিতীয় হাঁচিটার সুযোগে তাকে রদ্দা মেরে চিৎ করে ফেলে দিল।

পাটনাতেও ঘটল আর এক কাণ্ড। সেবার কিশোরীকে বগলে চেপে খুব কায়দা করে স্ক্রু প্যাঁচ আঁটছিল গণপত। কিশোরীর তখন দমসম অবস্থা। ঠিক সেই সময়ে একটা ষাঁড় ক্ষেপে গিয়ে দঙ্গলের মধ্যে ঢুকে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বাধিয়ে দিল। কিন্তু গণপত দেখল এই সুযোগ হাতছাড়া হলে আর কিশোরীকে হারানো যাবে না। সুতরাং যে প্যাঁচটা টাইট রেখে কিশোরীকে ল্যাং মেরে ফেলে দেওয়ার ফিকির খুঁজছিল। সেই সময় ষাঁড়ের তাড়া খেয়ে দর্শকরা সব পালিয়েছে আর ষাঁড়টা আর কাউকে না পেয়ে দুই পালোয়ানের দিকেই তেড়ে এল।

কিশোরী তখন বলল, গণপত, ছেড়ে দাও। ষাঁড় বড় ভয়ঙ্কর জিনিস।

গণপত বলল, ষাঁড় তো ষাঁড়, স্বয়ং শিব এলেও ছাড়ছি না।

ষাঁড়টা গুঁতোতে এলে গণপত অন্য বগলে সেটাকে চেপে ধরল। সে যে কী সাংঘাতিক লড়াই হয়েছিল তা যে না দেখেছে সে বুঝবে না। দেখেছেও অনেকে। গাছের ডালে ঝুলে, পুকুরের জলে নেমে, বাড়ির ছাদে

উঠে যারা আত্মরক্ষা করছিল তারা অনেকেই দেখেছে। গণপত লড়াই করছে দুই মহাবিক্রম পালোয়ানের সঙ্গে—ষাঁড় এবং কিশোরী সিং। গাছের ডালে ঝুলে, পুকুরে ডুবে থেকেও সে লড়াই দেখে লোকে চেঁচিয়ে বাহবা দিচ্ছিল গণপতকে।

ষাঁড়ের গুঁতো, কিশোরীর হুড়ো এই দুইকে সামাল দিতে গণপত কিছু গণ্ডগোল করে ফেলেছিল ঠিকই। আসলে কোন বগলে কে সেইটেই গুলিয়ে গিয়েছিল তার। হুড়যুদ্ধুর মধ্যে যখন সে এক বগলের আপদকে যুৎসই একটা প্যাঁচ মেরে মাটিতে ফেলেছে তখনও তার ধারণা যে চিৎ হয়েছে কিশোরীই।

কিন্তু নসিব খারাপ। কিশোরী নয়, চিৎ হয়েছিল ষাঁড়টাই। আর সেই ফাঁকে কিশোরী তার ঘাড়ে উঠে লেংগউটি প্যাঁচ মেরে ফেলে দিয়ে জিতে গেল।

তৃতীয়বার তালতলার বিখ্যাত আখড়ায় কিশোরীর সঙ্গে ফের মোলাকাৎ হল। গণপত রাগে দুঃখে তখন দুনো হয়ে উঠেছে। সেই গণপতের সঙ্গে সুন্দরবনের বাঘ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিয়ে লেজ গুটিয়ে পালাবে। তার হুংকারে তখন মেদিনী কম্পমান।

লড়াই যখন শুরু হল তখনই লোকে বুঝে গেল, আজকের লড়াইতে কিশোরীর কোনও আশাই নেই। কিশোরী তখন গণপতের নাগাল এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াতে ব্যস্ত।

ঠিক এই সময়ে ঘটনাটা ঘটল। ভাদ্র মাস। তালতলার বিখ্যাত পাঁচসেরী সাতসেরী তাল ফলে আছে চারধারে। সেইসব চ্যাম্পিয়ন তালদের একজন সেইসময়ে বোঁটা ছিঁড়ে নেমে এল নিচে। আর পড়বি তো পড় সোজা গণপতের মাথার মধ্যিখানে।

গণপতের ভাল করে আর ঘটনাটা মনে নেই। তবে লোকে বলে, তালটা পড়ার পরই নাকি গণপত কেমন স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে গালে হাত দিয়ে কী যেন ভাবতে লাগল। সে যে লড়াই করছে, তার প্রতিদ্বন্দ্বী যে কিশোরী, এবং সতর্ক না হলে যে বিপদ তা আর তার মাথায় নেই তখন। সে নাকি গালে হাত দিয়ে কী যেন ভাবতে লাগল। সে নাকি গালে হাত দিয়ে হঠাৎ বিড়বিড় করে তুলসী দাসের রামচরিত মানস মুখস্থ বলে যাচ্ছিল। কিশোরী যখন সেই সুযোগে তাকে চিৎ করে তখনও সে নাকি কিছু মাত্র বাধা দেয়নি। হাতজোড় করে রামজিকে প্রণাম জানাচ্ছিল।

গণপতের বয়স হয়েছে। শরীরের আর সেই তাগদ নেই। কিশোরী সিংকে হারিয়ে যে খেতাবটা সে জিততে পারল না এসব কথাই সে সারাক্ষণ ভাবে।

ভাবতে ভাবতে কী হল কে জানে। একদিন আর গণপতকে দেখা গেল না।

ওদিকে কিশোরীর এখন ভারি নামডাক। বড় বড় ওস্তাদকে হারিয়ে সে মেলা কাপ মেডেল পায়। লোকে বলে, কিশোরীর মতো পালোয়ান দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি নেই।

তা একদিন ডাকে কিশোরীর নামে একটা পোস্টকার্ড এল। গণপতের আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষরে লেখা, ভাই কিশোরী, তোমাকে হারাতে পারিনি জীবনে এই আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ। একবার মশা, একবার ষাঁড়, আর একবার তাল আমার সাধে বাদ সেধেছে। তবু তোমার সঙ্গে আর একবার লড়বার বড় সাধ। তবে লোকজনের সামনে নয়। আমরা দুই পালোয়ান নির্জনে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করব। আমি হারলে তোমাকে গুরু বলে মেনে নেব। তুমি হারলে আমাকে গুরু বলে মেনে নেবে। কে হারল, কে জিতল তা বাইরের কেউ জানবে না। জানব শুধু আমি, আর জানবে তুমি। যদি রাজি থাকো তবে আগামী অমাবস্যায় খেতুপুরের শ্মশানের ধারে ফাঁকে মাঠটায় বিকেলবেলায় চলে এসো। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

চিঠিটা পড়ে কিশোরী একটু ভাবিত হল। সত্যি বটে গণপত খুব বড় পালোয়ান। এবং কপালের জোরেই তিন তিনবার কিশোরীর কাছে জিততে জিততেও হেরে গেছে। অত বড় একটা পালোয়ানের এই সামান্য আব্দারটুকু রাখতে কোনও দোষ নেই। হারলেও কিশোরীর ক্ষতি নেই। সাক্ষীসাবুদ তো থাকবে না। কিন্তু হারার প্রশ্নও ওঠে না। কিশোরী এখন অনেক পরিণত, অনেক অভিজ্ঞ। তাছাড়া গণপতকে যে সে খুব ভালভাবে হারাতে পারেনি সেই লজ্জাটাও তার আছে। সুতরাং লজ্জাটা দূর করার এই-ই সুযোগ। এবার গণপতকে ন্যায্যমতো হারিয়ে সে মনের খচখচানি থেকে মুক্ত হবে।

নির্দিষ্ট দিনে কিশোরী তৈরি হয়ে খেতুপুরের দিকে রওনা হল। জায়গাটা বেশি দূরেও নয়। তিন পোয়া পথ। নিরিবিলি জায়গা।

শ্মশানের ধারে মাঠটায় গণপত অপেক্ষা করছিল। কিশোরীকে দেখে খুশি হয়ে বলল, এসেছ! তাহলে লড়াইটা হয়েই যাক।

কিশোরীও গোঁফ চুমড়ে বলল, হোক।

দুজনে ল্যাঙট এঁটে, গায়ে মাটি থাবড়ে নিয়ে তৈরি হল।

তারপর দুই পালোয়ান তেড়ে এল দুদিক থেকে। কিশোরী ঠিক করেছিল, পয়লা চোটেই গণপতকে মাটি থেকে শূন্যে তুলে ধোবিপাট মেরে কেল্লা ফতে করে দেবে।

কিন্তু সাপটে ধরার মুহূর্তেই হঠাৎ পোঁ করে একটা মশা এসে নাকে ঢুকে বিপত্তি বাঁধালে। হ্যাঁচ্চো হ্যাচচোঁ হাঁচিতে গগন কেঁপে উঠল। আর কিশোরী দেখল, কে যেন তাকে শূন্যে তুলে মাটিতে ফেলে চিৎ করে দিল।

গণপত বলল, আর একবার।

কিশোরী লাফিয়ে উঠে বলল, আলবাৎ।

দ্বিতীয় দফায় যা হওয়ার তাই হল। লড়াই লাগতে না লাগতেই একটা ষাঁড় কোথা থেকে এসে যে কিশোরীর বগলে ঢুকল তা কে বলবে। কিশোরী আবার চিৎ।

গণপত বলল, আর একবার হবে?

কিশোরী বলল, নিশ্চয়ই।

কী হবে তা বলাই বাহুল্য। লড়াই লাগতে না লাগতেই দশাসই এক তাল এসে পড়ল কিশোরীর মাথায়। কিশোরী 'পাখি সব করে রব' আওড়াতে লাগল। এবং ফের চিৎ হল।

হতভম্বের মতো যখন কিশোরী উঠে দাঁড়াল। তখন দেখল, গণপতকে ঘিরে ধরে কারা যেন খুব উল্লাস করছে। কিন্তু তারা কেউই মানুষ নয়! কেমন যেন কালো কালো, ঝুলকালির মতো রং, রোগা, তেঠেঙে লম্বা সব অদ্ভুত জীব।

জীব? না কি অন্য কিছু?

কিশোরী হাঁ করে দেখল, গণপতও আস্তে আস্তে শুকিয়ে, কালচে, মেরে, লম্বা হয়ে ওদের মতোই হয়ে যেতে লাগল।

কিশোরী আর দাঁড়ায় নি, 'বাবা রে, মা রে' বলে চেঁচিয়ে দৌড়াতে লেগেছে।

* * *

কিশোরী পালোয়ানের ভূতের ভয় আছে, একথা এখনও লোকে জানে না বটে। কিন্তু কিশোরী নিজে খুব জানে। আর এই জানলে তোমরা।

গোলাবাড়ির সার্কিট হাউস

লীলা মজুমদার

যারা শহরে বাস করে তারা দুচোখ বুজে জীবনটা কাটায়। কোনো একটা বিদেশি তেল কোম্পানির সব থেকে ছোট সাহেব অরূপ ঘোষের মুখে এ-কথা প্রায়ই শোনা যেতে। সাহেব বলতে যে বাঙালি সাহেব বোঝাচ্ছে, আশা করি সে-কথা কাউকে বলে দিতে হবে না। বিলিতি বড় সাহেব আজকাল যদি বা গুটিকতক দেখা যায়, ছোট সাহেব মানেই দেশী। তবে অরূপের বুকের পাটাও যে কারো চেয়ে নেহাৎ কম, এ-কথা তার শত্রুরাও বলবে না।

সমস্ত বিহার, ওড়িশা আর পশ্চিমবাংলা জুড়ে যে অজস্র গাড়ি চলার ভালোমন্দ পথ আর অগুন্তি রাত কাটাবার আস্তানা আছে, এ বিষয়ে যারা ও-সব জায়গায় না গিয়েছে, তাদের কোনো ধারণাই নেই। অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতার গল্প বলে তারা। বিশেষ করে কোনো নির্জন আস্তানায় দু-চার জনা যদি অতর্কিতে একত্র হয়। সেদিন যেমন হয়েছিল। বলা বাহুল্য, অরূপ ছিল তাদের একজন।

বিদেশি তেল কোম্পানির ছোট বড় সাহেবদের তিন বছরের বেশি পুরোনো গাড়ি চড়ে বেড়ানো নিতান্ত নিন্দনীয়। কাজেই অরূপের গাড়িটা খুব পুরোনো ছিল না। কিন্তু হলে হবে কি, দুর্ভোগ কপালে থাকলে তাকে এড়ানো সহজ কথা নয়, কাজেই এই আস্তানায় পৌঁছতে শেষ বারো মাইল আসতে, তার দেড় ঘণ্টা লেগেছিল এবং পঁচিশবার নামতে হয়েছিল। ফুয়েল পাম্পের গোলমাল, সেটি না সারালেই নয়। অথচ খুদে অখ্যাত বিশ্রামাগারের সামনের নদীর মাথায় কোথাও প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়ে থাকবে, তার ফলে নদী ফেঁপে ফুলে একাকার। পুরোনো লড়ঝড়ে পুল থরহরি কম্পমান। আত্মহত্যা করতে ইচ্ছুক ছাড়া কেউ তাতে চড়তে রাজি হবে না।

তবে এর চাইতে অনেক মন্দ জায়গাতেও রাত কাটিয়েছে অরূপ। সেই কথাই হচ্ছিল। ম্যানেজার ছাড়া, শুধু একটা চাকার। তাছাড়া তিনজন আগন্তুক; অরূপকে নিয়ে চারজন। ম্যানেজার মানে কেয়ার-টেকার। এখানে কেউ থাকেও না, খায়-দায়ও না। হয়তো দৈবাৎ অসুবিধায় পড়লে রাত কাটিয়ে যায়। নিজেদের খাবারদাবার খায়।

বনবিভাগের ইন্সপেক্টর কালো সাহেব ডি-সিল্‌ভা বলল, আরে তোমরাও তো খাওদাও, ঘুমোও। তা খায় সত্যিই। কেয়ার-টেকার খ্রিশ্চান; যে বেয়ারা রাঁধে সে কেয়ার-টেকারের হুকুম পালে বটে; কিন্তু তার হাতে খায় না। নদীর ওপারে মাইল দেড়েক দূরে রবি গাঁও থেকে রসদ কিনে আনতে হয়। আজ আর কেউ নদী-পার হতে পারেনি। ভাঁড়ার ঠনঠন। তাছাড়া এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন আর যে-কেউ এসে উঠলেই, অমনি তার নফর হতে হবে, এমন যেন কেউ আশা না করে।

ডি-সিল্‌ভা পরিষ্কার বাংলা বলে, তার আদি নিবাস ফ্রি স্কুল ট্রিটে। এবার সে রেগে উঠল। 'মাই ডিয়ার ফেলো, তোমাদের মতো নই, আমি ইউরোপিয়ান, তোমাদের রাঁধাবাড়ার তোয়াক্কা রাখি না। আমার রসদ আমার সঙ্গে থাকে। আমি শুধু জানতে চাই এ জায়গাটা রাত কাটাবার পক্ষে নিরাপদ কিনা।'

অরূপ না হেসে পারল না। 'বনের মধ্যে যার কাজ তার অত ভয় কিসের?'

তৃতীয় ব্যক্তির নাম নমসমুদ্রম কি ওই ধরনের কিছু। বোধ হয় পুলিশের লোক! ডি-সিল্‌ভার সঙ্গেই এসেছিল। সে সর্বদা ইংরেজি ছাড়া কিছু বলে না। এবার সে ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না, না, সে রকম ভয়ের কথা হচ্ছে না। আর হবেই বা কেন? তোমাদের মতো উৎসাহী ইয়ংমেন তো এ-সব বনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বন্যজন্তু মেরে-কেটে সাবাড় করে এনেছে। ও অন্য ভয়ের কথা বলছে।'

অরূপ জুতোর ফিতে ঢিলে করে, মোজাসুদ্ধ পা টেনে বাইরে এনে, আঙ্গুলগুলো নেড়ে একটু আরাম বোধ করে বলল, 'তাহলে কি রকম ভয়ের কথা, মশাই?' সে তেল কোম্পানির কর্মী, রাষ্ট্রভাষা তার মুখে সহজে আসে। শুনে চতুর্থ ব্যক্তি দাড়ি নেড়ে বলল, 'ঠিক, রাইট।' নমসমুদ্রম কাষ্ঠ হাসল—'এমন সব ভয়ের ব্যাপার যা বন্দুকের গুলিতে বাগ মানে না। ঠিক কি না?' ডিসিল্‌ভা বলল, 'অবিশ্যি আমার তাতে এসে যায় না। ইউরোপের লোকেরা এ-সব বিষয়ে অনেক উদার। তাছাড়া আমার পীরের দরগায় মানত করা আছে। আমার ক্ষতি করে কার সাধ্যি।'

সর্দারজি বললেন, 'তবে অদ্ভুত ঘটনা ঘটে বইকি। এই যেমন গত বছর সবাই পই-পই করে বারণ করা সত্ত্বেও আমাদের ট্রাক-দুর্ঘটনার অকুস্থলে যাবার পথে মোপানির ডাক-বাংলোয় রাত কাটালাম। বেশ ভালো ব্যবস্থা, আমার ডালরুটি আমার সঙ্গে থাকে, চৌকিদারটিও ভদ্র। আমার ঘর দেখিয়ে দিয়ে আর স্নানের ঘরে জল আছে কি না অনুসন্ধান করেই সে হাওয়া হয়ে গেল। আমিও ক্লান্ত ছিলাম, মনে যথেষ্ট দুর্ভাবনাও ছিল, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। মাঝরাতে উঠতে গিয়ে খাটের পাশে ঠ্যাং ঝুলিয়ে, ও হরি, তল পাই না। কিছুতেই আর মেঝেতে পা ঠেকল না। নামাও হল না। কখন, আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে উঠে দেখি যে কে সেই। খাটের পাশে ওই তো চটিজোড়া রয়েছে, কেউ ছোঁয়ওনি। ভালো করে ঘরটা পরখ করলাম, কেউ যে দড়ি বেঁধে কি অন্য উপায়ে খাটটাকে শূন্যে তুলবে, তার চিহ্ন নেই। ভাবলাম, দুঃস্বপ্ন দেখেছি। কাপড়-চোপড় পরে চায়ের জন্য বসে বসে হয়রান হয়ে, চৌকিদারের ঘরে গিয়ে তাকে টেনে বের করলাম। আমাকে দেখে সে অবাক! 'সাহাব, আপনি—আপনি—!!? ও বাংলোতে তো কেউ রাত কাটায় না। কাল সেই কথাই বলতে চেষ্টা করছিলাম, আপনি কান-ও দিলেন না।'

হাসলাম। আমার কনুই-এর ওপরে কালিঘাটের মাদুলি বাঁধা সে কথা আর ব্যাটার কাছে প্রকাশ করলাম না। অবিশ্যি বলা বাহুল্য, জায়গাটার নাম মোপানি নয়। সরকারের ক্ষতি করতে চাই না বলে নামটা পালটে দিলাম।'

নমসমুদ্রম বলল, 'ডি-সিল্‌ভার আর আমার গত বছর এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তরাইয়ের এক চা বাগানে এক বন্ধুর বাড়িতে অতিথি হয়েছিলাম। বাগানও দেখব, ডি-সিল্‌ভা কি-সব গাছের নমুনা সংগ্রহ করবে আর আমার একটা তদন্তের কাজও ছিল। সন্ধে থেকে চা বাগানে কেমন একটি অস্বস্তি লক্ষ করলাম। অন্ধকারের আগেই আফিস-সেরেস্তার কারখানা-গুদোমখানার দরজা-জানলা দুমদাম বন্ধ হয়ে গেল। কর্মীরা যে-যার কোয়ার্টারে দোর দিল। অথচ এখানে কিছু এমন শীত পড়েনি। আকাশে ফুটফুট করছে চাঁদ। সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে, চা-বাগানের মালিকও নিজের শোবার ঘরের দিকে রওনা হলেন। আমাদের বললেন, শুয়ে পড়ো তোমরা, এ সময়টা এ-সব জায়গা খুব ভালো নয়। শিকার? কাল সকালে ভালো শিকারের বন্দোবস্ত করেছি। কিন্তু এত সকালে শোব কি! বন্দুক নিয়ে দুজনে বাথরুমের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

চা-বাগান গিয়ে ঘন বনে মিশেছে। মাঝখানে সরু একটা উঁচু সেতু। সেটা পেরুনো আমাদের কাছে কিছুই নয়। পূর্ণিমায় কখনো বনের মধ্যে বেড়িয়েছেন? চাঁদের আলো পাতার ফাঁক দিয়ে কুচিকুচি হয়ে, এখানে ওখানে পড়ে, হীরের মতো জ্বলে। কোথাও অন্ধকার জমে থক-থক করে। মনে হয় গাছগুলো জেগে উঠে চোখ মেলে চেয়ে দেখছে। গা শিরশির করে। কোথাও সাড়াশব্দ নেই।

হঠাৎ দেখি আমাদের থেকে দশ হাত দূরে প্রকাণ্ড নেকড়ে বাঘ। এত বড় নেকড়ে এ-দেশে হয় জানতাম না। তার চোখ দিয়ে আলো ঠিকরোচ্ছে, মুখটা একটু হাঁ করা, বড় বড় দাঁতের ফাঁক দিয়ে লালা ঝরছে। মাথাটা একটু নিচু করে, বিদ্যুৎবেগে সে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তার গায়ের চাপে ঝোপ-ঝাড়গুলো সরে সরে যাচ্ছে।

আমার সারা গা হিমের মতো ঠাণ্ডা ঘামে ভিজে গেল। বন্দুক তুলবার জোর পাচ্ছিলেন না। অথচ ডি-সিল্‌ভা নির্বিকার। সেই জানোয়ারটা আমাদের পার হয়ে গেল, মনে হল এমন সুযোগ আর পাব না। অমনি সম্বিৎ ফিরে এল। বন্দুক তুলে ঘোড়া টিপলাম। খুব বেশি হলে জন্তুটা তখন আমাদের কাছ থেকে সাত-আট হাত দূরে। আমার অব্যর্থ লক্ষ্য। গুলিটা তার গা ফুঁড়ে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। পরদিন একটা গাছের গায়ে সেটাকে বিঁধে থাকতে দেখা গেছিল।

নেকড়েটা ভ্রূক্ষেপও করল না। যেমন যাচ্ছিল তেমনি নিমেষের মধ্যে চোখের আড়াল হয়ে গেল। আমার কেমন মাথা ঘুরে গেল, ডি-সিল্‌ভা না ধরলে পড়েই যেতাম।' অরূপ বলল, 'ভারি অদ্ভুত তো!'

ডি-সিল্‌ভা চুপ করে শুনছিল। এবার সে মুখ থেকে সিগারেট বের করে বলল, 'অদ্ভুত বলে অদ্ভুত! আমি তো ওর পাশে দাঁড়িয়েও নেকড়ে-ফেকড়ে কিছু দেখলাম না, খালি একটা বুনো গন্ধ নাকে এল। এক ফোঁটা রক্ত-ও মাটিতে দেখা গেল না। পরদিন ভোরে বাগানের মালিক শিকারের প্ল্যান বাতিল করে দিয়ে, এক রকম জোর করেই আমাদের রওনা করে দিলেন। খুব বিরক্ত মনে হল। তবে এ-সব ব্যাপারে কোনো এক্সপ্ল্যানেশন খুঁজবেন না, মশাই। নেহাৎ নমসমুদ্রমের মা গুরু-বংশের মেয়ে, নইলে আর দেখতে হত না।'

অরূপ খুবই অস্বস্তি বোধ করছিল। এদের যত সব গাঁজাখুরি গল্প। ইন্টেলিজেন্সের অপমান। ডি-লিভা বলল, 'কি হল? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? বনে-জঙ্গলে, নির্জন জায়গায় আমাদের মতো ঘুরে বেড়ান কিছুদিন, তারপর দেখবেন সব অন্যরকম মনে হবে।'

সর্দারজিও হাসলেন। বললেন, 'বিশেষ করে যদি গোলাবাড়ির সার্কিট হাউসে একবারটি রাত কাটাতে হয়।' পরিবেশটি যে এইরকম একটা আলোচনারই যোগ্য সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। একদিকে ক্ষুব্ধ নদীর জল ফুঁসছে অন্য দিকে বনের গাছপালায় বাতাসের আলোড়ন, তার উপর মেঘলা আকাশের নীচে চার দিক থেকে এরই মধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বাতাসটা থমথমে।

তবু, গোলাবাড়ির সার্কিট হাউসের নাম শুনে অরূপের হাসি পেল। সে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন, সেখানে কি হয়?' সর্দারজি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। 'সেকি! আপনি থাকেন কোথায় যে অমন একটা সুখ্যাত জায়গার কথা জানেন না? ভাবতে পারেন, সেখানে টাকা দিয়েও সরকার কখনো একটা চৌকিদার কি বেয়ারা রাখতে পারেনি? কেউ রাজি হয়নি। এটা একটা হিস্টরিক্যাল ফ্যাক্ট। বনের মধ্যে খাঁ-খাঁ খালি বাংলো পড়ে থাকত। নাকি সন্ধের পর জন্তু-জানোয়ারও তার ত্রি-সীমানায় ঘেঁষত না!'

অরূপ এবার হেসে উঠল। 'তাই নাকি? অথচ আমি সেখানে পরম আরামে গতকাল রাত্রিবাস করে এলাম। চৌকিদারের আপ্যায়ন আর বাবুর্চির রান্নার তুলনা হয় না। কোত্থেকে যে ওই ব্যাক-অফ-বিয়ন্ডে

আমার জন্য মাশরুম আর অ্যাসপ্যারাগাস জোগাড় করে খাওয়াল তা ওরাই জানে। জানেন, ফেদার-বেডে রাত কাটালাম। পোর্সিলেনের বাথ-টাব ভরে গরম জল দিল। একটা পয়সা নিল না দুজনার একজনও। কত মন-গড়া গল্পই যে আপনারা বিশ্বাস করেন তার ঠিক নেই। তবে এ-কথা সত্যি যে আমার গাইড বুকে ওটার নামের পাশে লেখা আছে, অ্যাবান্ডন্ড ১৯০০ এ-ডি!! গাইড-বুকের লেখকও তেমনি। নিশ্চয় আপনাদের কারো কাছ থেকে ওই তথ্য সংগ্রহ করেছিল।' বলে অরূপ খুব হাসতে লাগল। 'আর তাই যদি বলেন, গাইডবুকে আমাদের আজকের এই আস্তানারও নাম নেই, তা জানেন? এটাই বা এল কোত্থেকে?'

অরূপ হাসলেও বাকিরা কেউ হাসল না। তারা বরং ত্রস্ত চঞ্চল হয়ে উঠে 'ম্যানেজার! ম্যানেজার!' বলে চ্যাঁচাতে লাগল। এলও ম্যানেজার এক মুহূর্তের জন্য, বেয়ারাটাও এল। কি যেন বলবারও চেষ্টা করল। তারপরেই সব ছায়া-ছায়া হয়ে গেল, ঘর বারান্দা কিছুই রইল না। শুধু সামনে অন্ধকার বন আর পিছনে নদীর ফোঁস-ফোঁসানি। ওরা ধূপধাপ করে যে যার গাড়িতে উঠে পড়ল। সর্দারজি অরূপকে সঙ্গে টেনে নিলেন। পনেরো মাইল ফিরে গিয়ে ছোট শহরে ওরা রাত কাটিয়ে সকালে যে যার পথ দেখল। কারো মুখে কোনো কথা নেই।

খালি অরূপকে জিপ ও লোকজন নিয়ে একটু বেলায় গিয়ে গাড়িটা উদ্ধার করতে হল। তখন নদীর জল কমে গেছে, পুল আর কাঁপবে না। গাড়ি সারানো হলে অরূপ পুল পার হয়ে ওদিকের পথ ধরল। তার আনা লোকগুলোর পাওনা চুকিয়ে জিজ্ঞাসা না করে পারল না, 'নদীর তীরে গাছের নীচে শুকনো ফুল কেন?' তারা হেসে বলল, 'গাঁয়ের লোকের কুসংস্কার মশাই। মাসে একবার এখানে বুনকিদেওর পুজো দেয়। তিনি নাকি বিপন্ন যাত্রীদের রক্ষা করেন।' অরূপ বলল 'আর গোলাবাড়ি সার্কিট হাউসের ব্যাপারটা কি?' তারা অবাক হয়ে বলল, 'সে তো কবে ভেঙেচুরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।'

রাতের আশ্রয়

মনোজ বসু

রাত দুপুরে মোটরবাস রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দিয়ে গেল। গাঁ-বসতি নেই কোনোদিকে। আউশ-খেতের মধ্যে দিয়ে কাঁচারাস্তা চলে গেছে। দুর্যোগও বিষম। হু-হু করে হাওয়া বইছে রাস্তা থেকে উড়িয়ে ধানবনে ফেলে না দেয়। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি। অন্ধকারে চারদিক লেপেপুঁছে গেছে এক মাত্র সুবিধা, ঝিলিক দিচ্ছে মাঝে মাঝে। সেই আলোয় পথ দেখে এগুচ্ছি।

অথচ কোনো গোলমাল হবার কথা নয়। সন্ধ্যা নাগাদ বাস নামিয়ে দেবে, পালকি থাকবে। বাস থেকে নেমেই পালকি।—এই সমস্ত লিখেছিল দীপেশ। বি ডি অর্থাৎ ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসে কাজ করে সে। মাইল তিনেক পথ। কাঁচারাস্তা বটে, কিন্তু বাঁকাচুর নেই, নাকের সোজা চলে গেছে। অন্ধ মানুষও অবাধে চলে যেতে পারে। আর, আমার জন্যে তো পালকি।—দীপেশ সবিস্তারে সমস্ত জানিয়েছিল।

কিন্তু বাসটা বদমায়েসি করল। গোড়ায় বেশ ভালো। অ্যাসিস্টান্ট বার পাঁচ-সাত হ্যান্ডেল মারতে গর্জন করে উঠল। ড্রাইভার গদি থেকে নেমে এসে ইঞ্জিনের সামনে পথের উপর গড় হয়ে প্রণাম করল। ভাবখানা এই, ত্যাঁদড়ামি কোরো না আজকের এই দুর্যোগের দিনে, এক দৌড়ে গিয়ে কেশবপুর থানার সামনে নিজের জায়গায় দাঁড়াও, রাতের মতন নিশ্চিন্ত। বাসও যেন কানে নিল কথাটা। ভক্‌ভক্‌ আওয়াজ করে পথের গোরুছাগল মানুষজন ভয় দেখিয়ে দিব্যি স্ফূর্তিভরে দৌড়চ্ছে। কুয়োদার হাট ছাড়িয়ে এসে মাথায় যে কী শয়তানি ভর করল—একেবারে নিশ্চুপ। অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। কত কাণ্ড করছে ড্রাইভার—এটা খুলছে, ওটা খুলছে, ইঞ্জিনের তলায় ঢুকে যাচ্ছে এক-একবার। কিছুতেই কিছু নয়। শেষটা নিজের সিটে উঠে বসে যত প্যাসেঞ্জার নামিয়ে দিল। বলে, ঠেলুন মশায়রা—

পাঁছিশজনের পঞ্চাশখানা হাত ঠেললে তো গাড়িও চলতে লাগল। ঠেলা বন্ধ হল তো গাড়িও অচল। বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে গাড়ি যেন নেশা করে বুঁদ হয়ে আছে, আমরা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি।

প্যাসেঞ্জাররা চেঁচামেচি করে, এ বেশ মজার হল। ঠেলতে ঠেলতে কেশবপুর পৌঁছে দিতে হবে নাকি? ভাড়া নিয়েছ তবে কেন?

ড্রাইভার বলে, বেশ, সিটে উঠে পড়ুন তবে মশায়রা। তাতে যদি গাড়ি কেশবপুর পৌঁছে দেয়, আমার কোন ক্ষতি?

না তোমার ক্ষতি কোনোদিকে নয়। গাড়ি না চলে তো আমরা ঠেলব, চললে তখন তো ইঞ্জিনেই টানছে। তুমি থাক আরাম করে গদির উপরে।

আজেবাজে কথার জবাব না দিয়ে ড্রাইভার নির্বিকারে বিড়ি ধরাল একটা। আমাদের কষ্টে ও কাকুতিমিনতিতে শেষটা বুঝি ইঞ্জিনের দয়া হল খানিকটা। আওয়াজ দিয়ে উঠল হঠাৎ। চলতেও শুরু করল। কিন্তু খানিকটা গিয়ে ঝিমিয়ে আসে আবার, দাঁড়িয়ে পড়ে। পুনশ্চ ধস্তাধস্তি। এমনি ভাবে যেখানে ঠিক সন্ধ্যার সময়ে এসে পৌঁছবার কথা, সেখানে রাত্রি বারোটায় এনে নামিয়ে দিল।

দিয়েই ছুট। ড্রাইভার বলে, দেরি করতে গেলে আবার হয়তো বিগড়ে যাবে, তাহলে চিত্তির। নামবার সময়টুকুও দেয় না এমনি অবস্থা।

ছুটে বেরুল মোটরবাস। নীরব অন্ধকার। ছরছর করে এই সময় বৃষ্টি এল এক পশলা। কাঁচারাস্তার জলকাদা ভেঙে চলেছি। বিপদের উপর বিপদ—মাঠের উলটোপালটা হাওয়া ছাতায় বেঁধে পটপট করে কতকগুলো শিক ভেঙে গেল, ছাতার কাপড় উড়ছে ঘুড়ির মতন পতপত করে। তখন আর চলা নয়—দৌড়ানো দস্তুরমতো। তেপান্তর মাঠ থেকে ছুটে পালিয়ে গাঁ-বসতি কোথাও আশ্রয় পেতে চাই।

ছুটছি, ছুটছি। নদীর উপর এলাম। নদীর কথাও দীপেশ লিখেছিল বটে। নদীর উপরে পাকা পুলের কথা। পথ ভুল করিনি তবে। কিন্তু আর তো পেরে উঠিনে। শীত ধরে গিয়ে সর্বাঙ্গ ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে, পা চলতে চাইছে না। অসাড় হয়ে পথের উপর পড়ে না যাই, এই এখন ভয়।

ঝিলিক দিল একবার। দেখলাম, পুলটা ছাড়িয়ে অদূরে অশ্বত্থতলায় পাকাঘর। চুনকাম-করা শাদা দেয়াল বিদ্যুতের আলোয় ঝিকমিক করে উঠল। খেতে চাই নে। জায়গার অকুলান থাকে তো এমনকী শোওয়ার কথা বলব না। রাতটুকু মাথা গুঁজে থাকবার মতো আশ্রয়।

কড়া নাড়তে সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। এমন নিশিরাত্রে জেগেই ছিল ভিতরের মানুষ। মাথায় আধ-ঘোমটা ফুটফুটে এক তরুণী বউ দরজা খুলে দিল।

পিছনে এক বুড়ো মানুষ। বিদ্যুৎ চমকাল ঠিক এই সময়। দেখলাম, কাঁদছিল বউটা। এখনো সামলে নিতে পারেনি। কেঁদে কেঁদে চোখ লাল। দু-গালে জলের ধারা গড়াচ্ছে। কোন দুঃখে জানি নে, ঘরে খিল এঁটে বসে কাঁদছিল. বুড়োর সঙ্গেই বা কি সম্পর্ক বউটার—

বুড়ো পরিচয় দিয়ে দিলেন,—আমার বউমা। দাঁড়িয়ে কেন বাবা, ভিতরে এসো। বৃষ্টিতে নেয়ে গেছ একেবারে। শুকনো কাপড়চোপড় আছে তো সঙ্গে—

হাতের কিটব্যাগ দেখিয়ে দিলাম। মোটামুটি সমস্ত আছে। বুড়ো বললেন,—বউমা, বসবার একটা কিছু পেতে দাও খাটের উপর। বাছার বড় কষ্ট হয়েছে।

কী মোলায়েম কথা বুড়োমানুষটির। কথা শুনে সব কষ্ট জুড়িয়ে যায়। চেহারাটিও মুনিঋষির মতন। বউটি বলবার আগেই বেরিয়ে চলে গেছে। ব্যাগ খুলে শুকনো কাপড় বের করে পরলাম। মাদুর বালিশ আর চাদর হাতে করে বউ ফিরে এল, পরিপাটি করে পেতে দিল। যেমন শ্বশুর, তেমনি বউ—কী ভালো যে এরা! কিন্তু বড় দরিদ্র। নড়বড়ে ছোট একখানা খাট একেবারে খালি পড়েছিল। মাদুর বালিশ চাদরে বিছানা করছে—তা-ও অতি জীর্ণ। চুপিচুপি বলছি, দোষ নেবেন না— সাধারণ অবস্থায় অমন চাদরে পা মুছি নে আমরা।

বিছানা করে দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমি বললাম,—রাত দুপুরে রাঁধাবাড়ার হাঙ্গামায় যাবেন না আবার। মণিরামপুরে গাড়ি অচল হয়েছিল, সে সময়টা ভরপেট খেয়ে নিয়েছি।

বউটি বড় বড় চোখ মেলে আমার দিকে একবার তাকিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। বুড়ো দেখছি মজলিশি মানুষ। এত রাত্রি, তবু খাটের প্রান্তে পা ঝুলিয়ে কথাবার্তা আরম্ভ করে দিলেন।

—একেবারে কিছু খাবে না বাবা? না, লজ্জা করে বলছ? ছেলের মতো তুমি, খুলেই বলি। দুর্যোগে অতিথি হয়ে এলে। সত্যি ভাবনা হয়েছিল, কি খেতে দিই এখন। বউমার মনে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। তবু সে মেয়ে বড্ড ভালো। তুমি নিজে থেকে মানা না করলে এতক্ষণে রান্নাবান্না বসিয়ে দিত।

সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা করি, কাঁদছিলেন যেন উনি? কি হয়েছে।

ফোঁস করে বুড়ো এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, —বড় দুঃখের বৃত্তান্ত। সংসারে আগুন ধরে গেল। রোজগেরে ছেলে বাসা তেকে দূর করে দিল আমাদের। আগে বউমাকে দিল, তার পর আমাকে। একটা বেলার এদিক-ওদিক। বাপবেটি সেই থেকে এখানে আশ্রয় নিয়ে আছি। ছেলে আবার বিয়ে করছে শুনতে পেলাম। বউমা ছেলেমানুষ তো—খবর শোনা অবধি দু-চোখে ধারা বয়ে যাচ্ছে তার।

স্তম্ভিত হয়ে গেছি। বুড়ো আরো কত কি বলে যাচ্ছেন, এক বর্ণ আমার কানে যাচ্ছে না। নিরপরাধ এই সুন্দরী মেয়েটাকে ত্যাগ করেছে। এবং বাপ বোধ হয় পুত্রবধূর হয়ে দু-কথা বলতে গিয়েছিলেন, সেজন্য তাঁকেও তাড়িয়েছে। সেই পাষণ্ড টোপর মাথায় দিয়ে আবার নতুন বউ আনতে চলল। হাতের মাথায় পেলে লোকটাকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে দিতাম, তাতে আমার জেল-ফাঁসি যা হবার যত। এই সমস্ত ভাবছি। এক সময় বুড়ো উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, দরজা দিয়ে শুয়ে পড় বাবা। আমরা এই পাশেই রইলাম।

জোর বৃষ্টি-বাতাস তখনো বাইরে। বড্ড ধকল গিয়েছে, শুতে শুতেই ঘুমিয়ে পড়েছি। মড়ার মতন ঘুমিয়েছি। যখন ঘুম ভাঙল, দরজা খুলে দেখি, বিস্তর বেলা হয়েছে। চারিদিকে রোদ, রাত্রিবেলায় অত দুর্যোগের চিহ্নমাত্র নেই।

চলে যাওয়ার আগে বুড়ো মানুষটিকে দু-এক কথা বলে যাওয়া উচিত। বড় ভালো লোক এরা। আরে সর্বনাশ, এ কোন জায়গা, ঘরের ঠিক পিছনে শ্মশান-ঘাট মজা-নদীর কূলে। আধপোড়া কাঠ, ভাঙা কলসী, ছেঁড়া মাদুর-বালিশ ইতস্তত ছড়ানো,—গ্রাম্য শ্মশানের যে চেহারা হামেশাই দেখা যায়। যে কুঠুরিতে রাত্রিবাস করেছি, সেটা শ্মশানবন্ধুদের বসা-ওঠার জায়গা। দেয়ালে সাল তারিখ সব খোদাই করা আছে, রাত্রিবেলা নজরে আসেনি—নবীনচন্দ্র মালাকার নামে কোন এক ব্যবসায়ী পিতামাতার আত্মার কল্যাণে এই ঘর বছরখানেক আগে বানিয়ে দিয়েছেন। আমার শোবার ব্যবস্থা করে দিয়ে শ্বশুর আর পুত্রবধূ গেলেন কোথায় তবে?

ঘণ্টাখানেক পরে বি ডি অফিসে হাজির হলাম। অদূরে দীপেশের কোয়ার্টার। ইস্কুলে পড়বার সময় দীপেশ অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিল আমার। অনেক বছর পরে হঠাৎ এই সেদিন শিয়ালদা স্টেশনে দেখা। বিয়ের বাজার করে ফিরছে। আমায় নিমন্ত্রণ করে হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বারংবার যাবার জন্য বলল। কথা না দিয়ে পারলাম না। সেই কথা রাখতে গিয়ে এত দুর্ভোগ।

আমায় দেখে দীপেশ কলরব করে উঠল। বিয়ের তারিখ কাল। আত্মীয়স্বজন কিছু কিছু এসে পড়েছেন। ভিড় জমেছে মন্দ নয়। বলে, এক-গলা কথা জমে আছে, চল। চেঁচিয়ে চা-খাবার দিতে বলে টানতে টানতে তার নিজের ঘরখানায় নিয়ে চলল।

ঘরে ঢুকে চমকে উঠি। সামনের দেয়ালে হাসিমুখ তরুণীর ছবি। ঠিক তার উলটোদিকের দেয়ালে বুড়ো মানুষটি। কাল রাত্রে শ্বশুর আর পুত্রবধূ সেই যে দুজনকে দেখেছিলাম। স্তম্ভিত বিস্ময়ে দীপেশটাকে জিজ্ঞাসা করি, চবি কাদের?

আমার স্ত্রী নীরা। আর ইনি হলেন বাবা। —দীপেশের ছোক ছলছল করে ওঠে,—এই কোয়ার্টারে আসার পরেই সর্বনাশ হল। কলেরা হয়ে দুজনে মারা গেলেন। একই দিনে—সকাল আর বিকাল। আটমাস হয়ে গেল দেখতে দেখতে। বউমা বলতে বাবা অজ্ঞান হতেন। বউ যেতে তাই যেন তিনি আর দেরি করলেন না।

চার বুড়োর আড্ডা

আশাপূর্ণা দেবী

সকাল থেকে আকাশ থমথমে মেঘলা, বিকেল হতেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। দেখে মজিলপুরের বিখ্যাত 'চার বুড়োর আড্ডা'-র তিন বুড়ো হরিহর, গদাধর আর মুকুন্দ ছটফটিয়ে উঠল, "সেরেছে! বুনোটা আসতে পারলে হয়!"

মুকুন্দ এর মধ্যেই তাসের প্যাকেটটা বার করে অকারণ ভাঁজছিল, হঠাৎ জোর গলায় বলে উঠল, "না, না, আসবে ঠিকই! আড্ডায় আসেনি, এমন কোনোদিন হয়েছে?"

হরিহর বললে, "হয়নি! সেটা আজন্মকাল গায়ে-গায়ে থাকার জন্যে! চারজনেই দুমিনিটের রাস্তায়। বুনোটার যে বুড়ো বয়সে মতিভ্রম ঘটল। এই শেষ বয়েসে কিনা শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি পেয়ে, সাতপুরুষের বাড়িঘর ছেড়ে ঠেলে গিয়ে সেখান সামলাতে গেল। এখান থেকে কমাইল রে গদা?"

"এখন তো আর মাইল বলে না রে। কিলোমিটার-ফিটার কী যেন বলে।"

"থাম তো! এখন কী বলে তা নিয়ে তোর কী দরকার? তোর যা জানা তাই বল।"

"তা সেটা কত আর? আধমাইলটাক। বুনোর কাছে তো নস্যি। তবে কাল যেন বলছিল, কদিন থেকে হাঁটুটা বড় জ্বালাচ্ছে। ব্যথা, যন্ত্রনা।"

"তাই যখন, তখন একটু সময় থাকতে বেরিয়ে পড়লেই হত! সকাল থেকেই তো আকাশের অবস্থা দেখছিস! কী এত রাজকার্য তোর।"

এমনভাবে বলে, যেন সামনেই রয়েছে 'বুদ্ধু' বনমালী!

গদাধর বলল, "তা বুনোর তো নিজের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বাস করতে যাওয়ার মন ছিল না। বউ ছেলেমেয়েকে বলেছিল, 'তোমরা গিয়ে থাকো গে, আমি এখানে বেশ থাকব। দূর তো বেশি না, দুপুরের দিকে গিয়ে না হয় ভাতটা খেয়ে আসব। রাতে তো খাদ্য খই-দুধ, সে এখানে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। দক্ষর মা রয়েছে। চারদিকে এত বন্ধুবান্ধব, পাড়াপড়শি!' তো বউ ছেলেরা রাজি হল? বলল, 'পাগলের মতো কথা বোলো না!"

"ওই সম্পত্তিটা পাওয়াই কাল হল।"

"আহা! এদিকে ছেলেমেয়ে তো আহ্লাদে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নেচেছিল! তাদের তো হাল ফিরে গেল। বুনোর শাশুড়িবুড়ির তো কম ঐশ্বর্য ছিল না! জমিজমা, বাগান, মাছের পুকুর, গোয়ালে গোয়ালভরা গোরু, উঠোনে গোলাভরা ধান! তায় আবার সে-বাড়ির কাছাকাছি সিনেমা হল!"

মুকুন্দ তাসটা জোরে-জোরে ভাঁজ করতে-করতে বেজার মুখে বলে, "বুনোর আর ওর কোনটা কাজে লাগবে? পেটরোগা মানুষ! রাতে তো খায় এক ছটাক দুধে একটু খই ভিজিয়ে, আর দিনে একটু শিঙ্গিমাছের ঝোল আর গলা-গলা ভাত।"

"সে-কথা কে বুঝছে? বয়েস হলেই পরাধীন। একদা ওই বুনো যখন রেল আপিসে কাজ করত? ছুটিছাটায় বাড়ি এলে গুষ্ঠিসুদ্ধু সবাই থরহরিকম্প।"

মুকুন্দ বলল, "এখন সকলেরই এক অবস্থা।"

গদাই বলে ওঠে, "তুই আর বলিসনে। তোর না আছে বউ-ছেলে, না আছে সংসার। পিসিমার যাওয়া পর্যন্ত তো মুক্ত পুরুষ। তা পিসিই কি কম দিন গেছে? পিসির মেয়েটাই গিন্নি হয়ে উঠল।"

কথাটা ঠিক! মুকুন্দ ঝাড়া হাত-পা। কোনো একসময় সেও চাকরি-বাকরি করত, তবে মজিলপুর থেকে কলকাতায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি এমন কিছু ব্যাপার ছিল না! তা যাকগে, সেসব গত কথা!

মুকুন্দ বরাবরই রীতিমতো স্বাধীন! পিসি থাকতেও। পিসি ছিল ভালো মানুষের রাজা! তো পিসির মেয়েটার সঙ্গে মুকুন্দ পাড়াতেই তার এক জ্ঞাতিভাইয়ের ভাইপোর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। সেখানেই দুপুরে খাওয়াদাওয়া করে আসে। আর সারাদিনের চা, জলখাবার, আড্ডায় মুড়ি-তেলেভাজা, রাত্তিরে দুখানা রুটি আর এক থাবা তরকারি পিসির মেয়ে বা ভাই-বউ নিজে এসে-এসে সাপ্লাই করে যায়।

হরিহর আর গদাধরের অবশ্য মস্ত একখানা করে সংসার। ছেলে, বউ, নাতি-নাতনি, গিন্নি! তা তাতে তার নিয়মিত সময় আড্ডায় হাজরে দেওয়ায় কোনো বিঘ্ন ঘটে না।

বড় সুখেই কাটায় এই চার বুড়ো!

আজন্মের বন্ধু!

ছেলেবেলায় ইস্কুল পালিয়ে পরের বাগানের ফলপাকুড় চুরি করতে, আরো একটু বড় হলে পরের পুকুরের মাছ ধরতে, একেবারে একাত্মা। পাড়ার লোক বলত, "দুজোড়া মানিকজোড়!"

এখন ক্ষমতা গেছে। তবু সারাটা দিন খেয়ে, শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে কাটিয়ে, ছটফট করতে থাকে এই সন্ধেবেলার তাসের আড্ডার জন্য! যেই চারজনে এক হল, যেন কী এক পরম পাওয়া পেল!

তা বনমালী অন্য পাড়ায় চলে গিয়েই যে আড্ডায় ঘাটতি ঘটেছে তা নয়। পৃথিবী উলটে গেলেও—ঠিকই যথাসময়ে এসে হাজির হয়!

আজই একটু যেন দেরি হচ্ছে!

কাজেই বাকি তিনজনে বলে চলেছে, "চিরদিনের হাড়-মুখ্যু! আকাশটা তো দেখছিস সকাল থেকে? দুঘণ্টা আগে বেরোলেই-বা কী হত?"

এদিকে বৃষ্টিটা যেন একটু জোরেই এসে গেল।

নাঃ। মাটি করেছে!

তিন বুড়োই ফরাসপাতা চৌকি ছেড়ে বাইরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। উদ্বিগ্ন মুখ। উৎকণ্ঠ দৃষ্টি।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল হরিহর, "ওই তো, ওই তো আসছে! হুঁ বাবা। বলেছি না, পৃথিবী উলটে গেলেও আসা রদ হবে না!"

কিন্তু কী আশ্চর্য!

ছাতা মাথায় নেই কেন?

খালি মাথায় ভিজতে-ভিজতে আসছে!

মুকুন্দ তাড়াতাড়ি নিজের ছাতাটা নিয়ে, নিজের মাথায় দিয়েই এগিয়ে গেল।

সেকেলে ঢাউস মার্কা ছাতা! দুজনের মাথা অনায়াসে ঢাকা পড়তে পারে!

একজন আসছে।

অপরজন যাচ্ছে।

মাঝখানেই দেখা!

ভিজে চুপচুপে বনমালী বলে ওঠে, "আঃ, তুই আবার কেন কষ্ট করে? যা ভেজবার, তা তো ভিজেইছি!"

"তা হোক। চোখে দেখে স্থির হয়ে থাকা যায়; কিন্তু ছাতা নিয়ে বেরোসনি কী বলে?"

বনমালী কেমন একরম বোকাটে হাসি হেসে বলে, "বেরিয়েছিলাম! নাতনি তার শৌখিন ছাতাখানা দিল হাতে। হঠাৎ সেই হালকা ছাতাখানা ঝোড়ো হাওয়ায় হাত ফসকে উড়ে গিয়ে ঘোষের পুকুরে গিয়ে পড়ল! ঢের চেষ্টা করলাম, হল না।"

বলতে বলতে এসে পড়ে।

বাকি দুজন হইহই করে ওঠে, "এসে গেছে। এসে গেছে।"

মুকুন্দ বলে, "আহা, এখন ভিজে জামাকাপড় ছেড়ে, গা-মাথা মুছে আমার শুকনো কিছু জামা-কাপড় পরে তবে গুছিয়ে বোস!"

বনমালী তাড়াতাড়ি বলে, "না, না! বেশ আছি। গায়ে-গায়ে শুকিয়ে যাবে!"

"গায়ে-গায়ে শুকিয়ে যাবে? বলিস কী? ভিজে টুসটুস করছিস! কেন, আপত্তিটা কিসের?"

বনমালী আবারও তেমনই বোকাটে হাসি হেসে (এটা ওর মুদ্রাদোষ) বলে, "কে আবার তোর জামা-কাপড় ফেরত দিতে আসবে?

"কেন? তুই-ই আসবি। কাল কি আর এত বিষ্টি পড়বে? তোরটা কাচিয়ে শুকিয়ে রাখব, আমারটা দিয়ে যাবি, তোরটা নিয়ে যাবি। প্রবলেমটা কোথায়?"

"তাই বলছিস? আসলে কী জানিস, আচ্ছা দিচ্ছিস দে, নাতনির ছাতাটা গেল।"

বনমালী একখানা গামছা আর মুকুন্দর একখানা শুকনো ধুতি-গেঞ্জি আর হাফ পাঞ্জাবি হাতে নিয়ে পাশের দালানটায় চলে গেল!

গদাধর আর হরিহর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, "যাক বাবা, শেষ পর্যন্ত এল তা হলে! ...দ্যাখ কাণ্ড! এখন বৃষ্টিটা ছেড়ে গেল!"

যাক! এখন যেখানে যাই হোক অন্তত ঘণ্টাতিনেকের মতো তো নিশ্চিন্তি!

পৃথিবীতে তখন থাকবে শুধু এই একখানা ফরাসপাতা মস্ত চৌকি চারটে গোল্লা-গোল্লা তাকিয়া, চারটো বুড়ো আর একজোড়া তাস!

বনমালী মুকুন্দর জামা-কাপড়ে সজ্জিত হয়ে চলে এসে গছিয়ে বসতেই, গদাধর বলে ওঠে, "যাক বাবা, শেষ পর্যন্ত এলি! ভাবনা ধরেছিল, বুঝিবা আজকের আড্ডাটা ফসকে গেল।"

"আজকেরটা ফসকাবে মানে?"

বনমালী তার রুপোর নস্যির কৌটো থেকে একটিপ নস্যি নিয়ে নাকে গুঁজতে গিয়ে বলে, "এ হে হে ভিজে গেছে—যাকগে। ভিজেই সই।"

হরিহর বলে উঠল, "নস্যির কৌটো তো তোর ট্যাঁকে গোঁজা থাকে। সেখান থেকে কৌটোর ভেতরের নস্যি ভিজল কী করে?"

বনমালী ভিজে নস্যির হাতটা তাকিয়ায় মুছে হেসে বলে, "ওই তো খুড়োর কলে পড়ে গিয়েই তো... যাকগে, তাস সাজা! আজ না এসে থাকতে পারা যেত? কাল মুকুন্দ, আর তোর কাছে হেরে মরেছি না? ....শেষ পিটে হঠাৎ রঙের টেক্কা তুরুপ মেরে ছক্কা দিয়ে বসলি! আজ তার শোধ নিতে হবে না?"

"আজও তা হলে একই পার্টনার?"

"নিশ্চয়! অ্যাই মুকুন্দ, ওখানে করছিস কী?"

"কিছু না! তোর ভিজে জামা-কাপড়গুলো মেলে রাখছি! কী হল? তাস দেওয়া হয়েছে?"

"কখন!"

"রংটা কী হল?'

"চিড়িতন। চিড়িতনের সাহেব!"

"সেরেছে! চিড়িতন। ওটা আমার চিরকেলে অপয়া! যাক দেখি কী হাত?"

এই চার-চারটে আশি বছরের বুড়ো কী এমন খানদানি খেলা নিয়ে মশগুল থাকে!

এমন কিছুই না! সেই আদি-অন্দকালের 'গাবু' খেলা! ছেলেবেলায়, গরমের ছুটির দুপুরে পিসিমা, জেঠিমা, পাড়ার কাকিমাদের যে নিত্য তাসের আড্ডা বসত, সেইখানে কাছ ঘেঁষে বসে থেকে, আর মনপ্রাণ চোখ সব দিয়ে দেখে-দেখে যা শিখেছিল তাই চালিয়ে আসছে চিরকাল!

সেই সাবেকি—দুকুড়ি সাতের খেলা! এতে এখনকার খেলার মতো একসঙ্গে দুজোড়া তাস লাগে না, পয়সা নিয়ে বাজি ধরাধরি নেই, হারজিতের মধ্যে, অপর পক্ষের পিট-এর ওপর টেক্কা মেরে, কিংবা তুরুপ মেরে বেশি পিট বাগিয়ে জিতে যাওয়া।"

"আর হারা মানে?"

"ছক্কা-পাঞ্জা খাওয়া!"

এখনকার ছেলেমেয়েরা এই জোলো-জোলো খেলা দেখে আর তারই জন্যে বুড়ো চারটের হানফানানি দেখে হাসে!

তা তাতে বয়েই গেল!

কে ওদের কথার ধার ধারে?

এরা নিজেদের আনন্দেই মশগুল!

কিন্তু 'কালকের শোধ নেব' বলে যতই তড়পাক, বনমালীর যেন আজ কেমন অন্যমনস্ক-অন্যমনস্ক ভাব! ...বেশ দু-একবার ভুলই করে বসল। তার পার্টনার মুকুন্দর কারসাজি আর বাহাদুরিতে অবশ্য সামলে গেল।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য জিতেই গেল বনমালীরা!

যাক বাবা! বাঁচা গেল!

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বনমালী। চৌকি থেকে নেমে পড়ে বলে, "হেরো হয়ে মরতে হল না! আচ্ছা—"

মুকুন্দ হাঁ-হাঁ করে ওঠে, "আরে, আরে, চলে যাচ্ছিস যে? বিষ্টি ছেড়ে গেছে. এক্ষুনি চা, মুড়ি, ফুলুরি চলে আসবে—"

"তোরা খাস।"

"কেন, তোর কী এত তাড়া? গিন্নি গঞ্জনা দেবে?"

শুনে বনমালী জোর পায়ে হাঁটা দিতে দিতে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বাঁধানো দাঁতে ঝিলিক মেরে হেসে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা নেড়ে বলে যায়, "সে গুড়ে বালি।"

"আরে আরে, এই বুনো! তোর নস্যির কৌটোটা যে পড়ে রইল!"

তা সে-কথা আর বনমালীর কান পর্যন্ত পৌঁছল না বোধ হয়, ফিরে তাকাল না! হঠাৎ যেন অন্ধকারে মিশে গেল।

এরা তিনজন—হরিহর, গদাধর আর মুকুন্দ কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থেকে বলাবলি করে, "বুনোটার আজ যেন কেমন বেভাব, দেখলি না?"

"তাই মনে হল। বাড়িতে বকাবকি হয়েছে বোধ হয়।"

"বাড়ির বকাবাকিকে ও ভারী কেয়ার করে! শরীরটাই বোধ হয় জুতসই নেই?"

"হতে পারে। তা আমরাও তা হলে এবার চলেই যাই।"

মুকুন্দ হাঁ-হাঁ করে ওঠে, "কেন? তোদের এত কী তাড়া পড়ল? এই তো সবে আটটা কুড়ি! তোদের তো আর মাঠ ভেঙে এক মাইল পথ হাঁটতে হবে না। মুড়িটা এসে পড়বে হয়তো এখনই..."

"মুড়ি? বলছিস? তা হলে বসেই যাই আর একটু?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ! ততক্ষণ না-হয় 'গোলাম চোর' খেলাই চালিয়ে যাওয়া যাবে ছেলেবেলার মতো।"

বলে হ-হা করে হেসে ওঠে!

অতএব আবার দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে চৌকিতে বসা! তাসের গোছা নিয়ে নাড়াচাড়া।

একটু পরেই দরজায় ধাক্কা পড়ল, যেন জোর তলবে দুমদুম।

ওই এসে গেল মুড়ি-ফুলুরি! এত ধাক্কাচ্ছে কেন?

মুকুন্দ নেমে পড়ে এসে দরজাটা খুলেই প্রায় পাথর হয়ে গেল।

মুড়ি-বেগুনির বদলে এ আমার কী?

সামনে গোটাআষ্টেক ছোকরা। একজন একটা জ্বলন্ত হ্যারিকেন নিয়ে হাতে দোল খাওয়াচ্ছে!

"তোমরা কে বাবা?"

"আমাদের চিনতে পারছেন না?"

"না তো—ঠিক—"

"তা চিনবেন না। আমরা ও-পাড়ার। সিনেমা হল-এর পাশে থাকি আমরা। তো দাদুরা কি এখনো তাস পেটাচ্ছেন নাকি? অ্যাঁ? আচ্ছা লোক তো! চারজনের আড্ডার একজন যে আজ এল না, তার জন্যে প্রাণে একটু ধড়ফড়ানি আসেনি?"

"এল না মানে? বনমালীর কথা বলছ তো?"

তিনজনেই উঠে এসে মারমুখী হয়ে বলে ওঠে, "এই তো তাস খেলা সেরে একটু আগে চলে গেল!"

"কী? কী বলছেন দাদুরা? একটু আগে তাস খেলে উঠে গেলেন বনমালী বাঁড়ুজ্যে। হ্যা হ্যা হ্যা!... দাদুরা কি সন্ধেবেলাই আফিমের মৌতাতে ঝিমোন?... লোকটা তো সেই কোন বিকেলবেলা ঘোষের পুকুরে ডুবে মরে, এখন পেট ফুলে বাড়ির উঠোনে শুয়ে! ওঁর স্ত্রী কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, আপনারা নাকি ওঁর চিরকালের প্রাণের বন্ধু, তাই একবার শেষ দেখা দেখতে—"

হরিহর, গদাধর আর মুকুন্দ তিনজনের কেউই ব্রাহ্মণ নয়, হলে চিৎকার করে পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দিয়ে বসত। তবে শুধু চিৎকার করতে তো পৈতে লাগে না!

তিনজনে একসঙ্গে গর্জন করে ওঠে, "কী? আমরা অফিমের ঝোঁকে? অসভ্য, বেয়াদপ ইয়ার ছোকরারা! নিজেরা নেশার ঝোঁকে এসে যা মুখে আসছে বলে চলেছ?... ইয়ার্কি মারবার আর বিষয় পাওনি? একটা জলজ্যান্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তাকে মেরে পেট ফুলিয়ে উঠোনে শুইয়ে রেখে, ছি ছি! নরকেও ঠাঁই হবে না তোমাদের!"

"ও', বটে নাকি?'

আটজনের সমস্বর প্রতিবাদ!

"তা হলে এই চললুম! নেহাত আপনাদের খবরটা দিতে বললেন নবগোপালের ঠাকুমা, তাই আসা!... শেষ দেখা দেখতে ইচ্ছে হয় তো যান চটপট! নইলে পুলিশে এক্ষুনি লাশ তুলে নিয়ে গিয়ে মর্গে চালান দিয়ে দেবে। অপঘাত মিত্যু বলে কথা!"

নবগোপাল বনমালীর নাতি।

তিন বন্ধু হকচকিয়ে বলে, "ব্যাপারটা কী বল তো?"

"কী আবার? বদমাশ ছেলেদের বদমায়েশি। মজা করার এক নতুন ফন্দি।...আমরা ভয় পেয়ে ছুটতে-ছুটতে যাব, আর ওরা তখন দাঁত বার করে হাসবে!"

"তা হোক। তবু একবার যাওয়া যাক!"

এখন তিনজনের তিন মত।

"গিয়ে কী হবে? ওদের মজা করার হাসি দেখতে?"

"কিন্তু এত সব বলল। যদি সত্যি মর্গে চালান দিয়ে বসে! তা-হলে শেষ দেখাটা—"

"যদি মর্গে চালান দিয়ে বসে? জলজ্যান্ত লোকটাকে! বলি নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করব, না এই ফক্কড়দের কথা বিশ্বাস করব?"

"সেও তো কথা! নস্যির কৌটোটা তো এই চোখের সামনেই পড়ে থেকে চকচক করছে! খাঁটি রুপোর জিনিস! অফিসে রিটায়ার করার সময় ফেয়ারওয়েলে দিয়েছিল!"

কিন্তু নিজের চোখকে যে অবিশ্বাস করতে বাধ্য হতে হয়। অথবা অলৌকিক কোনো ভৌতিক কাণ্ডকে বিশ্বাস করতে হয়!

অথচ—ততক্ষণে পাড়ার লোকেরা মুকুন্দর দরজায় এসে ভেঙে পড়েছে।

"বামুনজ্যাঠ্যার খবর শুনলেন?"

"নবুর ঠাকুর্দার খবর শুনলেন?"

"কী কাণ্ড! কী কাণ্ড! হায়! হায়!"

"শুনলাম, বাড়ির লোকের কথা না শুনে, 'বিষ্টি আসছে বলে' বেলা তিনটের সময়ে আপনাদের এই আড্ডায় আসছিলেন!...হঠাৎ যে কী করতে পুকুরধারে গেলেন!"...

এই তিন বুড়ো, বিশেষ করে মুকুন্দ, গলার শির ফুলিয়ে, হাউমাউ করে চেঁচিয়ে বলতে চেষ্টা করল, "কিন্তু আসল ব্যাপারটা তো..."

তা কে শোনে কার কথা?

যে মানুষটাকে বেলা পাঁচটায় পুকুর থেকে টেনে তোলা হয়েছে এবং এখনো জল খেয়ে পেট জয়ঢাক করে বাড়ির উঠোনে পড়ে আছে, সে লোক সন্ধে সাড়ে ছটায় এঁদের সঙ্গে তাস খেলে গেছে, এ-কথা কে বিশ্বাস করবে?

সমবেতর রায় আসলে, 'আসছে-আসছে" করে ভাবতে-ভাবতে, 'এল না' দেখে বুড়োরা বাদলা হাওয়ার আমেজে ঘুমিয়ে পড়ছিল, আর সেই ঘোরের মধ্যে স্বপ্ন দেখেছে, "এসেছিল—খেলে গেছে।"

"বেশ, তাই যদি হয় তো নস্যির কৌটোটা?"

"ও কিছু না। হয়তো কালকেই ফেলে গিয়েছিল, তাকিয়ার তলায় পড়েছিল।"

"বটে! তাকিয়ার তলায়? তাকিয়া রোজ ঝেড়েঝুড়ে তোলা হয় না?... ঠিক আছে, তাই-ই যদি হয়, ওই ভিজে জামাকাপড়গুলো? যেগুলো দালানের কোণে পড়ে রয়েছে?"

দু-একজন বাড়ির মধ্যে ঢুকে এসে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে মুকুন্দকে বলল, "ওসব বোধ হয় দাদু, আপনারই! সকালে চানের সময় ছেড়েছিলেন, বাদলা দেখে। আপনার কাজের লোক বোধ হয় কাচেনি। ভেবেছে শুকোবে না তো। কেচে আর লাভ কী? কাল কাচলেই হবে!"

মুকুন্দ রেগেমেগে সেই ভিজে সপসপে ধুতিখানা কুড়িয়ে নিয়ে এসে বলে ওঠে, "এই ধুতি আমার? এই ঝুলপাড় বাবুধাক্কা দেওয়া ধুতি? জন্মে এরকম শৌখিন ধুতি পরি আমি? দেখেছে কেউ? কেউই পরতাম না। তো ইদানীং বুনোর নক্কামার্কা নাতিটা শখ করে দাদুকে পয়লা বোশেখে, পুজোর সময় ওইরকম বাহারি ধুতি কিনে এনে উপহার দেয়, তাই।"

কিন্তু এতেও কারো তেমন মন বদলাল বলে মনে হল না।

কোন বুড়ো কী পাড়-ধুতি পরে, সে আবার কে কবে তাকিয়ে দেখেছে?

অকাট্য আর প্রত্যক্ষ সত্য তো সেই জলে ডুবে মরা পেটফোলা লাশটা। যা নাকি সব্বাই স্পষ্ট চোখে দেখে এসেছে।

হঠাৎ পাড়ার ঠানদি গঙ্গাবুড়ি বলে ওঠে, "ওরে, শুনেছি, এমন হয়! হঠাৎ ঘটলে—সদ্য মড়াটা, আপনজনদের একটু দেখা দিতে যায়!"

তা 'একটু দেখা দিতে' যেতে পারে। হয়তো ছায়া-ছায়া শরীর নিয়ে। কিন্তু তিন ঘণ্টা ধরে তাস পিটে যায়?... "এই মারলাম টেক্কা। এই দিলাম তুরুপ!" বলে হুঙ্কার ছেড়ে যায়! কার মড়া তুলে কার নাম করেছে।

মুকুন্দ বনমালীর সেই ছেড়ে রেখে যাওয়া ভিজে জামা-কাপড়গুলো গামছায় জড়িয়ে পুঁটলি বেঁধে হাতে ঝুলিয়ে হনহন করে এগোতে থাকে বনমালীর শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশে!

এত জোরে হাঁটা অভ্যেস এখন আর নেই। কিন্তু রাগে, দুঃখে, অপমানে আর বিভ্রান্তিতে গায়ে পাগলা হাতির বল!

হরিহরের হাতে লণ্ঠন, সে হাঁক ছাড়ে, "এই মুকুন্দ। অত ছুটছিস কেন? আমি তাল দিতে পারছি না।"

তো তারপর?

বনমালীর শ্বশুড়বাড়ির উঠোনে তো সেই দুশ্যই!

'কার না কার মড়া' বলা উপায় কোথা? নাকের ওপরকার ওই মস্ত আঁচিলটি? এই মজিলপুর গ্রামে আশেপাশে আর কারো ছিল অমন?

আর ভিজে ধুতিখানা দেখেই তো বনমালীর গিন্নি ডুকরে উঠল, "ওগো, হ্যাঁগো? এই কাপড়টা পরেই বেরিয়েছিল গো!...ওমা—এখন পরনে কী? ছি ছি। এই সরু নরুনপাড় চটের মতন মোটা খেঁটে ধুতি সাতজন্মে পরেছেন তিনি কখনো? ওগো সেই যে বলে 'মরা' মানে নতুন কাপড় পরা। এ তাই না কি?... হায়। হায়। সগ্‌গে গিয়ে একি রকম কাপড় পরতে হবে তোমায়?"

নিজের ধুতিখানা সম্পর্কে এমন তাচ্ছিল্য শুনে বিরক্ত হয়ে সরে এল মুকুন্দ।

এই সময় পুলিশের লোক এল।

বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন, "কখন দেখা গিয়েছিল পুকুরে ভাসতে?"

"আজ্ঞে, বেলা পাঁচটা নাগাদ।"

"কে প্রথম দেখেছিল?"

"আজ্ঞে, এই যে এই রাখাল ছেলেটা। ওর একটা বাছুর হারিয়ে যাওয়ায় খুঁজে বেড়াতে-বেড়াতে চোখে পড়ে জলের মধ্যে কী দাপাদাপি করছে।... ভাবল বোধহয় বাছুরটা জল খেতে গিয়ে হড়কে পড়ে মরেছে। তা কুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার একটা ঠ্যাং হাতে পেয়েছে বলে বিস্তর টানাটানি করল বেচারা, কিন্তু এই রোগাপটকা বছরদশেকের ছেলের সাধ্য কী বনমালীর ওই লাশ টেনে তোলার?... তাছাড়া দেখল যেটাকে বাছুরের ঠ্যাঙ ভেবেছিল, সেটা হচ্ছে বনমালীর পাঞ্জাবি পরা একখানা হাত! তারপর আর কী? চেঁচামেচি করে পাড়াসুদ্ধ লোক জড়ো করে—"

"মাছধরা জেলেরা এসে টেনে তুলল।"

"দেখল, লোকটার অন্য হাতে একটা ফুলকাটা ছাতার বাঁট ধরা। ছাতার কাপড়টা জলে সুপসুপে ছেঁড়াখোঁড়া।"

"তার মানে টানাটানি করেছিল বুড়ো বিস্তর নাতনির ছাতাটা বাঁচাতে!"

তারপর?

তারপর আবার কী? পুলিশ লাশটাকে মর্গে নিয়ে চলে গেল। যতই যা হোক, অপঘাতের মড়াকে মর্গে নিয়ে যেতেই হবে! ফিরে ফিরে দেখে হিসেব করে বুঝতে হবে, সত্যিই নিজে অসাবধানে ডুবে গেছে; না কেউ শত্রুতা করে জলে ঠেলে দিয়ে চুবিয়ে মেরেছে!

অনেক রাত্রে ফিরে এল তিন বুড়ো।

হরিহর আর গদাধর বলল, "আজ রাত্তিরে আর তোর একা বাড়িতে শুয়ে কাজ নেই মুকুন্দ, আমরা দুজনা থাকি!"

"থাকবি, তা থাক!"

হাতের হ্যারিকেনটার পলতে বাড়িয়ে দিয়ে, দরজার তালা খুলে ঘরে ঢুকে এল মুকুন্দ। পিছু-পিছু ওরা দুজনেও।

ঘরের দরজার শেকলটা খুলল!

আর খুলেই তিন-তিনটে আড়ে-দৈর্ঘ্যে প্রকাণ্ড লোক "আঁ—আঁ—আঁ—" করে চেঁচিয়ে উঠে সপাটে মাটিতে!

জ্ঞান হারাবার আগে দেখতে পেয়েছিল চৌকির ওপর নিজের তাকিয়া ঠেস দিয়ে বনমালী তাস ভাঁজছে। এদের দেখেই খিখি করে হেসে উঠে ফ্যাসফেসে গলায় বলে উঠেছিল, "দুঃখু করিস না, আড্ডা ভাঙবে না। আসব রোজ।"

ভূতের মাসি, ভূতের পিসি

পূর্ণেন্দু পত্রী

পুকুরের রোয়াকে বসে দাঁত মাজছি। মা-ও ঘাটে এসেছে ঠাকুরপুজোর বাসন মাজতে। বাসন মাজতে মাজতেই মা কথা বলে চলেছে নন্দীপিসির সঙ্গে। নন্দীপিসি আমাদের নিজেদের পিসি নয়। গোটা গ্রামের পিসি। বাবা-কাকা-মা জেঠিরাও পিসি বলে। আমরাও বলি। বিধবা। বয়স প্রায় ষাট-সত্তর। ছিবড়ে পাকানো একরত্তি চেহার। কিন্তু কথা বলতে পারে বটে! দিনরাত খই ফুটছে মুখে। পাড়ার বাড়িতে বাড়িতে রাজ্যের যত খবর পৌঁছে দেওয়াটাই তার সারাদিনের কাজ।

দাঁত মাজতে মাজতে শুনতে পাচ্ছি নন্দীপিসি মাকে বলছে :

—শাশুড়ী বউয়ে কী ঝগড়া মা, কী ঝগড়া। আর ছেলেটাও হয়েচে তেমনি বউ- আঁচলে। লেখাপড়া শিখে কী করে যে এমন স্বার্থপর হয় মানুষ, বুঝিনে মা।

কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে আমি বলে ফেলি :

—কাদের কথা বলছ গো পিসি?

আমি কথাগুলো শুনে ফেলেছি দেখে নন্দীপিসি আমার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে একটু বেঁকে বসে।

—সে তুই জানবিনি। অন্য গাঁয়ের কথা বলতেছি।

সেদিন আর চেপে রাখতে পারিনি জিভের ডগায় উঠে এসেও যে প্রশ্নটাকে গিলে ফেলতে হয়েছে অন্য দিনগুলোয়।

—আচ্ছা পিসি, তুমি দশ গাঁয়ের এত হাঁড়ির খবর পাওকী করে গো?

পিসির মুখে এক গাল হাসি। অর্ধেক দাঁত পড়ে গেছে। যেগুলো আছে, পান-দোক্তার কষে মিশমিশে কালো, হাসলে মড়া-খুলির হাসির মতো বিকট হয়ে ওঠা মুখটা।

—সে তোকে বলব কেন রে ছোঁড়া? আমার এক মাসি আছে। তার কাছ থেকে পাই।

—তোমার মাসি? তাহলে তার বয়স কত?

—তার বয়স? তা ধর এখন হবে ছ-কুড়ি পাঁচ।

—ছ-কুড়ি পাঁচ। মানে একশো পঁচিশ। একশো পঁচিশে বেঁচে আছে? তাই আবার হয় নাকি? আর হলে তো আমরা জানতাম। সাড়া পড়ে যেত তাকে দেখার।

—বিশ্বাস হলনি তোর। তাহলে তোর মাকে জিজ্ঞেস কর। ল বউ, তোর বেটাকে বলে দে তো মাসির কথা।

আমি মায়ের দিকে তাকাই।

—হ্যাঁগো মা, সত্যি?

মা ধমকে দেয়।

—তোর ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকারটা কী শুনি? শুনলি তো আছে, ব্যস হয়ে গেল।

—আছে যদি তো কোথায় আছে? আমরা দেখতে পাই না কেন?

নন্দীপিসির কোটরে ঢোকা চোখদুটো এবার আমার দিকে।

—দেখতে না পেলেই বুঝি নেই? ভগবানকে তো চোখে দেখতে পায় না কেউ। তাহলে কি ভগবান নেই?

—ভগবানের কথা আলাদা। তুমি তো বলছ জ্যান্ত মাসির কথা। তাহলে দেখাও একদিন। আবার ধমকানি মায়ের গলায়।

—নন্তু, দাঁত মাজা হয়ে গেছে। পড়তে বোস তো।

আমি ঘাট থেকে উঠে আসি। মাথার মধ্যে কিন্তু পেরেক দিয়ে সাঁটা হয়ে যায় একশো-পঁচিশ বছরের মাসির রহস্যটা। যখন পড়ছি, স্কুলে যাচ্ছি, স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলছি, সাইকেলে চেপে দোকানে যাচ্ছি, সব সময়েই মনের মধ্যে ওই ধাঁধাটার ঘুরঘুরোনি।

দিনপাঁচেক পরে হঠাৎ একদিন ফাঁকা রাস্তায় একা পেয়ে যাই নন্দীপিসিকে। তড়াক করে সাইকেল থেকে নেমে টিপ করে এক প্রণাম।

—ভালো থাকো বাবা।

তখনই ছুঁড়ে দিই মোক্ষম প্রশ্নটা।

—আচ্ছা পিসি, মাসির মারফত তুমি যদি রাজ্যের খবর পেয়ে যাও,তাহলে আমাদের স্কুলের খবর পাবে না কেন?

—তোদের ইস্কুলের খবর? কী খবর?

—এই ধরো, আর দশদিন পরে হাফ-ইয়ার্লির রেজাল্ট বেরোবে। বেরোবার আগে জানাতে পার না, কে ফার্স্ট, কে সেকেন্ড, কে থার্ড এইসব খবর?

—অঃ, এই সব খবর? আচ্ছা মাসিকে জিজ্ঞেস কবর'খন। জিজ্ঞেস করে তোকে জানিয়ে দোবো।

মনে মনে জানি, মাসি তো মাসি, মাসির ঠাকুর্দার সাধ্য নেই পরীক্ষার খবর আগে জেনে ফেলার। আর দিন কয়েকের মধ্যে মন থেকে মুছেও যায় ব্যাপারটা।

তিনদিন পরে পায়ের তলার মাটিতে ভূমিকম্পের কাঁপুনি।

পুকুরে খেলার মাঠের কাদা হাত ধুয়ে বাড়িতে ঢুকেছি কি ঢুকিনি, মায়ের গলায় স্কুলের ইংরেজি স্যারের গর্জন।

—হ্যাঁ রে হতভাগা, ট্যাং ট্যাং করে খেলে বেড়াচ্ছে দিনরাত। হাফ-ইয়ার্লিতে যে পটল তুলে বসে আছিস, খেয়াল আছে সেদিকে?

—হাফ-ইয়ার্লি? এখনো তো রেজাল্ট বেরোয়নি। বেরোলে দেখো, ফার্স্ট যদি হতে নাও পারি, সেকেন্ড তো হবই।

—আর তোমাকে সেকেন্ড হতে হবে না। অঙ্কে ডিগবাজি খেয়ে সেকেন্ড হবে?

—অঙ্কে ডিগবাজি খেয়েছি? কে বললে তোমাকে?

—কে বলবে আবার! যাকে জানতে চেয়েছিলি। এই তো খানিক আগে নন্দীপিসি এসেছিল তোর খোঁজে। তোকে না পেয়ে আমাকে বলে গেল সব।

—কী বলে চলে গেল?

—কে ফার্স্ট, কে সেকেন্ড এই সব।

—কে ফার্স্ট?

—সন্তোষ জানা।

—আর সেকেন্ড?

—মহিম সাঁতরা।

—থার্ড?

—দেবাশিস পুরকায়স্থ।

—আমি?

—অঙ্কে কচুপোড়া।

—বাজে কথা।

ভিতরে ভিতরে ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গিয়েও মায়ের কাছে বুকের ছাতি ফুলিয়ে বলি— নন্দীপিসি ওসব আজগুবি গল্পে তোমাদের মতো আমি কান দিই না। সত্যিকারের রেজাল্ট বেরোক তখন দেখে নিও।

সংস্কৃত সারের মতো মায়ের টিপ্পনী।

—থাক।তোমার বিদ্যের দৌড় আর দেখাতে হবে না আমাদের। না পড়েই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

হাফ-ইয়ার্লির রেজাল্ট বেরোয় যথাসময়ে। আর সেটা শুনতে শুনতে আমার চোখ দুটো অন্নপূর্ণা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে রাজভোগের সাইজ। সত্যি সত্যি ফার্স্ট হয়েছে সন্তোষ, সেকেন্ড মহিম, থার্ড দেবাশিষ। আর আমি অঙ্কে ফেল।

চোখের জলে নাকমুখ ভিজিয়ে বাড়ি ফিরি। রাত্রে ঘুমোতে পারি না। ফেল করার দুঃখে নয়। নন্দীপিসির মাসি কী করে জেনে গেল এমন দুঃসাধ্য খবর সেটাই হাত-লাট্টুর মতো ঘুরে চলেছে মগজে।

দিনদশেক পরের কথা। অঝোর বৃষ্টি নামল বিকেলবেলায়। খেলার মাঠ থেকে ফিরচি। একটা জায়গায় রাস্তার বাঁধ কাটিয়ে দেওয়া হয়েছে বানের জলকে মাঠ থেকে অন্য দিকে সরিয়ে দিতে। আমি লাফিয়ে নালাটা পার হয়েই চমকে উঠি। নন্দীপিসি বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে।

—কি পিসি, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে?

—কে তুই বাবা?

—সে কি গো, চিনতে পারলেনা আমাকে। বাড়িতে পরীক্ষার রেজাল্ট জানিয়ে দিয়ে বকুনি খাওয়ালে আমাকে।

—অঃ নন্তু, এই বৃষ্টিতে কি দেখা যায় কিছু! আমার নজর কি তোদের মতো বাবা। দে বাবা, আমাকে নালাটাপার করিয়ে।

—সে দিচ্ছি। কিন্তু তোমাকে বলতে হবে একটা কথা।

—কি কথা, বল।

পরীক্ষার রেজাল্ট কী করে জানলে তুমি?

—আে বাবা, সে কি আমি জেনেছি নাকি? মাসিকে গিয়ে বললুম। মাসি জেনে আমাকে বলল, আমি তোকে না পেয়ে তোর বাড়িতে জানিয়ে দিয়ে এলুম।

—মাসিই-বা জানল কি করে?

—ও মা, কি বলিস তুই? মাসি জানতে পারবে না এমন কিছু আছে নাকি ভারতে?

—একশো পঁচিশ বছরের বুড়ি। তার তো নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। ভারতের কথা জানবে কি করে শুনি?

—তোর সন্দেহ হচ্ছে বুঝি?

—হচ্ছেই তো।

—বেশ, তাহলে বৃষ্টি বাদলা থামুক। তোকে একদিন নিয়ে যাবো মাসির কাছে।

আমি কোল-পাঁজা করে নন্দীপিসিকে পৌঁছে দিই নালার ওপারে।

ভাদ্র গিয়ে আশ্বিন। এসে গেল দুর্গাপুজো। নেচে-কুঁদে দিনগুলো কেটে গেল, যেন রংমশালের আলো। সামনে কালীপুজো। একদিন বাজি তৈরির মশলা কিনে ফিরছি বাজার থেকে। সামনে নন্দীপিসি। সাইকেল থেকে নেমে পড়ি।

—কি গো পিসি, মনে আছে তো?

—মনে থাকবেনি কেন? কাল সন্ধেবেলায় কামারশালায় ঢিপির তলায় এসে দাঁড়াবি, তোকে নিয়ে যাব মাসির কাছে।

আনন্দে আমার পিঠে যেন প্রজাপতির ডানা।

পরের দিন ঠিক সময়ে কামারশালার ঢিপির তলায়। সন্ধে হয়ে গেছে। জায়গাটা নির্জন। শুধু ঢিপির পিছনের কামারশালা থেকে লোহা পেটানোর দুমদাম শব্দ। আর মাথার উপরে ঘরে ফেরা পাখিদের ডানার ঝটপটানি।

খানিক পরেই এসে গেল নন্দীপিসি।

—চল।

নন্দীপিসি সামনে। আমি পিছনে। মল্লিকদের পুকুর পেরিয়ে, অধিকারীপাড়ার পর প্রকাণ্ড বাঁশঝাড়ের রাস্তাটা যেন গুহার মতো। সেই গুহার ভিতর দিয়ে জানাপাড়ার পানবরোজ ডাইনে রেখে নন্দীপিসি বাঁদিকে বাঁকতেই আমি বলে উঠি :

—ও পিসি, কোথায় যাচ্ছ? ওদিকে তো শুধু বনজঙ্গল।

—ভয় করছে নাকি তোর? এই তো এসে গেছি। আর একটুখানি।

আমি ভেবেছিলাম কোনো বাড়িতে যাচ্ছি। বাড়িতে নিয়ে দেখব চৌকিতে শুয়ে থাকা হাড়সার এক বৃদ্ধাকে। কিন্তু এ কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে আমাকে নন্দীপিসি? তখুনি গায়ের লোম জুতোর বুরুশের মতো খাড়া। বুকের মধ্যে ঢিপঢিপিনির শুরু। আমি বাঁ হাতে জাপটে ধরি নন্দীপিসির আঁচল। অন্ধকার পেরিয়ে নন্দীপিসি এসে থামল জঙ্গলের ধারের একটা প্রকাণ্ড ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছের তলায়। ছেলেবেলায় দু-একবার এদিকের ঝোপ-ঝাড়ে কুল পাড়তে এসেছি বলেই আন্দাজ করে নিতে পারি, ওটা তেঁতুল গাছ। চারপাশে এমন ঘুরঘুট্টি অন্ধকার যে কোনো গাছকেই আলাদা করে চেনারউপায় নেই। আকাশ মাটি গাছপাল সব একাকার হয়ে গিয়ে যে একটা অন্ধকারের পাহাড় খাড়া করে তুলেছে চোখের সামনে। বুঝতে পারি শুকিয়ে আসছে গলা। টের পাই হাত-পায়ের কাঁপুনি। আরো শক্ত করে চেপে ধরি নন্দীপিসির আঁচল। তক্ষক ডেকে চলেছে কোথাও। তার প্রত্যেকটা ডাকে কেঁপে ওঠে বুকের রক্ত!

এবার নন্দীপিসির গলা।

—অ মাসি, বাড়ি আছো?

প্রশ্নটা শেষ হতেই তেঁতুল গাছের ভিতরে খড়খড় ঝর-ঝর শব্দের একটা মিহি ঝড় বয়ে গেল যেন। অনেক উঁচু থেকে কেউ যেন নেমে এল নীচে। তারপরই খিলখিলে গলায় :

—কে? ভবতারিণী?

—হ্যাঁ গো, মাসি।

—তোর কথাই ভাবতেছিনু। সঙ্গে কে?

—দ্যাখো তো একে চিনতে পারো কিনা।

—দাঁড়া দেখি।

দিশেহারা হয়েও আমি উপর দিকে তাকাই এক ঝলক। আর তখনই চোখে পড়ে তেঁতুল গাছের নিরেট অন্ধকারে ভিতরে দুটো টুনি বালবের মতো আলোর বিন্দু। চোখ নামিয়ে বুজিয়ে ফেলি সঙ্গে সঙ্গে।

—অ মা, এ তো মুখুজ্যেদের বাড়ির ছেলে। খুব দুষ্টু। দুপুরবেলা ভাঁড়ার ঘরের আচার চুরি করে খায়। তালগাছে উঠে শালিক পেড়ে এনে খাঁচায় পোষে। ইস্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় অধিবাসীদের বাগানের আমলকী পাড়ে ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে। পড়ার বইয়ের আড়াল দিয়ে ডিটেকটিভ বই পড়ে।

—তাহলে চিনতে পেরেছো। ওর খুব শখ তোমাকে দেখার। তোমার বয়স যে ছ-কুড়ি পাঁচ সেটা বিশ্বাস হয়নি ওর।

নন্দীপিসির কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা অদৃশ্য হাসির ঝাপটা। অমন হাসি জীবনে শুনিনি কখনো। ঠিক মনে হল একসঙ্গে শ-খানেক চামচিকের হাসির লুটোপুটি। হাসি থামলে :

—ওর কি দোষ বল। ও কি জানে আমাকে, না দেখেছে কখনো। ওর মা জানে। ওর মা যখন নতুন বউ হয়ে শ্বশুড়বাড়িতে এল হপ্তায় হপ্তায় গিয়ে ঝামা দিয়ে পায়ের তলা ঘষে আলতা পরিয়ে দিয়েছি। হাতপায়ের নখ কেটে দিয়েছি। সোহাগী নাপতেনির কত খাতির ছিল ওদের বাড়িতে। ওর মায়ের পেটের বাচ্চা হল প্রথম। তার নাড়ি কেটেছি আমি। আঁতুড়ঘর পাহারা দিয়েছি রাত জেগে। তার বদলে পেট পুরে খেয়েছি দুবেলা। শাড়ি পেয়েছি। প্রথম ছেলের পর ওর মা আবার যখন মা হল আমারই নাড়ি কাটার কথা। কিন্তু তার আগেই আমাকে খুন করল মুখপোড়া সোয়ামিটা। গলায় দড়ি দিয়ে টাঙিয়ে দিল কড়িকাঠে। স্বর্গে যাওয়া হলনি আমার অপঘাতে মিত্যু বলে। তো সেই থেকে এই তেঁতুল গাছেই।

এর পরের কথাগুলো শুনতে পাইনি আর। অজ্ঞান হয়ে গেছি ততক্ষণে।

শিবকালীর যাত্রা দেখা

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

যাত্রা দেখার খুব শখ শিবকালীর। কোথাও কোনো যাত্রা হচ্ছে শুনলে ওকে আর ধরে রাখা যায় না। কোমর কষে সে বেড়িয়ে পড়বেই।

এই নিয়ে প্রথম-প্রথম তাকে কত না গালমন্দ শুনতে হত। শিবকালীর বউয়ের মুখ তো রীতিমতো হাঁড়ি হয়ে উঠত, 'হ্যাঁ গো, তুমি কী বলো তো, রাতবিরেতে মাঠঘাট ডিঙিয়ে যাত্রা শুনতে যাও, পথে কোনদিন শাঁকচুন্নি এসে ঘাড়ে চেপে বসবে, তখন বুঝবে।'

শিবকালী বউয়ের কথা থোড়াই গ্রাহ্য করত। দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলত, 'শাঁকচুন্নি-নাকচুন্নি আমার ঢের দেখা আছে, তুমি সব ব্যাপারে অমন বাগড়া দিয়ো না তো। তোমার যদি ইচ্ছে করে তো চলো না আমার সঙ্গে।'

শিবকালীর বউয়ের বেরোবার উপায় নেই। গেঁটে বাতের রুগি। দেওয়াল ধরে ধরে বড়জোর এ-ঘর ও-ঘর করতে পারে, তার বেশি নয়। ফলে বেচারিকে একাই থাকতে হত। আর শিবকালী ট্যাং-ট্যাং করে বেরিয়ে পড়ত। সঙ্গে একটা গামছা নিতেও ভুল করত না। বলা তো যায় না, রাত ভোর হতে-না-হতেই যদি যাত্রা ভাঙে, তা হলে এই গামছা পেতেই কোথাও একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাবে। কতবার যে এইভাবে রাত ভোর করে ও বাড়ি ফিরেছে তার গোনাগুনতি নেই।

তা যাত্রা তো আর বারো মাসই লেগে থাকে না, এই রক্ষে। ন-মাসে ছ-মাসে কখনো-সখনো হয়। এই যেমন মাসচারেক পরে আজই সন্ধের সময় শিবকালী খবর পেল মল্লিকপুরে যাত্রা হবে। কলকাতা থেকে কোনো এক যাত্রাপার্টি নাকি গাইতে এসেছে।

যেই শোনা, আর যায় কোথায়! দেখতে যাওয়ার জন্য মনটা চনমন করে উঠল। ওদিকে আমার মল্লিকপুর তো ধারেকাছের ব্যাপার নয়, পাক্কা চার ক্রোশ পথ। পথে আবার একটা নদীও পেরোতে হয় খেয়া চেপে। এ অবস্থায় এখনই যদি ও বেরিয়ে না পড়ে, তা হলে আর গিয়ে লাভ কী!

শিবকালী আরও উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল এই ভেবে যে, এ তো আর হেঁড়িপেঁজি দলের যাত্রা নয়, দল এসেছে কলকাতা থেকে। কলকাতার দল মানেই দারুণ ব্যাপার। ফলে এ যাত্রা না দেখলে জীবনই বৃথা।

তাই, ঠিক করে ফেলল, বাড়িতে গিয়ে বউকেও আর জানাবার দরকার নেই, যাত্রা দেখে এসে ক্ষমা চেয়ে নিলেই হবে।

কাঁধে গামছাটা ফেলে হাঁটা শুরু করে দিল শিবকালী। গাঁয়ের সীমানা পার হয়েই হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। ওদিকে আবার তিথিটা হচ্ছে আজ অমাবস্যা। চারপাশে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ঝোপঝাড়ের মধ্যে জোনাকি পোকার খেলা শুরু হয়ে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে গাছগাছালির তলা দিয়ে যাওয়ার সময় গা-টা কেমন ছমছম

করে ওঠে শিবকালীর। তবে এটাও ও টের পায়, ওর পায়ের শব্দ পেয়ে শেয়াল-কুকুরও গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পালাতে শুরু করে। হাজার হোক প্রাণের ভয় কার না থাকে।

দু-একবার পেঁচার ডাকও কানে এল শিবকালীর, গ্রাহ্য করল না। পেঁচারা হচ্ছে সব রাতের পাখি, রাতে তো ওরা ডাকবেই। ডাকুক না, ওর কী।

হনহন করে হাঁটতে থাকে শিবকালী। হাঁটতে হাঁটতে মাঠঘাট আর দু-একটা গ্রাম পেরিয়ে শেষপর্যন্ত এসে পৌঁছল নদীর ধারে। নদী পেরিয়ে খানিকদূর এগোলেই মল্লিকপুর। কিন্তু হায় কপাল, নদী পেরোবে কী ভাবে। নদীর ঘাটে তো জনমানবের চিহ্ন নেই, একেবারে ফাঁকা। ঘাটে খেয়া নৌকোটাকেও দেখা যাচ্ছে না। তা হলে কি আজকের মতো খেয়া পারাপার বন্ধ হয়ে গেল নাকি রে বাবা! কেমন যেন সমস্যাতেই পড়ে গেল শিবকালী।

চারপাশে তাকাল। ঘাটের গায়েই দুটো একটা ঝুপড়ি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ঝুপড়ির ভেতর কেউ আছে বলে মনে হল না। সব ফাঁকা। দিনের বেলা এ-জায়গাটা কত সরগরম থাকে। একটা ঝুপড়িতে দোকান বসে। চা-ফুলুরি বিক্রি হয়। কেউ-কেউ আবার ওপর থেকে খেয়া আসার অপেক্ষায় এই ঝুপড়ির মধ্যে বসে গুলতানি করে। দিনের বেলার ব্যাপার-স্যাপার অন্যরকম।

শিবকালী হতাশভাবে এগিয়ে এসে একটা ঝুপড়ির পাশে দাঁড়াল। তারপর কী যে করা যায়, ভাবতে লাগল। আর ঠিক এই সময়ই পেছন দিক থেকে একটা গলার আওয়াজে, 'কী গো কর্তা, এখানে এত রাতে?'

শিবকালী একটু চমকেই উঠেছিল, পেছন ফিরে দ্যাখে, রোগা টিঙটিঙে একটা লোক। পরনে লুঙ্গি, গায়ে একটা ফতুয়ার মতো জামা, চোখদুটো কেমন যেন ড্যাবডেবে। জিজ্ঞেস করল, 'খেয়া কি বন্ধ হয়ে গেছে নাকি গো, মল্লিকপুর যাব ভেবেছিলাম!'

লোকটা খিঁখি করে একটু হেসে উঠল, 'মল্লিকপুরে কেন, যাত্রা দেখতে?'

হাসিটা কেমন সন্দেহজনক মনে হল শিবকালীর। গম্ভীরভাবে লোকটার আপাদমস্তক একবার দেখে নিল। তারপর বলল, 'সেরকমই তো ইচ্ছে ছিল। কলকাতা থেকে যাত্রাপার্টি এসেছে শুনলাম, কিন্তু খেয়া না থাকলে যাই কী করে! এত দূর থেকে এত কষ্ট করে এসে এখন যদি না যেতে পারি, কেমন লাগে বলো তো!'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই। আমিও কর্তা যাত্রা দেখব বলে এসেছিলাম। খেয়া নেই দেখে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবছি, কী করি!'

'ও, তোমারও যাত্রা দেখার খুব শখ বুঝি!' শিবকালী মনে-মনে খুশিই হয়। তবু যা হোক, একজন সঙ্গী পাওয়া গেল। জিজ্ঞেস করল, 'খেয়া নৌকোর তো এপারেই থাকার কথা, তাই না?'

লোকটা আবার একটু খিঁখিঁ করে হাসল, 'আজ্ঞে তাই তো কথা। তবে আমার মনে হয়, মাঝি হয়তো ওপারেই নৌকো রেখে যাত্রা শুনতে গেছে।'

অন্ধকারে এপার-ওপার কিছুই ঠাহর করা যায় না। সব যেন মিলেমিশে একাকার। তা কী আর করা যাবে, শিবকালী জিজ্ঞেস করল, 'আর কোনো ডিঙি নেই ধারেকাছে? যে-কোনো একটা পেলেই তো ওপারে নিয়ে গিয়ে যাত্রা দেখে আসা যেত। ফেরার সময় আবার জায়গার নৌকো জায়গায় রেখে যাওয়া যেত!'

লোকটা বলল, 'ছোট্ট একটা ডিঙি এদিকে তোলা রয়েছে। কিন্তু ওর যা হাল, জলে নামতে সাহস হয় না।'

'কেন, সাহস হয় না কেন? কী হয়েছে।'

'তলিতে একটা ফাটল রয়েছে গো কর্তা। শেষ অবধি নদী পার হওয়ার আগেই যদি ডুবে যায় তো কেলেঙ্কারি।'

'কোথায় সেই নৌকো, চলো তো দেখি!'

লোকটা আঙুল তুলে দেখাল, 'ওই যে গো কর্তা, ওই ওদিকে। কাদার ওপর তোলা রয়েছে।'

হাতপঞ্চাশেক দূরে সত্যি-সত্যি ছোট্ট একটা ডিঙি নৌকো কাদায় পড়ে থাকতে দেখা গেল। শিবকালী সঙ্গে-সঙ্গে এগিয়ে গেল নৌকোর গায়ে হাত বোলাতে শুরু করল। হাত বোলাতে-বোলাতেই একসময় গলা তুলে ডাকল, 'ও মশাই, এ তো সামান্য একটু ফাটল গো। আমার মনে হয়, নৌকোয় তেমন জল ওঠবার আগেই আমরা ওপারে গিয়ে পৌঁছে যাব।'

লোকটাও ততক্ষণে এগিয়ে এসেছিল কাছাকাছি, 'ভালো করে দেখে নিয়েছ তো?'

'হ্যাঁ গো মশাই, এই তো সামান্য একটু ফাটল। আর একটুকু নদী পার হতে কতক্ষণই বা লাগবে। চলো না গো, এটা করেই পার হয়ে যাই। যাবে?'

লোকটা আবার খিঁখিঁ করে একটু হেসে নিল, 'তা বলছ যখন, চলো। একা-একা এতক্ষণ আমার এ-নৌকো নিয়ে জলে নামতে সাহস হচ্ছিল না। তা দুজনে মিলে যা হোক করে চলে যাওয়া যাবে।'

'বেশ, এসো তা হলে হাত লাগাই।'

শিবকালী লোকটার সঙ্গে হাত লাগাল নৌকোয়। তারপর হেঁইয়ো মারো হেঁইয়ো করতে করতে নৌকোটাকে জলে ভাসাল। জলে ভাসতেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পড়ল নৌকোয়।

লোকটা বলল, 'দাঁড়াও কর্তা, বৈঠা নিয়ে আসি।'

বলতে-বলতে লোকটা ছুটে গিয়ে ঝুপড়ির ভেতর থেকে বৈঠা নিয়ে হাজির হল।

যাক বাবা, নিশ্চিন্ত। নদীও বেশ শান্তই। বৈঠার ঘায়ে তরততর করে এগিয়ে চলতে লাগল নৌকো।

বেশ খানিকটা এগোবার পর লোকটা বলল,'দ্যাখো তো কর্তা, ফাটল দিয়ে জল উঠছে কিনা। তুমি বরং জলটা ছেঁচতে থাকো না, নীচেই দ্যাখো,জল ছেঁচার একটা কৌটো রয়েছে।'

শিবকালী শক্ত করে কোমরে গামছাটা জড়িয়ে নেমে পড়ল জল ছেঁচতে। সাধারণ মানুষ, এসব কাজে ওর জুড়ি নেই। ঝপাস-ঝপাস করে জল ছেঁচতে থাকে শিবকালী।

লোকটাও হেঁইয়ো-হেঁইয়ো করে বৈঠা চালায়। লিকপিকে চেহারা হলে কী হাবে, বৈঠাটা ও ভালোই চালায় বলে মনে হল শিবকালীর। ছপ-ছপ করে বৈঠার শব্দ এসে ওর কানে লাগল।

সারা আকাশ নক্ষত্রে ভরা। হঠাৎ একসময় একটা তারা খসে পড়তে দেখল ওরা। বেশ লাগে তারা-খসা দেখতে। একটা যেন হাউইবাজি আকাশ থেকে তাক করেপৃথিবীর দিকে নেমে আসতে থাকে। তারপর কখন একসময় যেন শূন্যের মাঝে মিলিয়েও যায়।

কিন্তু তারা-খসা দেখার জন্য আকাশের দিকে এখন হাঁ করে তাকিয়ে থাকা যায় না। আবার জল ছেঁচায় মন দেয় শিবকালী। ভালোয় ভালোয় এখন ওপারে গিয়ে পৌঁছাতে পারলে যেন বাঁচে।

আরো কিছুক্ষণ কেটে যায়। লোকটা একসময় বৈঠা থাকিয়ে এপাশ-ওপাশ তাকায়।

'কী হল গো', শিবকালী প্রশ্ন করে, 'থামলে কেন'?

লোকটা খিঁখিঁ করে আবার হেসে উঠল। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, 'নদীর যে আর এপার-ওপার দেখা যায় না গো, আমরা বোধ হয় মাঝনদীতে এসে পড়েছি।'

'তা হবে।' শিবকালীও এবার একটু কোমার টান করে উঠে দাঁড়ায়। চারপাশে তাকায়, 'মাঝনদীই মনে হচ্চে। তার মানে এখনো অর্ধেক বাকি। আরো একটু জোরে-জোরে টানো না গো, এদিকে নৌকোতেও এখন গবগব কর জল উঠতে শুরু করেছে।'

'তাতো উঠবেই। তলা-ফুটো নৌকোর আর দোষ কী বলো। খিঁখিঁ—

হাসিটা এবার কেমন যেন বেয়াড়া ধরনের মনে হয় শিবাকালীর। আবার কোমর টান করে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল,'হাসছ যে?'

'না কর্তা, এমনিই। আসলে কী জানো, নৌকোটা এখন যদি ডুবে যায় তো খুব মজা হয়। খিঁখিঁ—'

'মজা! মজা কীরকম?'

'যার নৌকো, সে এসে কপাল চাপড়াবে, মজা না!'

'বটে, পরের ক্ষতি দেখতে বুঝি তোমার ভালো লাগে?'

'তা লাগবে না, এই দ্যাখো তোমাকে একটা কথা বলি, এ সংসারে চিরকাল আমি সবার উপকার করারই চেষ্টা করি, কিন্তু সংসারসুদ্ধ লোক আমার ক্ষতি করার জন্য মুখিয়ে থাকে। খিঁখিঁ—

শিবকালী আবার লোকটার আপদামস্তক দেখে নিল। 'বুঝেছি। তেমার মাথার বল্টুগুলো একটু ঢিলে রয়েছে। যাকগে, ওসব থাক। আর-একটু জোরে জোরে ঘাই মারো দেখি। জল যেভাবে উঠছে, শেষটায় না জানি ডুবতেই হয়!'

লোকটা আবার হাসতে থাকে। হাসতে হাসতেই বলে, 'ডুবলেই কী আর ভাসলেই কী, আমি আর ওসব নিয়ে ভাবি না কর্তা।'

'ভাবো না মানে। এই রাতে জলে ডুবে মরতে চাও নাকি?'

লোকটার হাসি যেন আরো বাড়তেই থাকে। পাগল নাকি রে বাবা।

শিবকালি আবার কোমর টান করে ওপারের দিকে তাকায়। এপার-ওপার কিছুই ভালো করে চোখে পড়ছে না। নদীটা কি এত চওড়া না কি রে বাবা! অথচ পারে দাঁড়িয়ে তো এমনটা মনে হয়নি।

হঠাৎ এ-সময় দুটো নিশাচর পাখি পতপত করে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল।

শিবকালী হুশ-হুশ করে উঠল, 'পালা, পালা। বিরক্ত করিস না বাপ!'

লোকটার মুখে আবার বদখত হাসি।'

কী হল হে, আবার কী হল তোমার? হাসছ যে?'

'হাসব না, নৌকো তো জলে ভরে গেল গো। কী মজা!'

শিবকালীও নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল, সত্যি, আর রক্ষে নেই। নৌকো এবার ডুববেই। জল ছেঁচার আর মানেই হয় না। ও তাই ছেঁচার কাজ বন্ধ রেখে উঠে দাঁড়াল।

লোকটাও বৈঠা ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে। তারপর হাসতে হাসতেই বলল, 'বুঝলে কর্তা, আমাদের আর নৌকো করে পার হওয়া কপালে নেই। চলো হাঁটি এবার।'

'হাঁটব মানে, জলের ওপর দিয়ে কেউ হাঁটতে পারে নাকি?'

'পারে গো, পারে। এই দ্যাখো না, আমি হাঁটছি।'

বলতে বলতে লোকটা নৌকো ছেড়ে জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল সামনের দিকে।

'বটে!' শিবকালীও আর নিজের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারল না। জলের ওপর দিয়ে সেও হাঁটতে শুরু করল লোকটার পেছন-পেছন।

আর হাঁটতে হাঁটতে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ডাঙায় এসে উঠল ওরা।

ঘটনাটা যে এরকম ঘটতে পারে, লোকটা তা একদম আঁচ করতে পারেনি। অবাক হয়ে শিবকালীর দিকে একবার তাকাল, তারপর পায়ের ধুলো নেওয়ার জন্য শিবকালীর দিকে ঝুঁকে পড়ল।

'ও কী, ও কী, কী হচ্ছে।'

'কী হচ্ছে মানে! কর্তা যে আমারই মতো, সেটা এতক্ষণ টেরই পাইনি।'

'কী তোমার মতো?'

'আজ্ঞে আমি ভেবেছিলাম, সত্যিকারের বুঝি একটা মানুষ পেয়েছি। মানুষ যখন, তাকে মাঝনদীতে নিয়ে গিয়ে একটু মজা করি।'

'মজা মানে?'

'মানে, সত্যি কথা বলব কর্তা, ইচ্ছে ছিল মাঝনদীতে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে মারি।'

শিকালীই এবার লোকটার মতো খিঁখিঁ করেহেসে উঠল। হাসতে হাসতেই বলল, 'বুঝেছি, সারাক্ষণ কেবল লোকের অপরকার করারই চেষ্টা। তা একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

লোকটা করুণ চোখে তাকায়, 'কী প্রশ্ন?'

'কতদিন ধরে এ-জগতে ঘোরাঘুরি করছ শুনি?'

'আজ্ঞে, তা বেশিদিন নয়। এই তো সেবার খুব কলেরা লাগল। সেই কলেরাতেই আমি পটল তুললাম। তারপর আর কী করি, নদীর পারেই থাকি। তা আমারও একটা প্রশ্ন আছে তোমার কাছে।'

'কী প্রশ্ন বলো না!'

'তুমি কবে থেকে?'

শিবকালী আবার একটু খিঁখিঁ করে হেসে নিল। 'আমিও অবশ্য বেশিদিন না। সেবার খুব বন্যা হল, বন্যায় বাড়িঘ ভেসে গেল, মনে আছে?'

লোকটা ড্যাবড্যাব করে তাকায়, 'মনে থাকবে না, কী যে বলো, কত হাজার-হাজার লোক সেই বন্যায় মরে গেল!'

'হ্যাঁ গো সেবারই। আসলে আমার বউটার আবার গেঁটে বাত। তাকে বাঁচাতে গিয়েই তো পটল তুলতে হল। তারপর আর কী করি, খিঁখিঁ—

'তার মানে, অপঘাতে?'

'ওই যা বলো না কেন। মৃত্যু মৃত্যুই। তা সে অপঘাতেই হোক আর যেভাবেই হোক। তাই না? তা, সেসব কথা থাক। চলো না, এতদূর যখন এসেই পড়লাম, যাত্রাটা একটু দেখেই আসি।'

লোকটা বলল, 'চলো'।

তারপর ওরা দুজনে মল্লিকপুরের মাঠে এসে যাত্রা দেখতে বসে পড়ল। আট-দশ হাজার লোকের ঠাসাঠাসি ভিড়ে সেই আসরে। তারই মধ্যে ওরা দুজনও ফাঁক বুঝে বসে পড়ল। কেউ বুঝতেই পারল না, ভূতেরাও এই আসরে বসে যাত্রা দেখছে।

কলিকাতার গলিতে

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বিশ্বনাথ পাড়াগাঁয়ের ছেলে।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে দুপুর-রাতে বাঁশবনের ভেতর দিয়ে সে তিনক্রোশ অনায়াসে বেড়িয়ে আসতে পারে। অমাবস্যায় গ্রামের সীমানায় শ্মশান থেকে মড়াপোড়ানো কাঠ সে কতবার বাজি ধরে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ভয় তার শুধু কলকাতা শহরকে।

যেখানে দু-পা এগুতে হলে মানুষের গায়ে ধাক্কা লাগে, ইলেক্‌ট্রিক আর গ্যাসলাইটের কল্যাণে যেখানে দিন কি রাত চেনবার জো নাই বললেই হয়, সেইখানেই একরাতে সে যা বিপদে পড়েছিল, তা জীবনে **ভোলবার নয়।**

বিশ্বনাথ বলে,—না, কলকাতা শহরে সন্ধ্যার পর বেরোনো নিরাপদ নয়।

আমরা হেসে উঠলে বলে,—না হে না। চৌরঙ্গি, সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ-এর কথা বলছি না। কলকাতাটা আগাগোড়া চৌরঙ্গি নয়। শোন তাহলে—

সেবার গাঁয়ের লাইব্রেরির জন্যে বই কিনতে কলকাতা গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, একদিন থেকেই বইপত্র সব কিনে রাতের ট্রেনেই বাড়ি চলে আসব। কিন্তু কলকাতায় গেলে নতুন বায়স্কোপ-থিয়েটার না দেখে কেমন করে ফেরা যায়। প্রথম দিনটা তাতেই কেটে গেল। দ্বিতীয় দিনে কলেজ স্ট্রিটে গিয়ে বই-টই সব কিনে ফেললাম। সঙ্গে বিছানাপত্র বা তোরঙ্গ-বাক্সের ঝঞ্ঝাট ছিল না। শুধু একটিমাত্র সুটকেস, তাতে বইগুলো ভরে একেবারে সোজা শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে উঠলেই হত। কিন্তু হঠাৎ কি খেয়াল হল, একবার অবিনাশের সঙ্গে দেখা করে **যাই।**

অবিনাশ আমাদের গ্রামের ছেলে। ইস্কুলে আমার সঙ্গেই পড়াশুনা করেছে। কলেজেও কয়েক বছর আমরা একসঙ্গে পড়েছিলাম। অবিনাশ বেশিদিন অবশ্য কলেজে থাকেনি। অত্যন্ত খেয়ালি ছেলে—কোনো কাজে বেশিদিন লেগে থাকবার মতো ধৈর্য তার ছিল না। ছেলেবেলা থেকেই কেমন যেন তার উড়ু উড়ু ভাব। বাড়ি থেকে যে কতবার সে ছেলেবেলায় পালিয়ে গেছে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। বড় হয়েও তার সে স্বভাব যায়নি। কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ একদিন হয়তো শুনলাম, অবিনাশ হেঁটে সেতুবন্ধ যাওয়ার জন্যে বেরিয়ে পড়েছে। তারপর হয়তো দুমাস তার দেখা নেই। আমরা কোনোরকমে প্রক্সি দিয়ে হয়তো সেবার তার কলেজের খাতায় কামাই-এর সংখ্যা কমিয়ে রাখলাম, কিন্তু এমন করেই-বা কতদিন রাখা যায়। বছরের শেষে এগজামিনেশনের সময়ে দেখা গেল, অবিনাশ আমাদের প্রক্সি দেওয়া সত্ত্বেও কলেজে এত কমদিন এসেছে যে, তার পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পাওয়া অসম্ভব। আমরা দুঃখিত হলাম। ছেলেটা এত আমুদে—এত মিশুকে ছিল যে, আমরা সবাই তাকে ভালোবাসতাম। কিন্তু অবিনাশের যেন স্ফূর্তিই হল। বললে, —তবে আর কি?

বর্মাটা একবার ঘুরে আসি ভাই। তারপর অবিনাশের আর দেখা নেই। আমাদের থেকে তার ধাতই ছিল আলাদা।

পৃথিবীটা যে মস্ত বড়, এই আনন্দেই তার মন ভরপুর হয়ে থাকত। পৃথিবীর এই বিশালতাকে দেশে-দেশে নতুন পথে ঘুরে ঘুরে উপভোগ করে তার আশ মিটাতে চাইত না। যে-সব দেশ সে এখনো দেখেনি তার আকর্ষণের কথা সে মাঝে মাঝে এমন তন্ময় হয়ে বলত যে, আমাদের কখনো কখনো মোহ ধরে যেত—কেমন যেন মনে হত, এই ছোট্টো শহরের ছোট্টো জানা কটি রাস্তায় দুবেলা যাওয়া-আসায় জীবনের কোনো সার্থকতাই নেই—পথ যেখানে অফুরন্ত, আকাশের যেখানে কূল-কিনারা নেই, এমন জায়গায় বুক ভরে বড় বড় করে নিশ্বাস নিতে না পারলে যেন বাঁচাই বৃথা।

আমাদের এই ক্ষণিক মোহ অবশ্য খানিক বাদেই কেটে যেত, কিন্তু অবিনাশের এই মোহই ছিল সব।

মাস-তিনেক আগে আমার গ্রামের ঠিকানায় এই অবিনাশেরই একটা চিঠি পেয়েছিলাম বহুদিন বাদে। একটা গলির ঠিকানা দিয়ে লিখেছিল যে, অনেক জায়গা ঘুরেফিরে সে কলকাতার এই ঠিকানায় আপাতত আছে। আমি এসে তার সঙ্গে যেন দেখা করি। এতদিন বাদে তাকে সেই ঠিকানায় পাওয়া হয়তো যাবে না জেনেও একবার যেতে ইচ্ছে হল।

বাড়ির নম্বরটা ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু গলিটার নাম মনে ছিল। ভাবলাম, কলেজ স্ট্রিট থেকে বেশি দূর হবে না। ট্রেনেরও এখন দেরি আছে। একবার দেখা করেই যাই, যদি তাকে পাওয়া যায়।

একটু খোঁজাখুঁজির পর একটা গলি-রাস্তায় ঢুকে একজনকে জিজ্ঞেস করে জানলাম যে, আর একটু গেলেই অবিনাশ যে গলিতে থাকে তা পাওয়া যাবে।

রাত তখন বেশি নয়, বড়জোর আটটা হবে। কিন্তু গলি দিয়ে খানিক দূর হেঁটেই একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম। গলিই হোক, আর যাই হোক, কলকাতার পথ তো বটে। অথচ এই আটটা-রাত সেখানে একটা জনপ্রাণীও নেই।

ভেবেছিলাম, খানিকদূর গিয়ে আবার কাউকে পথের কথা জিজ্ঞেস করব। কিন্তু লোক কোথায়? তা ছাড়া গলিটাও ফুরোতে চায় না।

একবার সন্দেহ হল, হয়তো ভুল-পথে এসেছি। কিন্তু যে লোকটা আমায় খবর দিয়েছে, আমায় ভুল পথ দেখিয়ে তার লাভ কি। নির্জন রাস্তায় চুরি-ডাকাতি? কিন্তু আমার কাছে কি এমন লাখ-পঞ্চাশ টাকা আছে যে, চোরদের ষড়যন্ত্র করতে হবে। আমার সাজপোশাক দেখেও বড়লোক বলে ভুল করবে কোনো সম্ভাবনাও নেই। তবে?

আরো খানিকটা এমনি করে এগিয়ে গেলাম। পথ তেমনি নির্জন। বাতিগুলোও এ-পথের মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলে সেই নির্জনতা যেন আরো বাড়িয়ে তুলেছে। একে গ্যাসপোস্টগুলো অত্যন্ত দূরে দূরে। তার ওপর কী কারণে জানি না, আলো তাদের এত ক্ষীণ যে, রাস্তায় আলো হওয়া দূরের কথা, সেগুলো যে জ্বলছে, এইটুকুও বুঝতে কষ্ট হয়।

খাস কলকাতার ভেতর এমন রাস্তা আছে, কে তা জানত। দু-পাশের বাড়িগুলো যেন মান্ধাতার আমলের তৈরি। কোনোরকমে হাড়বেরনো ইট-কাঠের জীর্ণ দেয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছে। না আছে কোনো বাড়িতে

একটা আলো, না জন-মনিষ্যির একটা শব্দ। সে রাস্তার বাড়িগুলো সারের পর সার পোড়োবাড়ির মতো খাঁ খাঁ করছে।

ক্রমশ মনে হল, কেমন যেন একটা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে আসছে। বহুদিন আলোবাতাস যেখানে ঢোকেনি, মানুষের বাস যেখানে বহুদিন ধরে নেই, এমনি ঘরে ঢুকলে যেমন গন্ধ পাওয়া যায়, গলিটার ভেতর ঠিক সেই রকম একটা গন্ধ পাচ্ছিলাম।

লোকটা বলেছিল, কিছু দুর গেলেই ডাইনে গলি পাওয়া যাবে, কিন্তু জন-মানবহীন জীর্ণ বাড়ির সারের ভেতর ডাইনে কি বাঁয়ে—কোথাও কোনো পথ নেই।

সামনের পথও খানিকদুর গিয়ে দেখলাম বন্ধ। যে-পথে ঢুকেছি, গলিটার ওই একটিমাত্রই তাহলে বেরোবার রাস্তা। আশ্চর্য ব্যাপার! লোকটা মিছিমিছি আমায় ভুল পথ দেখালে কেন?

সেখান থেকে ফিরলাম। গলিটা যেন আরো অন্ধকার মনে হচ্ছিল। এতক্ষণ যে গ্যাসগুলো মিট্‌মিট্ করে জ্বলছিল, তারই কটা একেবারে নিভে গেছে দেখলাম। মনে হল, এ-গলি থেকে বেরোতে পারলে বাঁচি। ভীতু আমি নই কস্মিনকালে, কিন্তু কলকাতা শহরের ভেতর এমন অভাবনীয় ব্যাপার দেখে গাটা কেমন যেন ছম্‌ছম্ করছিল। সবে তো প্রথম রাত। কলকাতা শহরের সমস্ত রাস্তা এখনি লোকজনে, গাড়িঘোড়ায়, মানুষের শব্দে গমগম করছে, অথচ এই পথটা কেমন করে নির্জন-নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

মনে হল, আমি যেন বহুকালের প্রাচীন একটা শহরে এসে পড়েছি। সে শহরের লোকজন বহুকাল আগে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। কত বছর যে মানুষের পা সে শহরে পড়েনি, কেউ তা জানে না। আমি যেন প্রথম সে-শহরের নিস্তব্ধতা ভাঙলাম।

খট্ খট্ খট্—আমার নিজের পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ কোথাও নেই। সে শব্দ অদ্ভুতভাবে নির্জন অন্ধকারে বাড়িগুলোর দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। আমার চোখের ওপরই রাস্তায় কটা বাতি দপ্‌দপ্ করে নিভে গেল। ভ্যাপ্‌সা গন্ধটা ক্রমশ যেন বেড় গিয়ে অসহ্য মনে হচ্ছিল। নাঃ এ-গলি থেকে যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে পারি, ততই মঙ্গল। কাজ নেই আর অবিনাশের খোঁজ করে। পরে একদিন আবার আসলেই হবে।

খানিকদূর গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়লাম। এদিকেও যে গলির পথ বন্ধ, কিন্তু তা কেমন করে হতে পারে? আমি একটা পথে যে গলিতে ঢুকেছি, এ-বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই। এ-গলি দিয়ে এগোবার, সময়ে আশে-পাশে কোনো পথই তো দেখতে পাইনি। তাহলে গলির দুমুখ বন্ধ হয় কেমন করে?

ভাবলাম, হয়তো আরো একটা পথ ছিল। যাওয়ার সময়ে আমার দৃষ্টি কোনোরকমে এড়িয়ে গেছে, এখন আসবার সময় ভুল করে সেইটেতেই হয়তো ঢুকে পড়েছি। সেইটেরই মুখ এখানে বন্ধ। কিন্তু এরকম ভুলই-বা হবে কেমন করে? আমি তো অন্যমনস্ক হয়ে ছিলাম না। আগাগোড়াই তো সজাগ হয়ে চলেছি। রাস্তায় লোক না থাক, একটা বাড়িতেও যদি একটা আলো দেখা যেত, তাহলে না হয় ডেকেই জিজ্ঞেস করতাম।

যাই হোক, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোনো লাভ নেই জেনে আমি আবার ফিরলাম। গলি থেকে বেরোতে আমায় হবেই। আবার সেই নির্জন অন্ধকার গলি দিয়ে শুধু নিজের পায়ের শব্দ শুনতে শুনতে এগিয়ে

চললাম। গলিটা যেন ক্রমশ দীর্ঘই হয়ে চলেছে। আমার অজান্তে কে যেন ইতিমধ্যে সেটা বাড়িয়ে আরো লম্বা করে দিয়েছে।

এবারেও যখন দেখলাম গলির মুখটা বন্ধ, তখন সত্যিই বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠল। একে আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক—ফাঁকা আকাশ, ফাঁকা মাঠের মধ্যে মানুষ হয়েছি,—শহরে এলে অমনিই আমাদের হাঁফ ধরে। তার ওপর এই ভ্যাপসাগন্ধভরা অন্ধকার গলি—চারিদিক থেকে সে যেন জেলখানার মতো আমাকে বন্দী করে ফেলবার ষড়যন্ত্র করেছে। ওপরে চেয়ে যে একটু আকাশ দেখতে পাব, তারও জো নেই। এমন একটা ধোঁয়াটে কুয়াশায় বাতাস আছন্ন হয়ে আছে যে, তার ভেতর দিয়ে একটা তারাও দেখা যায় না।

যতই এই অদ্ভুত ব্যাপারটার কথা ভাবছিলাম, মাথাটা ততই গুলিয়ে আসছিল। কি করব, কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। সুটকেসটা বইয়ের ভারে বেশ ভারীই ছিল। সেটা বয়ে বেশ ক্লান্তই লাগছিল। এমনি করে আর খানিকক্ষণ ঘুরতে হলে ক্লান্তিতেই তো বসে পড়তে হবে।

হঠাৎ বুকটা ধড়াস করে উঠল। দূরে একটা মিটমিটে বাতির তলায় একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে না! তাড়াতাড়ি সেইদিকে এগিয়ে গেলাম—এই তো আমাদের অবিনাশ! এতক্ষণের ভয়-ভাবনা নিমেষে ভুলে গেলাম।

আনন্দে চিৎকার করে তার নাম ধরে ডাকতেই সে চমকে ফিরে তাকাল। বললাম—কি আশ্চর্য! তোর খোঁজ করতেই প্রায় একঘণ্টা এই গলির ভেতর ঘুরে হয়রান হচ্ছি যে। বাব্বাঃ! কি অদ্ভুত গলিতে থাকিস তুই। ঢুকে আর বেরোনো যায় না!

অবিনাশ একটু হেসে বললে,—এসেছিস তাহলে ঠিক?

বললাম,—এসেছি আর কই। তোর দেখা না পেলে এই গলির ভেতর তোর বাড়ি কি খুঁজে বার করতে পারতাম?

সে-কথার কোনো উত্তর না দিয়ে অবিনাশ বললে,—আমায় তাহলে তোর মনে আছে ভাই!

—মনে থাকবে না কেন রে?

—না ভাই, মনে থাকে না। অথচ মানুষ যেটুকু মনে করে রাখে, তার ভেতরেই আমরা বেঁচে থাকি।

আমি হেসে বললাম,—ছিলি তো ভূপর্যটক, আবার দার্শনিক হলি কবে থেকে? যাক, এখন তোর বাড়ি চল দেখি। তোর সব গল্প শুনতে চাই।

অবিনাশ কেমন যেন একটু নিরুৎসাহ হয়ে বললে,—আমার বাড়ি, আচ্ছা চল। আমার চিঠি পেয়েছিলি?

—হ্যাঁ, সে তো তিনমাস আগে।

—তোর জন্যে কতদিন অপেক্ষা করেছিলাম, তারপর আবার বেরিয়ে পড়েছিলাম।

—আবার? তাহলে ফিরলি কবে?

অন্যমনস্কভাবে অবিনাশ বললে,—এই আজ।

—এই আজ? এবারে গেছিলি কোথায়?

—বলছি চল।

সেই নির্জন গলি দিয়েই আমরা এগিয়ে চলেছি, কিন্তু আর তখন আগের কথা কিছুমাত্র মনে ছিল না।

অবিনাশ বলতে লাগল, —এবারে ভাই গেছিলাম বহুদূর। খিদিরপুরের ডকে বেড়াতে বেড়াতে একদিন

সুন্দর একটি জাহাজ দেখলাম। সুন্দর বলতে নতুন মনে করিসনি যেন। জাহাজটা অনেক পুরোনো। নোনা-জল লেগে লেগে তার গায়ের রঙ চটে গেছে। মাস্তলগুলো বহুদিনের পুরোনো। চিমনিগুলো ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে। আগাগোড়া জাহাজটা দেখলেই মনে হয়, বহুকাল ধরে পৃথিবীর কত সমুদ্রে সে যেন পাড়ি দিয়ে ঝুনো হয়ে গেছে। তার চেহারাতেই কেমন যেন একটা ভবঘুরে রুক্ষু ভাব। সেইটেই তার সৌন্দর্য। তার ওপর যখন শুনলাম যে, এখান থেকে মাল নিয়ে যাবে যবদ্বীপে, তখন আর লোভ সামলাতে পারলাম না।

যবদ্বীপ! নারকেল আর তালগাছের সার তার তীর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে সমুদ্রকে অভ্যর্থনা করতে। বাতাসে তার জঙ্গলের মশলাগাছের গন্ধ! তার ওপর গভীর বনের মাঝে তার বোরোবুদুর!

একেবারে মেতে উঠলাম। যেমন করে হোক যেতেই হবে এই জাহাজে। জাহাজের ভাড়া দেওয়ার মতো পয়সা নেই। অনেক কষ্টে জাহাজের হেড খালাসিকে খোঁজ করে, তার সঙ্গে ভাব করে, তাকে কিছু ঘুষ দিয়ে লুকিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করলাম। জাহাজের একধারে বিপদের সময় ব্যবহার করবার জন্যে তেরপল-ঢাকা ছোটো ছোটো বোট টাঙানো থাকে। ঠিক হল, তারই একটার ভেতর আমি থাকব। কেউ তাহলে টের পাবে না। হেডখালাসি কোনো এক সময়ে লুকিয়ে এসে আমায় খাবার দিয়ে যাবে।

গভীর-রাতে জাহাজে চড়ে সেই বোটের ভেতরে গিয়ে হেডখালাসির নির্দেশমতো লুকিয়ে রইলাম। ভোর হওয়ার আগে জাহাজ ছেড়ে দিলে।

তারপর কদিন কি অদ্ভুতভাবেই না কাটিয়েছি। সারাদিন তার ভেতর লুকিয়ে থাকি—তেরপল একটু ফাঁক করে আকাশ দেখি, আর জাহাজের শব্দ শুনি। গভীর রাতে যখন সব নির্জন হয়ে যায়, জাহাজের খোলে কজন ইঞ্জিনিয়ার ও ফায়ারম্যান এবং ওপরে হাল-ঘোরাবার হুইলে একজন নাবিক ছাড়া যখন আর কেউ থাকে না, তখন একবার করে বেরিয়ে নির্জন ডেকের একটি কোণে রেলিং ধরে দাঁড়াই।

এমনি করে কদিন বাদে যাভায় এসে পৌঁছলাম। আগে ঠিক ছিল—সবাই নেমে গেলে কোনো এক সময়ে হেডখালাসি এসে আমার নামবার ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু বন্দরে জাহাজ ভেড়বার আগের রাতে সে এসে আমায় জানিয়ে গেল যে, তা হওয়ার উপায় নেই। এখানে মাল নামানো হয়ে গেলেই জাহাজটাকে সটান ড্রাই-ডকে রঙ করবার জন্যে পাঠানো হবে, ঠিক হয়েছে। সুতরাং সেভাবে নামা যাবে না।

তাহলে উপায়? হেডখালাসি বললে, যে, উপায় আছে। সবাই যখন জাহাজ ভেড়বার সময় যে-যার কাজে ব্যস্ত থাকবে, তখন যদি আমি জাহাজ থেকে জলে পড়ে একটুখানি সাঁতরে যেতে পারি, তাহলেই হয়। তাতেই রাজি হলাম।

জাহাজ, জেটিতে লাগাবার আয়োজন চলছে, এমন সময় সন্তর্পণে আমি বোটের ঢাকনি সরিয়ে নেমে পড়লাম। পুঁটলিটা আমার পিঠেই বাঁধা ছিল। রেলিঙের ধারে গিয়ে জেটির উলটোদিকে ঝাঁপ দিতে আর কতক্ষণ। কেউ দেখতেও পেল না। ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম ঠিক, কিন্তু সেই মুহূর্তে জাহাজটা জেটিতে ভেড়বার জন্যে পাশে সরতে আরম্ভ করল। জাহাজের বিশাল প্যাড্‌লের ঘায়ে জল তোলপাড় হয়ে উঠল। কী ভীষণ তার টান! প্রাণপণেও আমি সে টান ছাড়িয়ে আসতে পারলাম না, সেই ঘূর্ণমান ভয়ঙ্কর প্যাড্‌লের দিকে তলিয়ে গেলাম।

আমি শিউরে উঠে বললাম,—তারপর?

—তারপর সেই প্যাড্‌লের ঘা! কি ভয়ঙ্কর লেগেছে দেখবি?

সামনে একটা গ্যাসের বাতি তখনো জ্বলছিল। অবিনাশ তার জামাটা তুলে দেখালে।

একি! জামার নীচে যে কিছুই নেই—একেবারে ফাঁকা, শূন্য।

ভালো করে আবার চেয়ে দেখলাম—দেহ নেই, কিছু নেই। ওধারের গ্যাসপোস্টটা সে জামার তলা দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। উপরের দিকে চাইলাম। সেখানে অবিনাশের মাথা নেই—শূন্য, শূন্য—সব শূন্য!

অস্ফুট চিৎকার করে সুটকেস-হাতে আমি দৌড়তে শুরু করলাম। কিন্তু কোথায় যাব? যেদিকে যাই, নির্জন গলির মুখ বন্ধ। চিৎকার করে একটা পোড়ো-বাড়ির দরজায় ঘা দিলাম। তার ভেতরের দরজা-জানালাগুলো পর্যন্ত সে আঘাতের প্রতিধ্বনিতে ঝনঝন করে উঠল, কিন্তু কারো সাড়া নেই। অন্ধকার গলি—মনে হল—আমার চারিধারে সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। অসহ্য তার ভ্যাপ্‌সা গন্ধ। তারপরে আমার আর মনে নেই।

জ্ঞান যখন হল, তখন দেখি, কে একজন আমায় বলছে,—উৎরিয়ে বাবু, ইয়ে শিয়ালদা ইস্টিশন হ্যায়।

শেয়ালদা স্টেশন! অবাক হয়ে দেখি—আমি আমার সুটকেস-সমতে একটা রিকশয় বসে আছি। সামনে শেয়ালদা স্টেশন।

নেমে পড়ে তার ভাড়া চুকিয়ে দিলাম। কিন্তু কখন কেমন করে যে আমি রিকশয় উঠেছি, কিছুই মনে করতে পারলাম না।

হ্যাঁ, তারপর খোঁজ নিয়ে জেনেছি, অবিনাশ দুমাস আগে যাভার বন্দরে অমনি করেই মারা গিয়েছিল।

কাচ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় আমি তো একটু দুষ্টু ছিলুম। সবাই বলত, ভীষণ দুষ্টু। একদণ্ড স্থির হয়ে বসতে জানে না। আমার মা বলতেন, "ওইটাকে নিয়েই হয়েছে আমার ভীষণ জ্বালা। সারাদিন আমার এতটুকু শান্তি নেই।"

আমি লক্ষ্মী হওয়ার চেষ্টা যে করতুম না তা নয়। বইপত্র নিয়ে বসতুম। দু-এক পাতা হাতের লেখা করতে-না-করতেই মাথাটা কেমন হয়ে যেত। নীল আকাশে নিলুর ঘুড়ি লাট খাচ্চে, পাশের মাঠে প্রতাপ আর গোপাল ডাংগুলি খেলছে। মাথার আর কী দোষ।

আমরা তখন খুব একটা পুরোনো বাড়িতে থাকতুম। বাড়িটার দুটো মহল ছিল। বারমহল আর অন্দরমহল। অনেক ঘর। চওড়া, টানা-টানা বারান্দা। তিনতলার ছাতটা ছিল বিশাল বড়। ইচ্ছে করলে ফুটবল খেলা যেত। পাশাপাশি দুটো ঘর ছিল। কেউ একটু নির্জনে থাকতে চাইলে থাকতে পারত। একটা ঘরে থাকত আমার দিদির যত খেলনা। বন পুতুল, ছোট পুতুল। দিদির বন্ধুরা বিকেলবেলা এসে খেলা করত। আমি মাঝে মাঝে এসে দুষ্টুমি করতুম। দিদি তখন তার বন্ধুদের বলত, "দ্যাখ, ভাই কী বানর ছেলে!" দিদি আমাকে বানর বললে, আমর খুব ভালো লাগত। আমি দুষ্টুমি করলে দিদিরও খুব ভালো লাগত মনে হয়। মাঝে মাঝে প্রবল লড়াই হত। তখন দিদি বলত, "দেখবি, যখন কোথাও চলে যাব তখন বুঝবি ঠেলা। কে তোকে গরমের ছুটিতে আচার তৈরি করে খাওয়ায় দেখব্।"

রোজ রাত্তিরে বাড়িতে একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হবেই হবে। বাবা অফিস থেকে এসে আমাকে পড়াতে বসাবেন। সারাদিনের লাফালাফিতে ঘুমে আমার চোখ ঢুলে আসবে। জানা জিনিসও ভুল করব। বাবা পরপর যোগ করতে দেবেন। একটাও ঠিক হবে না। 'উইক' বানানটা ভুল হবেই হবে। দুর্বলটা সপ্তাহ হবে, সপ্তাহটা দুর্বল। বাবা মাকে ডেকে বলবেন, "সারাটা দুপুর তুমি করো কী? ছেলেটাকে একটু দেখতে পারো না।"

মা তখন ফিরিস্তি দেবেন, ছেলে এই করেছে, ওই করেছে। বাবা গম্ভীর মুখে উঠে গিয়ে লম্বা বারান্দায় পায়চারি করবেন আর আক্ষেপ করবেন, "নাঃ, হল না, কিছুই হল না। ফেলিওর, ফেলিওর।" রাতে খেতে বসে বলবেন, "কালিয়া, পোলাও খেয়ে কী হবে, ছেলেটাই যার মানুষ হল না!"

এত কাণ্ডতেও আমার কিছু হবে না। ঘুমিয়ে পড়ব। একসময় দিদি এসে আস্তে-আস্তে ডাকবে, "চল খাবি চল। কাল থেকে একটু ভালো করে পড়বি। তোকে বকলে আমার খারাপ লাগে।" কোনো-কোনোদিন দিদি আমাকে খাইয়ে দেয়।

এইভাবে চলতে চলতে গরমের ছুটি পড়ে গেল। একদিন দুপুরবেলা সবাই ঘুমোচ্ছে। আমিও মায়ের পাশে শুয়েছিলুম। দিদি কয়েকদিনের জন্য মামার বাড়ি গেছে। শুয়ে থাকতে থাকতে উঠে পড়লুম, ঘুমিয়ে

সময় নষ্ট করা উচিত নয়। মা যে-ঘরে তার পাশের ঘরে একটা টেনিস বল নিয়ে কেরামতি করছি। এখন থেকে প্র্যাকটিস না করলে, বড় হয়ে পেলের মতো খেলোয়াড় হব কী করে! বাবাই তো বলেছেন, "সাধনাতেই সিদ্ধি!"

প্রথমে সাবধানেই সবকিছু করছিলুম, হঠাৎ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে মারলুম এক শট। বাবার বইয়ের আলমারিতে সব কাচ ভেঙে চুরমার। পাশের ঘর থেকে মা দৌড়ে এলেন। ধড়াধ্বাম মারাটাই আমাকে উচিত ছিল; কিন্তু বাবা বলেছেন, "একদম গায়ে হাত তুলবে না। ভয় ভেঙে যাবে। অন্য শাস্তি দেবে।"

মা আমাকে টানতে টানতে ছাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে দিলেন, "থাকো এইখানে বাবা এলে তোমার বিচার হবে। বড্ড বেড়েছ তুমি। নির্জলা উপবাস।"

চারপাশে খাঁ-খাঁ করছে রোদ। দুপুরের নীল আকাশে গোটাকতক চিল উড়ছে। জানলার ধারে বসে আছি মনখারাপ করে। বাবাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি। আলমারির সব কাচ চুর হয়ে গেল। খুব অন্যায় হল। কবে যে আমি মানুষ হব! এই সব ভাবছি। ভীষণ গরম। একটুও হাওয়া নেই। গাছের একটা পাতাও নড়ছে না। শেষকালে মনে হয় ঘুমিয়েই পড়েছিলুম।

গায়ে কেউ হাত রাখল। ধড়মড় করে উঠে বসলুম। সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন বাবা।

আকাশে তখনো শেষবেলার রোদ। ভয়ে কুঁকড়ে গেলুম। বাবার মুখের দিকে তাকালুম, হাসছেন। স্বপ্ন দেখছি না তো। দরজার দিকে তাকালুম। হাটখোলা। তখন আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "বাবা! আজ আপনি এত তাড়াতাড়ি এলেন?"

কোনো উত্তর নেই। বাবা হাসছেন। কেবল হাসছেন।

আমি বললুম, "বাবা, আমি সব কাচ ভেঙে ফেলেছি। আমি খুব অন্যায় করেছি বাবা।" বাবা তবু হাসছেন। মুখে এতটুকু রাগ নেই। আমি তখন প্রণাম করার জন্য বাবার পা স্পর্শ করতে গেলুম, দেখি কেউ কোথাও নেই। ঘর ফাঁকা। দরজাটা হাটখোলা। খুব জোর হাওয়া ছেড়ে গ্রীষ্মের বিকেলের।

আমি ভয়ে কেমন যেন হয়ে গেলুম। স্বপ্ন দেখেছি। নিশ্চয় স্বপ্ন। সাহস একটু ফিরে পেতেই একছুটে নীচে। দেখি মা রান্নাঘরে ঘুগনি তৈরি করছেন। আমাকে দেখে অবাক, "কী করে এলি?কে তোকে দরজা খুলে দিল?"

বাবা ঘুগনি খেতে ভালোবাসেন, মা সেইজন্যই করছেন। কাচ ভাঙা নিয়ে ভীষণ কাণ্ডটা হয়ে যাওয়ার পরেই ঘুগনি এসে অবস্থাটাকে সামাল দেবে।

মাকে আমি সব কথা বললুম।

"তোর বাবা এসেছে? কোথায়?"

"দরজা তো বাবাই খুলে দিলেন!"

"সদরের দরজা আমি খুলে না দিলে আসবে কী করে?"

গোটা বাড়িটা সার্চ করা হল। বাবার পড়ার ঘর, শোওয়ার ঘর, ঠাকুরঘর, বাথরুম। আলনাটা দেখা হল। সেখানে বাবার অফিসের জামাকাপড় ছাড়া নেই। বাড়িতে ফিরে যা পরবেন সেইগুলোই গুছনো রয়েছে।

আমরা তখন পাশের বাড়িতে গিয়ে বাবার অফিসে ফোন করলুম। অফিসের বড়কর্তার সঙ্গে মা কথা

বললেন। জানা গেল, বাবা অনেক আগেই সাইটে গেছেন। সাইট মানে উলুবেড়িয়ায়। সেখানে কোম্পানির নতুন ফ্যাক্টরি তৈরি হচ্ছে।

মা খুব অনুরোধ করলেন, "আপনি নিজে একটু খবর নিন। মনে হচ্ছে, একটা কিছু হয়েছে।" ফোন নম্বরটা তাঁকে দেওয়া হল। টেলিফোনটাকে ঘিরে আমরা বসে আছি। বসেই আছি। ওদিকে মায়ের ঘুগনি পুড়ে ছাই। এক ঘন্টা পরে ফোন বাজল।

কনস্টাকশন সাইটে একটা লোহার রিম ক্রেন ছিঁড়ে বাবার মাথা পড়ে গেছে। তখন বেলা ঠিক সাড়ে চারটে। আমি এমন বোকা ছিলুম, সেই খবরটা পেয়েই আমি নাকি মাকে বলেছিলুম "জানো, আমি কাচ ভেঙেছি বলে একটুও রাগ করেননি। শুধু হাসছিলেন।"

তখন আমার বয়েস ছিল আট। আজ আশি। আমি আর কোনোদিন কিছু ভাঙিনি। না কাচ, না সম্পর্ক, না পরিবার, না জীবন। বাবার সেই হাসি-হাসি মুখের হাসি যাতে কখনো না মিলিয়ে যায়, সেই চেষ্টা আমি করেছি।

টটনের কুকুর

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

টটনের বাবা খুব গরিব। কিছু জমিজমা, পুকুর ছাড়া টটনের বাবা মনোমোহন বলতে গেলে ফকির। টটনের ভাইবোন মেলা। মা-ঠাকুমা তো আছেনই। জমিজমায় চলে না। প্রথম কোপটা পড়ল টটনের ওপর। ওর লেখাপড়া বন্ধ। জমির কাজে লেগে গেলে সংসারে দু-পয়সা আসে। গোরু-বাছুর সামলালে মনোমোহনের কাজ হালকা।

টটনের বাবা গরিব বলে, তাকে সবাই 'ফকিরের ব্যাটা' বলে। গাঁয়ে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে গেলেও ফকিরের ব্যাটা। অবশ্য টটনের দোষও আছে। সে বোঝে তার কোনো কিছুতেই বায়না করা সাজে না। তবু এই ব্যামোটা তার আছে। কেউ ভালোমন্দ খেলে তারও খেতে ইচ্ছে হয়। সে হাত পাতে। টটনকে দেখলেই তারা খাবার লুকিয়ে ফেলে।

টটন টের পায়।

এই যেমন নব, ওর বাবার চায়ের দোকান। দোকানে নবও মাঝে মাঝে বসে। বসলেই লজেন্স-বিস্কুট সরায়। পালিয়ে খেতে দেখলেই টটন ছুটে যাবে, 'কী খাচ্ছিস রে?' তাড়াতাড়ি পকেটে যাই থাকুক, লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করে নব।

কিন্তু টটন ছাড়বার পাত্র নয়।

তখন নব বলবে, 'আন, এক বালতি জল।'

সে জল নিয়ে আসে এক বালতি।

তারপর বলবে, 'কাপ-প্লেটগুলো ধুয়ে রাখ।'

টটন খুশি মনেই কাপ-প্লেট ধুয়ে দিলে হয়তো দুটো লজেন্স দিয়ে বলবে, 'ভাগ ফকিরের ব্যাটা!'

এতে সে কিছু মনে করে না। তার বাবা ফকির, গরিব আর ফকিরে তফাতই বা কী? তা ফকিরের ব্যাটা বললে সে খুশিই হয়। খুশিতে সে আরো দু-একটা ফাউ কাজ করে ফেলে।

পাড়াপ্রতিবেশীরাও টটনকে ফাউ কাজ করিয়ে নেওয়ার তালে থাকে।

'গাছ থেকে আম পাড়।'

সে আম পেড়ে দেয়।

একটা আম হাতে দিলেই খুশি।

'সাইকেলটা সাফ কর। কাদা মুছে ফেল।'

টটন সাইকেল ন্যাকড়া দিয়ে ঝকঝকে করে ফেললে—দশটা পয়সা। হাত পেতে নেবে আর দেখবে। কোথায় যে রাখবে। জামা নেই গায়ে। প্যান্টের পকেট ছেঁড়া। যা রাখে সবই পড়ে যায়। সেই টটন একদিন

জমিতে বাপকে ভাত দিয়ে ফেরার সময় এক কাণ্ড। কোথা থেকে একটা কুকুরের বাচ্চা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বাবুর অনুসরণ করছে।

সে রেগে যায়। সে গাল দেয়, 'ফকিরের ব্যাটা আমার লগ ধরলি! যা। আমার পকেটে কিছু নেই।'

টটনের ধারণা, কুকুরের বাচ্চাটা সেয়ানা। খাবারের লোভে তার লগ ধরেছে। পকেটে যে কিছু নেই, তাও নয়। লেড়ো বিস্কুটটি সে পেয়েচে পীতাম্বরের দোকান থেকে। একটা বিস্কুট দিয়ে তাকে মেলা ফাউ কাজ করিয়ে নিয়েছে। এতে সেও খুশি, পীতাম্বরও খুশি। তার সেলাইকলের দোকান। ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে খাবার জল কল থেকে তুলে দিয়ে এসেছে।

বাচ্চা কুকুরটা ঠিক টের পেয়েছে। সে যেমন টের পায় তাকে লুকিয়ে কে কখন কী খায়। সে তো মাত্র একবার লেড়ো বিস্কুটের খানিকটা ভেঙে মুখে দিয়েচে, তারই ভেতর নজর পড়ে গেল। ভাইবোনেরা পর্যন্ত টের পায় না। পেলেই ছেঁকে ধরে। আর তুই কোথাকার ফরিরের ব্যাটা টের পেয়ে গেলি। ধাঁই করে একটা লাথি কষাল। কুকুরটা ফুটবলের মতো কিছুটা উড়ে গিয়ে পড়ে গেল। কুঁই-কুঁই করছে। সঙ্গে-সঙ্গে টটনের মনে হল, পা-টা কে যেন খামচে ধরেছে। পাটা সরিয়ে নিল। টটন বেশ ঘাবড়ে গেছে।

সে হাঁটা দিল। জামবাগানের ভেতর থেকে দেখল, কুকুরটার লজ্জা নেই। আবার পায়ে পায়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে হাঁটছে। তার পিছু নিয়েছে। আর পারা যায়। বলল, 'নে। খবরদার আর পা বাড়াবি না।' নুয়ে সে পা দেখল। পায়ে দুটো দাঁত ফোটাবার দাগ। কিসের দাগ, বুঝল না। কে শোনে কার কথা। কুকুরটা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে তার পিছু পিছু আসছে। যত দেয়, তত কুকুরটা ল্যাংচায়। আর কুঁই কুঁই করে। টটনের মহা মুশকিল। বাড়ি গিয়ে উঠলে মায়ের তেজ, 'নিজের খেতে ঠাঁই নেই শঙ্করাকে ডাকে!'

মায়ের দোষ নেই। বাবা না আনতে পারলে দেবেন কোত্থেকে। তবে একবার বোঝাতে পারলে, তার মায়ের মতো মা হয় না। যদি বুঝে যান—তখন মা নিজেই ডেকে খোঁজ করবেন। 'আরে নিজে খেলি, কুকরটাকে দিলি না। ভগবানের দান, যাবে কোথায়!'

তা কুকুরটাকে দেখে মাও কেমন খুশি। বাবা জমি থেকে ফিরে বললেন, 'কুকুরটার ঠ্যাং ভাঙল কে? ল্যাংচাচ্ছে। তোমার ছেলের কাজ নয় তো!'

টটন রাস্তায় দাঁড়িয়ে সব শুনতেই দৌড়ে গেল। বাবার মেজাজও কুকুরটিকে দেখে অপ্রসন্ন নয়। বাবা-মা খুশি থাকলে সেও খোশমেজাজে থাকে। সে বলল, 'কী পাজি এটা, মাঠ থেকে লগ ধরেছে। কিছুতেই যাবে না। আমার সঙ্গে বাড়ি উঠে এল। লাথি মারলাম। তাও না।' অবশ্য লাথি মারার সময় কে যেন খামচে দিয়েছিল। সে-কথা বলল না।

খামচে দিয়েছিল, না কামড়ে দিয়েছিল— সে তা ঠিক মনে করতে পারছে না। তবে গোড়ালির জায়গাটা লালায় ভেজা মনে হয়েছিল। দাঁতের কামড়ও। তবে শুধু দাগ। কামড় জোরে বসায়নি রক্ষে।

কে যে কামড়াল। কুকুরের কামড়ের মতো। অবশ্য এ নিয়ে ভাবে না। কোথাও ছিল, ঝোপজঙ্গলে পালিয়ে গেছে। তবে বাচ্চা কুকুরটা নয়। কারণ ওটা তো ধানের জমিতে ছিটকে পড়েছে। বললে, তরাস লেগে যাবে। মা বলবেন, আরে বলছিস কী। কই দেখি আয় তো।' চেঁচামেচি শুরু করে দেবেন।

ছোটভাই মটর বলল, 'দাদা কী সুন্দর না দেখতে।' কুকুরটার নামও সে দিয়ে দিল। টুটু।

মটরের মাথা সাফ। বাবা তার স্কুলের পড়া গজব করেননি। টটন এজন্য রাগ পুষে রাখেনি। তার যখন হবে না, আর তার তো বই দেখলেই রাগ ধরে যায়—এত খোলামেলা বাড়ি, গাছপালা, গোরু—বাছুর, জমিতে ফুলকপি-বাঁধাকপির চাষ, এক হাতে বাবা সামলাতেও পারেন না। সে বাবার কাজে লেগে গিয়ে ভালোই করেছে। সংসারের সাশ্রয়। তার নাম টটন, কুকুরের বাচ্চাটার নাম টুটু। টটনের কুকুর টুটু।

বাচ্চাটাকে বাংলা সাবান দিয়ে স্নান করাবার সময় দেখল একটা পায়ে বেশ বড় ক্ষত। মাকে দেখাল। মা চুন-হলুদ গরম করে লাগিয়ে দিতেই কুকুরটির আরাম বোধ হচ্ছে টের পেল টটন।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনোমোহন দেখতে পেলেন, একজন কাপালিক গোছের লোক, গাছের নীচে বসে আছেন।

মনোমোহন উঠোনে দাঁড়িয়ে সবে সূর্যপ্রণাম করছেন।

'আমার কুকুরটা?

কুকুরের কথা শুনে সবাই উঠোন পার হয়ে গাছতলায়।

মটর বলল, 'এখানে কোনো কুকুর নেই।'

'আছে। একটা বাচ্চা কুকুর। কালো রং। এক পা খোঁড়া।'

'আরে টুটুর কথা বলছেন।' সে দৌড়ে ঘরে ঢুকে বলল, 'দাদা টুটুকে নিতে এসেছে।'

'কে? টুটুকে কে আবার নিতে এল!

'আয় না।'

টটন বের হয়ে বলল, 'এটা আপনার কুকর?'

টুটু কিছুতেই কোল থেকে নামবে না। মা চেঁচাচ্ছেন, 'দিয়ে দে বাবা? কার মনে কী আছে কে জানে!'

মা ঠাকুর দেবতাকে ভয় পান, সাধুসন্তের ভয়ে কাবু থাকেন। টটন জানে। যার কুকুর তাকে দেওয়াই ভালো। কিনা আবার অনাসৃষ্টি শুরু হবে। সে কুকুরটাকে নামিয়ে দিলেই কুঁই-কুঁই করতে লাগল। যাবে না। কাপলিকগোছের লোকটি যেই না টুটুকে খপ করে ধরতে গেলেন, কী হল কে জানে, 'ওরে বাবা এ তো আগুন রে বাবা।' লোকটা ধপাস করে পড়ে গেলেন, না কিছু দেখে ঘাবড়ে গেলেন, বুঝল না। লোকটা চিমটে, ত্রিশূল, থলে নিয়ে দৌড়তে লাগলেন। যেন কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছিল তাঁকে।

সবাই তাজ্জব।

বাবা বললেন, 'কী হল, পড়িমরি করে ছুটে পালাল কেন? যেন কেউ ঠেলে দিল লোকটাকে। কোনোরকমে প্রাঙ্গণে বেঁচে গেছে।'

টটন বলল না তারও এমন হয়েছে। পায়ে কিসে কামড়ে দিয়েছিল। তবে দাঁত ফোটায়নি। তাই রক্ষে।

টটন বলল, 'লোকটা মিছে কথা বলেছে বাবা। কুকুরটাকে আমি তো নীলপুকুরের পাড়ে পেয়েছি।'

সে যাই হোক, কুকুর নিয়ে আর কেউ পরে কথা চালাচালি করেনি। জবরদস্ত কাপালিক কোন সুবাদে বাড়িতে হাজির,কী করেই বা জানলেন,টুটু মনোমোহনের বাড়ি গিয়ে উঠেছে তাও তারা বুঝল না। তবে কুকুরটার মধ্যে কিছু একটা আছে। মা তো একেবারে চুপ। বাবা বললেন, 'দ্যাখ, যেন পালিয়ে না যায়। কী আবার বিপদে পড়ব বুঝতে পারছি না।'

টুটুকে নিয়ে শীতকালটা মজারই ছিল। ভালো খেতে পেয়ে নাদুসনুদুস গড়িয়ে-গড়িয়ে হাঁটে। সর্বক্ষণ টটনের সঙ্গে। সে জমিতে গেলে টুটু জমিতে, সে ঝোপজঙ্গলে ঘুরে বেড়ালে, সঙ্গে টুটু। সে যা পায় সবই দুজনে ভাগ করে খায়।

একদিন এক ছাগলের ব্যাপারী বাড়ি হাজির। সেও বলল, তার কুকুর হারিয়েছে। এই বাড়িতে আছে।

বাবা রেগে গিয়ে বললেন, 'কুকুর হারালেই আমার বাড়ি। এ তো আচ্ছা ঝামেলা।' সোজা জবাব, 'না, এখানে কুকুরটুকুর নেই।'

'আছে। আপনি জানেন না। মিছে কথা বলছেন।'

'আরে, মিছে কথা বলব কেন! বলছি কারো কুকুর আমার বাড়ি আসেনি। আমাদের কুকুর ছাড়া অন্য কোনো কুকুর আমাদের বাড়িতে নেই।'

'ওটাই আমার। দেখান।' বলে পাঁচনখানা বগল থেকে নিয়ে হাতের ওপর ঘোরাতে থাকল।

টটন কোথা থেকে এসে শুনেই খাপ্পা। সে টুকুকে বগলে তুলে গাছতলায় দৌড়। ব্যাপারীকে বলল, 'এটা?'

'হ্যাঁ, এটা। এটাই আমার কুকুরে বাচ্চা!'

আর যায় কোথায়। পাঁচনটাচন ফেলে লোকটা চিত হয়ে পড়ে গেল। আর্ত ডাক, 'বাঁচান কর্তা। আমারে খেয়ে ফেলল।' যেন লোকটাকে কেউ আক্রমণ করছে। পা ছুঁড়ছে, হাত ছুঁড়ছে গড়াগড়ি খাচ্ছে। এক হাতে কাপড় সামলাচ্ছে, অন্য হাতে পাঁচন দিয়ে আক্রমণ যেন সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে।

টটন, তার বাবা, মা, এমনকী, দু-একজন প্রতিবেশিও হাজির। আর দেখল, লোকটা প্রাণভয়ে দৌড়চ্ছে। বলছে, 'ওরে বাবা রে, আমাকে কামড়ে দিল রে!'

টটন, বাবা, প্রতিবেশিরা অবাক। লোকটার পা থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে।

মনোমোহনের মাথা ঘুরছে।

কুকুরের বাচ্চাটার দিকে মনোমোহন তাকালেন। ওটা তো টটনের কোলেই আছে। কেমন ত্রাসে পড়ে গেল। বাচ্চাটাকে রাখা উচিত-অনুচিতের কথাও ভাবছে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলার সাহস নেই।

মনোমোহন ছেলেকে প্রশ্ন না করে পারলেন না, 'নীলপুকুরের কাছে কোথায় পেলি?'

'জমিতে। ওই সেখানে করদের জমিতে। পাশটায় হোগলা বন আছে, বন থেকে বের হয়ে এল।'

মনোমোহন জানেন, নীলপুকুরে বেলগাছটা ভালো না। দোষ পেয়েছে। ওঁর ধারণা ছিল, যদি বেলগাছটার নীচে কুকুরের বাচ্চাটাকে পায়, তবে গাছের দোষ কুকুরেও বর্তাতে পারে। রাতেবিরেতে কেউ বড় গাছটার নীচ দিয়ে আসে না। গাছটায় নীরদা গলায় ফাঁস দিয়েছিল। কিন্তু জমিতে পাওয়া গেলে গাছের দোষ দেওয়া যায় না। খুব বেশি বলাও মুশকিল। কে আবার অদৃশ্যলোক থেকে তাকেই না আক্রমণ করবে। কিংবা কামড়াবে। ব্যাপারী তো ছুটেই পালাল, সবাই দেখেছে গোড়ালি থেকে, হাঁটুর নীচ থেকে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। কুকুরে কামড়ালেই এমনটা হওয়ার কথা।

কিন্তু বাচ্চাটা তো টটনের কোলেই ছিল। কামড়াব কি করে। বাচ্চা কুকুর কামড়াতেও জানে না। লোকটার বা দোষ কী। তার কুকুর যদি হয় সে বলতেই পারে, কুকুরটা আমার। আমার বাচ্চা কুকুরটাকে টটন চুরি করে এনেছে। টটন আনতেও পারে। মারের ভয়ে সে কখনোই সত্যি কথা বলে না। কিন্তু নিজে চোখের ওপর দেখার পর টটনের গায়ে হাত তোলা তো দূরে থাক, তোষামোদের বাড়াবাড়ি শুরু হয়ে গেল।

টটনের দিতে তাকিয়ে মনোমোহন বললেন, 'সত্যি বলছিস, জমিতে পেয়েছিস!'

'বা রে, মিছে কথা বলি কখনো!'

'না, তুই মিছে কথা আর কবে বললি।' ধর্মপুত্তুর, মুখে এসে গিয়েছিল, তবে বললেন না। কার কিসে কোন আপদ সৃষ্টি হবে, তা তিনি নিজেও জানেন না। খুবই বিনয়ের গলায় বললেন, 'বলছিলাম, যার কুকুর তাকে দিয়ে দেওয়াই ভালো।'

মাও বললেন, 'আমি বলছিলাম, পর-পর যা হচ্ছে, তাতে কিন্তু কুকুরটাকে সুবিধে মনে হচ্ছে না।'

টটনের এক কথা, 'কুকুরটা কি তোমাদের কামড়ায়, না রাতে ঘেউ-ঘেউ করে? তোমাদের ঘুমের কী ব্যাঘাত , বলো!'

'না, তা অবশ্য করে না। তোর বুকের কাছে শুয়ে থাকতে পারলেই নিশ্চিন্ত। চোর ছ্যাঁচোড়ের ভাবনা তার নেই। ডাকাডাকির বিষয়টা কুকুরটা জানেই না। কখনো তো দেখলাম না ঘেউ করতে। কেবল লেজ নেড়ে এটা-ওটা শুঁকে বেড়ায়। খাবার পেলে লাফায়। তোকে দেখলেই লাফিয়ে কোলে উঠতে চায়।'

'তবে!' টটনের এক কথা। 'যার কুকুর তাকে দিয়ে দিতে বলছ কেন? আমি জানিই না কার কুকুর! আর কে নেবে? যে আসে সেই তো পালায়। বলো, দেবটা কাকে?'

এর পর আর কী বলা যায়, মনোমোহন ভেবে পেলেন না। এবারে শীতের ফসল খুবই ভালো হয়েছে। মা লক্ষ্মী তাঁকে ঢেলে দিয়েছেন। এক কেজি, দেড় কেজি মুলোর ওজন। বাজারে দরও ভালো যাচ্ছে। মনোমোহন এত পয়সার মুখ কোনো শীতের মরশুমে দেখেননি। কুকরটা আসায় তাঁর যেন ধনে-জনে লক্ষ্মীলাভ।

মানুষের হাতে পয়সা এলে যা হয়, খাওয়াপরার লোভ বাড়ে। মনোমোহনও সেই লোভে শহর রওনা হবেন। ছেলেমেয়েদের জামা-প্যান্ট, পরিবারের একখানা ভালো শাড়ি, নিজের দুটো লুঙ্গি, গেঞ্জি, একটা শার্ট কেনার জন্য শহরে যাবেন। বাবা শহরে গেলে ভালো মিষ্টিও নিয়ে আসেন। টটন-মটর দুজনেই বাবাকে বাস রাস্তায় এগিয়ে দিতে গেল। মোড়ের বটগাছটার নীচে বাস লোকজন তুলে নেয়। বাবাকে তুলে দিয়ে ফিরে আসবে।

অবাক কুকুরটা কিন্তু সেই থেকে কুঁই কুঁই করছে কোলে। কেন করছে বুঝছে না। টটনের বুকে লেপটে থাকতে চাইছে না। টটন ছেড়ে দিল। ছেড়ে দিলেই বাড়িমুখো ছুটতে চাইছে। এত দূর থেকে পথ চিনে না-ও যেতে পারে। বাচ্চা কুকুর ছেড়ে দিতেও ভয়। কোথায় কোনো কাপালিক, কিংবা ব্যাপারী ওত পেতে থাকবেন কে জানে। কুকুরটাকে জোরজার করেই যেন নিয়ে যাচ্ছে টটন,মটর।

আর বাসে ওঠার সময়ই মনে হল মনোমোহনের তাঁর কোঁচা ধরে কে টানছে। তিনি পা ঝাড়া দিলেন। বললেন, 'কে রে? কেউ তো নেই।' কাছেই টটন-মটর দাঁড়িয়ে আছে। বাচ্চাটাও টটনের কোলে। কেবল কুঁই-কুঁই করছে। ছটফট করছে।

আবার পা ঝটকা দিলেন। তাঁর কাপড় ধরে কেউ টানছে। মনে হল কোঁচা ধরে টানছে। ভারি তাজ্জব ব্যাপার তো। তিনি নেমে পড়লেন। মনে সন্দেহ। বাস কন্ডাক্টর বললেন, আরে উঠবেন তো উঠুন।' কিন্তু উঠতে গেলেই কোঁচা ধরে কে যেন টানছে। যেন এবার কিছুতে না কামড়ে ধরল। মনোমোহন নেমে গেলেন বাস থেকে। চারপাশে তাকালেন। কেউ নেই। কে তবে পায়ে এত জড়াজড়ি করছে।

বাসটা ছেড়ে দিল।

বিকেলে খবর পেল, বাসটা দুর্ঘটনায় পড়েছে। বাসসুদ্ধ লোক নয়ানজুলিতে। সকালেই খবরের কাগজে পড়লেন বাস দুর্ঘটনায় পঁয়ত্রিশজনের মৃত্যু। ভাগ্যিস মনোমোহন বাসে যাননি। তিনি কুকুরটার দিতে তাকিয়ে রইলেন। মাকে ফিসফিস করে বাবা কী বললেন, টটন বুঝল না।

দুদিনও পার হয়নি। টটন জমিতে বাবার ভাত দিতে গেছে। সঙ্গে কুকুরের বাচ্চাটা।

ফেরার সময় ঝোপজঙ্গলে ঢুকে যাওয়া তার স্বভাব। এদিকটা খুবই সুনসান। বড়-বড় সব গাছ আর জঙ্গলে ভর্তি। শিশুগাছই বেশি। রাজরাজড়ার পতিত জায়গা। জঙ্গল শুধু বাড়ছেই। তবে শীত শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে, ঝোপজঙগেলর পাতাও ঝরে গেছে। গরিব মানুষেরা কাঠকুটোর জোগাড়ে জঙ্গলে এবারে ঢুকে যাবে। সেও কতবার মরা ডাল, শুকনো ডালপাতা মাথায় করে বাড়ি নিয়ে গেছে। জঙ্গলটা ঘুরে দেখার একটা মোহ আছে। সেই মোহে পড়ে এমন একটা তাজ্জব কাণ্ড দেখবে সে আশাই করেনি। দুজন ষণ্ডামার্কা লোক কী নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করছে। মারামারি করছে। একজন অন্যজনকে ছোরা দেখিয়ে ব্যাগ কেড়ে নিতে চাইছে। ধুন্ধুমার কাণ্ড। জঙ্গলের মধ্যে অকারণ ব্যাগ নিয়ে মারামারি তার পছন্দ না। আর দেখল, তখনই লম্বামতো লোকটা বেঁটেমতো লোকটাকে মাটিতে ফেলে গলা টিপে ধরেছে। ব্যাগটা পড়ে আছে একপাশে।

সে বুঝল, তাকে দেখতে পেলে রক্ষে নেই। সে দৌড়ে পালাল। কুকুরের বাচ্চাটাও তার পিছু ধরেছে। সড়কে উঠে বেমালুম তাজ্জব বনে গেছে। কাউকে কিছু বলারও সাহস নেই, বাড়িতে নালিশ হবে এবং বাবা ধরে পেটাবেন। আবার জঙ্গলে ঘোরাঘুরি। বলেছি না, জায়গাটা ভালো না।'

সে বাড়ি এসেও চুপ। সে জঙ্গলে ঢুকলেই মা খাপ্পা হয়ে যান।

কিন্তু পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনোমোহনের মাথায় হাত। বারান্দায় ব্যাগ। কার ব্যাগ, কী আছে, চেঁচাতেও পারছেন না। কার মুণ্ডু কেটে ব্যাগে ভরে রেখে গেছে তাও জানেন না। যা দিনকাল, খুনখারাপি জলভাত। কোনোরকমে ব্যাগের মুখ খুলে উঁকি দিতেই মাথার ঘিলু হজম। তাঁর চোখ ছানাবড়া। জড়োয়া গয়নায় ভর্তি ব্যাগ। দামি পাথরটাথরও আছে।

মনোমোহন মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। তারপর কিছুটা মন শান্ত হলে ডাকলেন, 'ওগো শুনছ! ওঠো। আমার যে এবার সব যাবে। দ্যাখো কী কাণ্ড! কী করি এখন!'

মা দেখলেন। টটনও দেখল। কারও মুখে রা নেই।

মা বললেন, 'যার ব্যাগ সে ঠিক নিতে আসবে। রেখে দাও। যার জিনিস তাকে ফেরত দেওয়াই ভালো। গরিবের কপালে সুখ সয় না।'

বাবা বললেন, 'সেই ভালো।'

টটনও বলল, 'সেই ভালো।'

কিন্তু আতঙ্কে, আবার ব্যাগ নিতে এসে যদি পালায়। তখন তিনি যাবেন কোথায়! থানাপুলিশকে যমের মতো ভয় পান মনোমোহন। আর সেই রাতেই, রাত তখন অনেক, দুজন লোক বাড়িতে হাজির। টর্চ জ্বেলে বলল, 'মনোমোহন!'

মনোমোহন দরজা খুলে বাইরে বের হলেন না। চুপি দিয়ে বললেন, 'আপনাদের কিছু হারিয়েছে?'

'হারিয়েছে মানে! তোমার পুত্র ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। দাও। কিছু খোয়া গেলে পরিবারে কেউ বেঁচে থাকবে না! খবর ফাঁস হলেও খুন।'

মনোমোহন বললেন, 'আজ্ঞে না। আমরা কিছু ধরিনি।' বলে ব্যাগটা তুলে হাতে দিতে গেলেই, 'ওরে বাবা রে' বলে দৌড়।

কোথায় গেল! মনোমোহন, টটন, মটর হ্যারিকেন নিয়ে লোক দুজনকে খুঁজছে। যত তাড়াতাড়ি ব্যাগটিকে ধরিয়ে দেওয়া যায়। না, কোথাও পাওয়া গেল না। এখন এই ব্যাগ নিয়ে উপায়! কার কাছ যাবে। কাউকে বললেই দশ কান—নানা ঝামেলা। চুরির দায়ে জেল! কী দরকার, যার থলি তাকেই ফেরত দেওয়া ভালো। কিন্তু লোক দুজন বেপাত্তা। তিনি ডাকলেন, 'কোথায় গেলেন দাদারা?' অগত্যা ফিরে আসতে হল। রাতে কারও ভালো ঘুম হল না।

সকালে শোনা গেল, সড়কের ধারে দুজন লোক মরে পড়ে আছে। গলার নলিতে কোনো জন্তুর কামড়।

বিপাকে পড়ে কুকুরের মালিকের খোঁজে বের হয়ে গেলেন মনোমোহন। কুকুরটা আসার পর থেকে বাড়িতে নানা উপদ্রব। পীতাম্বরই খবর দিলেন, 'আরে, এই বাচ্চাটা! এটার মা-টা তো লরি চাপা পড়ে মরেছে। রাস্তার কুকুর। বাচ্চাটাকে নিয়ে এধার-ওধার ঘুরত। বাচ্চাটাই চাপা পড়ত, তবে মা-র পরান বোঝোই! নিজে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাচ্চাটাকে বাঁচিয়েছে। কেন, কী হয়েছে?'

'না, কিছু না!' তারপর মনোমোহন বললেন, 'আচ্ছা, ওর জন্য পিণ্ডদান করলে কেমন হয়!'

'কার? কুকুরের!'

পীতাম্বর শুনে অবাক। বললেন, 'কুকুরের আবার পিণ্ডদান কী? তোর কি মাথাখারাপ?'

তার পরদিন মনোমোহন আরও তাজ্জব। কুকুরের বাচ্চাটা বাড়িতে নেই। কোথাও নেই, টটন সারাদিন ডেকে বেড়ায়, 'টুটু, তুই না বলে-কয়ে চলে গেলি! কোথায় গেলি?'

কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। সাড়া আর পায়ওনি।

স্বপ্নের মতো

নবনীতা দেবসেন

গাড়ি থেকে নেমেই মনটা ভালো হয়ে গেল। এত চমৎকার একটা বাসস্থান আমি কল্পনাও করিনি। যখন থেকে গাড়ি এই সবুজের ঢেউখেলানো পাহাড়ে চড়ছে তখন থেকেই মনে একটা খুশি ছড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে বাড়িতে এসে গাড়ি থামল সেটার মতো অপূর্ব আর কোনো বাংলা এতটা পথে আমার চোখে পড়েনি। দক্ষিণে থাকে থাকে নেমে গেছে নানা রকমের ফুল আর বাহারী পাতার গাছে সাজানো বাগান। পশ্চিমে বড় বড় গাছের মধ্য দিয়ে প্রবেশ পথ এসে বাড়িবারান্দায় শেষ। এই সব চা-বাগান অঞ্চলে যেমন হয়, কাঠের তৈরী খাস বিলিতি সায়েবি বাংলো।

দুটি তলায় বিশাল বিশাল দুটি চওড়া বারান্দা বাংলোর তিনদিক ঘিরে আরো পিছন দিকে খানিক দূরত্বে গ্যারাজ ও তার মাথায় সার্ভেন্টস কোয়ার্টার। সামনের বাগান ধাপে ধাপে নেমে হঠাৎ এক জায়গায় শেষ হয়েছে। সেখানে খাড়াই পাহাড় নেমে গেছে, উপত্যকার দিকে।

'কী ডক্টর দেবসেন, বাংলো পছন্দ?'

'অপূর্ব!' দূরে পুতুলের ঘরবাড়ির মতো অসমীয়া গ্রাম, খেলনার রেলগাড়ি চলে গেল। ভূগোলের মডেলের মতো টোকো গাছের ফাঁক দিয়ে। আমি নড়তে পারছি না।

'চলুন, ওপরে চলুন, আপনার কামরাটা দেখে নেবেন।' ওপর থেকে আরো আরো সুন্দর। ঘরে ঢুকতেই ইচ্ছে করছে না। একটা মস্ত গাছ ফুলে ফুলে গোলাপি।

'আপনার, যা দরকার চেয়ে নেবেন। এই বেয়ারা, এই বাবুর্চি, আর গাড়ির ড্রাইভার সবই আপনার সার্ভিসে রইল। এই হচ্ছে এয়ার কন্ডিশানের সুইচ্। এই কলিং বেল। আর ফোন—' মিঃ আখতার হোসেন এদিক-ওদিক তাকালেন—'ফোন নেই এই ঘরে?'

'এখন নাই।' বেয়ারা অম্লানবদনে জানাল, 'কলিং বেলেরও লাইন নাই।'

'কেন?' এ-কথার জবাব দেওয়ার দরকার মনে করল না। 'ওপরে কোনো ফোনই নেই?'

'মাস্টার বেডরুমে আছে।'

'কলিং বেল আছে ওখানে?' বেয়ারা মাথা নাড়ে। নঞর্থক। ওখানেও বেল নেই।

'তাহলে মেমসাহেব তোমাদের ডাকবেন কেমন করে?'

'জানালা হতে হাঁক দিবেন, 'বড়ুয়া!' বাবুর্চি হোক, আমি হই—যে কেউ ঠিক চলে আসব।'

কফি এসে গেল। বারান্দায় চেয়ার টেবিলে বসে আরামে কফিতে চুমুক দিতে দিতে বাইরে তাকাই। আঃ, এমন বাংলোতে তিনদিন থাকতে পারব, ফ্রি!

ওপাশে নাগা হিলস, বুঝলেন? অরুণাচল প্রদেশ, আর এপাশে বার্মা বর্ডার। এই গাছটার নাম হলং। কী বড় গাছ দেখেছেন? বেস্ট টিম্বার দেয়।'

'এত চমৎকার বাড়িটাকে ম্যানেজার-টানেজারের বাংলো না করে গেস্ট-হাউস করলেন কেন? বেশিরভাগ সময়েই তো ব্যবহার হয় না।'

বেয়ারার দিকে তাকালেন মিঃ হোসেন—'কী বড়ুয়া? লোকজনটন আসে কেমন? বেয়ারাকে দেখলেই বোঝা যায় ব্রিটিশ আমলের লোক। হাবভাবই আলাদা। যেমন গম্ভীর, তেমনি রাশভারি। ধপধপে শাদা উর্দি, মোজাবিহীন শুজুতো চকচক করছে । মাথায় পাগড়ি। বড়ুয়া বলে—'এইটাতো ভি আই পি বাংলো, এইখানে সারা বৎসরে আর কয়টা লোকই বা আসে। ওই সাতাশ নম্বর বাংলো বেশ ভরাথাকে। ঘরে ঘরে লোক। ওইটাই মেন 'গেস্ট-হাউস তো?'

'আর এত সুন্দর বাংলোটা—'

ভি আই পি আর কয়েকজন আসেন বলুন? সেই যে পেট্রো-কেমিকেলের মিনিস্টার একবেলার জন্য এসেছিলেন, তারপর তো এই মেমসাহেব এলেন, এর মধ্যে কেউই আসেন নাই।'

'তোমরা তাহলে কর কি?' হোসেনের চোখ কপালে উঠেছে।

প্রশ্নটা বড়ুয়ার পছন্দ হল না। তাচ্ছিল্যের মুখভঙ্গি করে বললে,—'এই ঝাড়াপোছা করি, পেতল পালিশ করি। বাগ-বাগিচা সামলাই। আর কি?'

'সরকারি চাকরি, কাজ কর না-কর যাবে না! মজায় আছো বেশ!'

হোসেনসাহেবের এ কথায় কোনো উত্তর দেয় না বড়ুয়া। 'আর কিছু লাগবে? ঘরে ফ্লাক্সে ঠান্ডাপানি দিয়েছি, মেশিন আছে। ডিনার কি এইখানে হবে?

'আরো না না, একা একা খাবেন কি? ওঁর ডিনার আছে ক্লাবে— হোসেন তরুণ অফিসার। উৎসাহে টগবগ করছেন। রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনে তাঁর ভূমিকাই বোধহয় প্রধান। আমাকে খুব যত্নআত্তি করছেন এঁরা—সত্যি সত্যি যাকে বলে ভি আই পি ট্রিটমেন্ট, তাই পাচ্ছি। হোসেন বললেন, 'এখন যদি একটু বেরিয়ে আসতে চান, গাড়ি আছে, যেতে পারেন যেদিকে খুশি। আমারা তো আপনাকে নিতে আসব ৬টার সময়।'

'এখানটাই এত সুন্দর যে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। সত্যি, ঠিক যেন স্বপ্নের মতো। বসে কোম্পানির গল্প করতে লাগলেন মিঃ হোসেন। তিনি পুরোনো নন এখানে, বড়ুয়া বহুদিনের। তাঁর বাংলো খানিক দূরে। আরেকটা সবুজ টিলার মাথায়।

'কিছু চাইলে হাঁক দেবেন'—বলে বড়ুয়া নেমে যায়।

হোসেন বললেন, 'এটা অদ্ভুত যে, কোনো কলিং বেল নেই।' বলতে বলতেই দেয়ালে চোখ যায়। পাখা আলোর সুইচবোর্ডে কলিং বেল। 'আরে, এই তো।' হোসেন উঠে গিয়ে বেল টিপলেন। কোনোই শব্দ শুনতে পেলুম না আমি অন্তত। 'ডিসকানেকটেড, মনে হয়।' নিজেই মন্তব্য করেন তিনি।

বাইরে চমৎকার বর্ষার মেঘমেদুর আকাশে পাহাড়ি সবুজের ওপর তার ছায়া যে কী মোহময় পশ্চিমবঙ্গে বসে কোনোদিন তা জানা যাবে না। চোখের মুগ্ধতা আর কাটেই না।

'সেরা বাংলোটাই রেখেছে আর কি ভি আই পিদের জন্য। আগে তো সরকারি কোম্পানি ছিল না? প্রাইভেট কোম্পানিতে বাইরে থেকে যারা আসে-টাসে তাদের যত্ন করাটা খুব জরুরি তো? বিজনেস ট্যাকটিকস্।' হোসেনের কথায় আমার মনে হল, আমার ঠিক এটা প্রাপ্য নয়। তো হোক। মাঝখান থেকে আমার মতন অব্যবসায়ীও এমন মজায় থেকে গেলুম। ভালোই হয়েছে সেরা বাড়িটিকে আতিথিশালা করেছে

এরা। পুজোর লেখার মূল্যবান সময়টা খরচ করেও এসেছি যে, সেটা সার্থক। নিজের খরচে জীবনেও এ-রকম একটা বাংলো ভাড়া করে থাকতে পারতুম না আমি! বেঁচে থাকুন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হোসেন চলে যাবার পরেও মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকি। উপত্যকার ওপারে পাহাড়ের পরে পাহাড়ের আবছা হয়ে যাওয়া ঢেউয়ের পরে ঢেউ, চোখ যেন টেনে ধরে রেখেছে। বাগানের দিকে তাকাই। একটি জাপানি স্টাইলের ছোট্ট বাগান চোখে পড়ল এবার খানিক নীচে, দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। একটা ছোট্ট ল্যাম্প পোস্ট, ছোট্ট একটা আঁকাবাঁকা নীল টালি বাঁধানো নকল নদী, তার ওপরে খুদে খুদে লাল টুকটুকে সেতু, ওমা গো! কী সুন্দর! আমি কিছুই চিনি শুনি না। হঠাৎ মনে হল টেলিফোন বাজছে। যে-ঘরে ফোনের শব্দ হচ্ছে সেই ঘরের দিকে ধেয়ে যাই। ঘরে ঢুকতেই ফোন থেমে গেল। এ-ঘরটায় আমার ঘরের চেয়েও বড় বিশাল এক বিছানা পাতা। এক কোণে আবার এক নিজস্ব ব্রেকফাস্ট-রুম রয়েছে কাচের জানলা ঘেরা। এগিয়ে যাই। এক্সপ্লোর করতে হবে তো? এত সুন্দর বাংলোতে আর কেউ নেই, একলা আমি! আই অ্যাম দ্য মনার্ক অব অল আই সার্ভে! আঃহ্। বাথরুম ভেবে যে দোরটা ঠেলি, সেটা ড্রেসিংরুম। তার ওপাশে বাথরুম। ড্রেসিংরুমে ঢুকতেই সুন্দর একটা হাল্কা সুগন্ধ নাকে এল।

আরেকটা দোর ঠেলতেই অন্য একটা বেডরুমে ঢুকে পড়ি। এটাই মাঝখানের ঘর। ভারী সুন্দর। এখানেও দ্বৈতশয্যা। এখানে কোনো সিঙ্গল বেডওয়ালা নেই দেখছি। এর সঙ্গে কেবল বাথরুম। পাশের যে দরজাটা আধখোলা, তার ফাঁক দিয়ে আমার ঘরটাই দেখা যাচ্ছে। সব করা যায়। আমার খুব আহ্লাদ হল। যখন যে ঘরে খুশি ঘুরে-ফিরে থাকা যাবে। সব ঘরেই দিব্যি আলো জ্বলে, পাখা চলে, এয়ার কন্ডিশনিং আছে। খানিক সুইচ টেপাটেপি করে আবার বারান্দায় যাই। সার্ভেন্টস্ কোয়ার্টার আর বাংলোর মাঝে একফালি উপল-বিছানো জমি। খুব বেশি দূর নয়। ডাকলেই ওরা শুনতে পারে— অতল নিঃশব্দে এই বাংলো, বাগানে শুকনো পাতা উড়লে, বারান্দায় তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। সর্বক্ষণ একটা ঝিম ধরানো ঝিঁঝির ডাকে ঘেরা এই বাংলো। ঘরে এসে খাটে চিৎপটাং হতেই আবার ফোন। এবার আমি উঠি না। তিনখানা কামরা ইন্সপেকশনের ফলে এখন ভি আই পি পরিশ্রান্ত। বিশ্রাম নিচ্ছেন। দরজা নক্ করে বড়ুয়া বললে—

'মেমসাহেব টেলিফোন এসেছে নীচে।'

বড়ুয়া ফোনটা নীচেই ধরেছে। আমি ওর সঙ্গে নীচে যাই। খাবারঘরে ফোন। হোসেন বলছেন ৬টার একটু আগেই তৈরি থাকতে।

বারান্দার প্রেমে পড়ে গিয়ে ঘরটাকে ভালো করে দেখা হয়নি। এবার খুঁটিয়ে দেখি। দেয়ালে বিলিতি গ্রামের শান্ত রঙিন দুটি দৃশ্য ফ্রেমে বাঁধাই অয়েলপেন্টিং। কোণে নাম সই করা আছে—ঢেউ। বাঁ ধারে বিশাল একটা শাদা আলমারি, তাতে তালা ঝুলছে। অন্য ধারে ছোট একটি আধুনিক স্টাইলের পালিশ-করা ওয়াড্রোব এ ঘরের সঙ্গে ঠিক মানাচ্ছে না। ওটাই আমার ব্যবহার্য। এদিকে ড্রেসিং টেবিল। বিশাল প্রমাণ সাইজের বেলজিয়াম গ্লাশের আয়নাটা ওপর-নীচে বেশ দোলানো যায়। বাঃ! বাথরুমে ঢুকি। গা ধুয়ে তৈরি হয়ে নিতে হবে। ঝকঝকে বাথটব। তাতে জল ভরতে শুরু করে দিই। ইঃ কি জোরেই জলের শব্দ হচ্ছে! দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আওয়াজ একটু কমাই। তালাবন্ধ আলমারিতে কী আছে? তালা কেন? সেই 'কঙ্কাল' সিনেমার মতো হঠাৎ খুলে যাবে না তো মাঝরাত্তিরে—আঃ এক কোণে ঘাড় গুঁজে বসে থাকা মলয়ার মৃতদেহ দেখা যাবে! ওরে বাবা রে? অন্য ঘরগুলোতে ঢুকে পরীক্ষা করে আসব নাকি? সব ঘরেই কি তালাবন্ধ আলমারি

থাকে? যেমন ভাবা তেমনি কাজ। হ্যাঁ, আট কোনা ঘরেও রয়েছে। আর উত্তর দক্ষিণ পূর্বদিকে খোলা মাস্টার বেডরুমে? নেই। কোনো আলমারিই নেই। ড্রেসিংরুমে? হ্যাঁ। এখানে আছে। এই তো। তালা নেই। টানতেই খুলে গেল। ভেতরে সেই সুন্দর গন্ধ। কিছু কাচা তোয়ালে ভাঁজ করা, আছে। ভূতটুত নেই। যাক্। নিশ্চিন্ত হয়ে স্নান করতে ঢুকে পড়ি।

দারুণ ক্লাব। দারুণ ডিনার। সবই দারুণ। নামেই সরকারি—এখনো বেশ দাপট আছে, প্রাইভেট কোম্পানির দিনগুলো সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। ফিরে এলুম, রাত তখন খুব বেশি হয়নি। এসব পার্টি থেকে বারোটার মধ্যেই ফিরতে পারাটা স্বাভাবিক নয়, কিন্তু এখানে যে কাজ শুরু হয় ভোর ৬টায়, শেষ হয়ে যায় দুপুর তিনটেয়। রাত্রে বেশিক্ষণ তাই পার্টি চলে না। গাড়ি থেকে নেমে দেখি বড়ুয়া বসে ঝিমুচ্ছে। উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করে বলল, 'বিছানা তৈরি। স্নান করবেন? জল তৈরি। কিছু লাগবে?'

এক পট কফি দিয়ে যেও ঘরে। এবারে তো কালকের বক্তৃতাটা তৈরি করতে হবে? যে জন্যে এতদূর আসা!

আমি রাতপাখি—আমার কাজকর্ম সব রাত্রে। দিনের বেলায় মাথায় কিছু ঢোকে না। রাত্রি জাগরণে আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট নেই।

'কফি? এক প-ট? ঠান্ডা বিয়ারও আছে কিন্তু মেশিনে। মেমসাব!

—নাঃ সত্যি সত্যি মেমসাবকে ভি আই পি ট্রিটমেন্টই বটে বড়ুয়া! এর আগে হয়তো সারারাত কফি-খেকো কোনো ভি আই পি ওঠেননি এখানে এসে।

—না, না, বিয়ার আমি খাই না বড়ুয়া, কফিই দাও। থ্যাঙ্ক ইউ।

—'ঘুমটা হত। কফিতে কি ঘুম হবে?

—'আমি তো ঘুমোতে চাই না। আমার কাজকর্ম আছে কিনা? কফিটা খেলে সুবিধা হবে রাত জাগতে।

—'যা বলেন।' বড়ুয়া চলে গেল। আমি আবার বারান্দায় যাই। বাতাসে বনের গন্ধ। বনের শব্দ। কত রকম আশ্চর্য শব্দই যে শোনা যাচ্ছে—আমার খুব ভালো লাগতে থাকে। দূর! কে এখন রবীন্দ্রনাথ ও আন্তর্জাতিকতা নিয়ে ভাবতে চায়? আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকি। বাইরে ঘন অন্ধকার। এ বারান্দার প্রত্যেকটা আলো জ্বলছে। নীচেরও। এত আলোয় কি রাত্রির রূপ দেখা সম্ভব? সুইচ বোর্ডের দিকে হাত বাড়াই। একটা একটা করে আলো নেবাতে থাকি। মেমসাব? ও কি করছেন? লাইটগুলো সব জ্বালা থাকবে। কেন? সারারাত্তিরই জ্বলবে? বড়ুয়া নীচে থেকে চেঁচিয়ে বলে।

তাই এখানকার নিয়ম। সিকিউরিটির নিয়ম।

অ। সত্যিই তো। জঙ্গলের মাঝখানে বাংলো। চারপাশে কিছু নেই। ওই রাস্তাটি দিয়েই শুধু সভ্য জগতের সঙ্গে যোগ। বাঘ-ভাল্লুকের কৌতুহল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বাগানটা ঘোর অন্ধকার।

বড়ুয়া কফির ট্রে নিয়ে আসে। বলে, 'আমরা এবার শুতে যাচ্ছি, মেমসাব। কিছু কি লাগবে?

'কিছু না।'

'দরকার হলে ডাকলেন জানলা খুলে। কোয়ার্টার পাশেই'।

ডাকব। 'গুড নাইট বড়ুয়া।'

—'ও, কটায় চা দেবো?'

—'ছটায় দিও।'

—'ব্রেকফাস্ট?'

—সাতটায়।'

—'গুড নাইট, মেমসাব।'

বড়ুয়া চলে গেল নীচে দরজায় চাবি দেবার শব্দ হল। তারপর চারিদিকের স্তব্ধতা যেন চিৎকার করে উঠল। এত বড় বাড়িটার আর কোনো দ্বিতীয় প্রাণী নেই। একটা কুকুর পর্যন্ত না।

ঘরে লেখার টেবিল চেয়ার নেই। বিচানায় ঘুছিয়ে বসি কাগজপত্তর নিয়ে। এয়ার কন্ডিশনারের গুঞ্জন ছাড়া কোনো শব্দ নেই ভিতরে। বাইরের বনের আওয়াজ এ-ঘরে আসে না। লেখায় মন দি। লেখা এগুতে থাকে, কফির গুতোয়। হঠাৎ একবার মনে হল যাই, বাইরে গিয়ে অরণ্য পর্বতের নৈশ শোভা পরিদর্শন করে আসি গে। আদেখলের ন্যায় কর্ম হচ্ছে জেনেও গুটিগুটি যাই। এমন সুযোগ কবার আসে জীবনে?

বারান্দায় যেতে বাগানের দিকে একঝলক তাকিয়েই মনে হল জাপানি বাগানের ছোট্ট ল্যাম্প পোস্টগুলোয় সব আলো জ্বলছে—ভারী সুন্দর তো? ভালো করে দেখব বলে রেলিঙে ভর দিয়ে যেই তাকিয়েছি, দেকি সব নিভে গেছে। কই জ্বলছে না তো? অথচ স্পষ্ট দেখলুম খুদে আলো জ্বলছে; (S) গড়নের নদীর ধারে ধারে—নাকি চোখের ভুল? রাত খুব কি বেশি হয়েছে? সেই ভোর চারটেয় গাড়ি আসবে, দমদমে গিয়ে প্লেন ধরতে হবে সাড়ে পাঁচটায়, সেই তাড়ায় রাত্রে শুতেই যাইনি কাল—যদিও রাত্রি জাগরণে আমার কষ্ট নেই, তবু, একেবারেই না শুলে স্নায়ুচর একটু ক্লান্তি তো....আরে, আরে, ওই তো আবার জ্বলে উঠেছে অলোগুলো! টালির নদীতে নীল জলের আভা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে—মুহূর্তের অন্যমনস্কতা ঘুরে যেতেই দেখি ফের আকাশ, বাগান অন্ধকার। নীল জল মুছে গেছে। বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির করে।

জলের ওপরে কী সুন্দরই দেখাচ্ছিল আলোটা এক্ষুনি! ইচ্ছে করতে লাগল বাগানে বেরুতে, কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে। ভিজতে সাহস হল না। ব্যাপারটা সশরীরে পরীক্ষার প্রচণ্ড ইচ্ছে সত্ত্বেও নিজেকে সামলে রাখলুম। ছাতা যখন নেই তখন এখান থেকেই দ্যাখা। তাছাড়া জীবজন্তু আসতে পারে বাগানে রাত্তির বেলায়। দূরের উপত্যকাতে মাঝে মাঝে মিটিমিটি আলোর সারি জ্বলছে, বাস-রাস্তা আছে ওখানে। সেটাই দেখেছি হয়তো—চোখের ভুল। কবির কল্পনা। সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের সামনে এত বড় একটা আলো! বেশ জন্তুজানোয়ারের ভয় আছে এখানে। তাই কোনো অফিসার এ বাংলো নেয়নি। রোজ রোজ কে আর জঙ্গলে থাকতে চায়।

এমন সময়ে হঠাৎ কোথায় একটা মেশিন চলতে শুরু হল। ঘর্ঘর শব্দে। আমি তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে যাই। এয়ার কন্ডিশনারটা বিগড়োল নাকি? নাঃ। ঘরের শব্দ তো যেমন-কে-তেমনই। কান পেতে বুঝতে পারি শব্দটা অন্যত্র আরেকটি এয়ার কন্ডিশনারের চালু হবার। তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে যাই। কী রে বাবা, কোথাও লুজ কানেকশন ছিল নিশ্চয়। না তো? এটা তো বন্ধ। তবে কি মাস্টার বেডরুমে পরদা সরিয়ে দরজা খুলে দেখি আলো জ্বলছে। অর্থাৎ বিকেলে আমি আলো নেবাতে ভুলে গেছি। কিন্তু এয়ার কন্ডিশনার চলছে না। আলোটা নেবাতে ঘরে ঢুকতেই মনে হল একবার ফোনটা বেজে উঠল। এগিয়ে গিয়ে ফোনটা ধরি। মাউথপিসের মধ্যে একটা অদ্ভুত ঝিমধরানো সুগন্ধ। কলকাতাতেও এমনি একটা সার্ভিস আছে, হপ্তায় হপ্তায় এসে ফোনে আতর মাখিয়ে যায়।

'হ্যালো?' ওদিকে শব্দ নেই। 'হ্যালো?' 'হ্যালো?' কই, কেউ তো কিছু বলছে না? ফোনটা বাজল বলেই মনে হল। না কি বাজেনি? কোনো জবাব নেই। বারকয়েক হ্যালো হ্যালো করে নামিয়ে রাখি। নিশ্চয়ই কোনো মাতালের কাণ্ড। আলো নিবিয়ে দিয়ে ফিরে আসি। আমার ঘরের আলোটা পরদার ফাঁক দিয়ে আটকোনা ঘরের মেঝেয় এসে পড়েছে, পথ দেখতে অসুবিধা নেই। আলোটাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে, মেঝের ওপরে যেন একটা আলোর তৈরি ক্রুশচিহ্ন। ফিরে যেতে যেতে মনে হল টেলিফোনের সুগন্ধটা সারা ঘরেই ছড়িয়ে পড়ছে। ফোনটা কি বেজেছিল? না বাজেইনি?

যেই লিখতে বসা, অমনি মনে হল ঝনঝন শব্দে জঙ্গলের বিচিত্র গুঞ্জন আর রাত্রির স্তব্ধতা ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে আবার টেলিফোন বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি দৌড়োই ও-ঘরে। পরদা তুলে, আলো জ্বেলে দেখি, কই? ঘর তো নিঃশব্দ। এ-ঘরে ফোন বাজছিল বলে তো মনেই হচ্ছে না। কিন্তু ঘরটা খুব ঠান্ডা হয়ে গেছে মনে হল,—এয়ার কন্ডিশনারটা কি চলছে? আগেও একবার দেখে গেছি অবশ্য। পাহাড়ি বৃষ্টিতে এমনি বেশ ঠান্ডা-ঠান্ডা পড়ে গেছে আর কি। তবুও 'সাবধানের মার নেই' পন্থায় এয়ার কন্ডিশনার যন্ত্রটার দিকে ভালো করে আরেকবার নজর করে দেখি। নাঃ, অফ করাই তো আছে। অথচ ঘর্ঘর শব্দও হচ্ছে কোথাও একটা। সম্ভবত এখানে অন্য কোনোরকম যন্ত্র আছে, যেটা রাত্রে অটো-মেটিক্যাল চালু হয়। বাগানের পাম্প, কী বিজলির ডাইনামো এ জাতীয় কিছু হতে পারে। ছাদের ওপরে ইঁদুরের ছুটোছুটি ক্রমশই বাড়ছে। খুটখাট খুটুর থেকে ঠাশ-ঠকাশের দিকে। কাঠের বাড়ির এই দোষ। ছাদভর্তি ইঁদুরের রাজত্ব। টেলিফোনটা সত্যি জ্বালালে। লিখতে দেবে না। বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে জল দেব ভাবি, কেমন ঘুম ঘুম পাচ্ছে। বাথরুমের দরজা খুলতেই সেই মিষ্টি গন্ধটা নাকে আসে। ভগবান জানেন কোন এয়ার ফ্রেশনার ব্যবহার করে এরা। ঘরে ঘরে স্প্রে করে গেছে কখন এসে। ভালো করে প্রত্যেকটা ঘরের দরজা টেনে বন্ধ করে এসেছি এবারে, যাতে ফোনটা বাজলেও শুনতে না পাই। বেশ পুরু বার্মাটিকের দরজা। এবারে লেখাটার একটা হিল্লে করতেই হবে। এমন সুযোগ আর কবে পাব? উচিত ছিল সব পুজোর লেখাটেখা এইখানে বসেই লিখব। এত নির্জনতা তো কলকাতায় তপস্যা করেও পাওয়া যাবে না! কিন্তু যেই খানিকটা এগিয়েছি অমনি মাথার মধ্যে ঝনঝন করে টেলিফোনের বাদ্যি শুরু হয়ে যায়। এবারে আমি মন ঠিক করেই যাই, রিসিভারটা নামিয়ে রেখে আসব। গেলে তো একবারও দেখছি না ফোন বাজছে। অথচ লিখতে বসলেই কানের মধ্যে ক্রিং ক্রিং। এইরকম টিলার ওপর নির্জন বাংলো বাড়িতে মধ্য রাত্রে ফোনটা বেজে ওঠাই তো উচিত—ছেলেবেলা থেকে যত ভূতের গল্প পড়েছি তাতে তাই-ই হয়—অথবা দোতলার জানলার কাচে মৃদু ঠকঠক—ওরে বাবা! কাঠে ঠকঠকটা এখনো অন্তত হয়নি—শুরু হয়ে যাবে না তো এবারে? কখন কাজ রেখে উঠে পড়ি—বন্ধ দোর ঠেলতে ঠেলতে আলো জ্বালতে বড়ঘরে যাই—ঢুকতে গিয়েই মনে হয়, ওদিক থেকে কেউ এগিয়ে আসছে কোনোরকমে আলোটা জ্বেলে ফেলি, অস্থির কাঁপা হাতে। উলটোদিকের মস্ত দেয়াল-আয়নায় দেখতে পাই আমিই আমাকে সন্ত্রস্ত অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। ঘর নিঃশব্দ। এই সুগন্ধেই মাথাটা ঝিম-ঝিম করছে কি? টেবিলে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ঘরে ফিরে আসি। শব্দ জব্দ। ফোন আর বাজবে না। সশব্দে নিঃশব্দে, কোনো প্রকারেই না। ঘরে ফিরতে ফিরতে টের পাই এই এয়ার ফ্রেশনারের গন্ধটায় কেমন যেন গা গুলোতে শুরু করেছে আমার। বাঙালি ঘ্রাণে এত সব সায়েবি কায়দা কি হজম হবার? গন্ধ বন্ধ করি কি উপায়ে?

রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক সত্তাটিকে না চিনলে তাঁর চরকাতর বাঙালি হৃদয়কেও আমরা চিনতে ভুল করব। তাঁর বুকের মধ্যে—ওঃ—ওই যে এবারে বুঝি নীচেই ফোন বাজতে শুরু করেছে! দরজা খুলে রেগেমেগে নামতে থাকি। দুপা নেমেই দেখতে পাই খাবার ঘরের দরজায় দুটি তালা ঝুলছে। আবার উঠে আসি। ও ফোন সারারাতই বাজবে। বাজুক। বারান্দা দিয়ে তাকিয়ে অবাক হয়ে যাই। জাপানি উদ্যানের মৃদু আলোগুলো দপ দপ করে জ্বলছে নিবছে। দেওয়ালির টুনি-বালবের মতো ব্যবস্থা আর কি! আলোগুলো জ্বলে-নিবে জ্বলে-নিবে কাউকে যেন কিছু সংকেত দিচ্ছে। আমার পা-দুটোকে সজোরে বাগানের দিকে টানছে ওরা। এই পাহাড়ি বৃষ্টিতে তা বলে কিছুতেই বেরুচ্ছি না আমি। যতই ডাকো না তুমি আমাকে। ভিজে শেষে হাঁপানি হয়ে যাক আর কি! শক্ত পায়ে ঘরে এসে শুয়ে পড়ি। আলোটালো সব নিবিয়ে দিই। লিখতে মন নেই।

ইঁদুররা ছাদের ওপরে যত লাফায় এবারে আমার তত আনন্দ হয়। ওই তো বাবা, জ্যান্ত প্রাণী সব কত রয়েছে। আমি মোটেই এখানে একা নই। কেন জানি না, একা একা এত বড় বাড়ি বাগান উপভোগ করার উৎকট এবং গরিবি আহ্লাদটা হঠাৎ উবে গিয়ে কেমন একটা গা-ছমছম ভয়-ভয় ব্যাপারে এসে দাঁড়িয়েছে। বাথরুমের সুগন্ধটা বড্ড যেন বেড়েছে। এ ঘরটাকেও ছেয়ে ফেলেছে। অদৃশ্য এয়ার কন্ডিশনারটি নির্ঘাৎ নীচেই চলছে। কোনো তালাবন্ধ ঘরে। ফোনটা কি বাজছে? নীচে? না পাশের ঘরেই? ফোনটা কোথায় বাজছে, বেজেই যাচ্ছে—নাছোড় ঘণ্টার শব্দ আমার তন্দ্রালস অর্ধচেনতার মধ্যে সাবানের ফেনার মতন বেড়ে চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে—মাঝে মাঝে তারই মধ্যে কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করছি, জানলার সার্সিতে খট-খট? তালাবন্ধ বড় আলমারিটা হঠাৎ খুলে যাবে না তো ঠাশ করে? আর এক কোণে সেই 'কঙ্কাল' সিনেমার মতন? আজ কফিটা না খেলেই হত। কালকের নিদ্রাহীন স্নায়ুর ওপরে। এতদূর প্লেনে এসেছি, ট্রেনে এলে তো তিনদিন লাগত—তারও স্ট্রেন আছে ওই, ওই তো খট-খট-না, ওটা ছাদে, ওটা সিলিঙের ফাঁকে ইঁদুরের নৈশভোজ—কিন্তু মাথার মধ্যে ফোনের শব্দটা যে থামছে না—বাড়তে বাড়তে দমকলের ঘণ্টির মতো ভয়ংকর, আরও বাড়তে বাড়তে মার্কিন অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনের মতো প্রচণ্ড মরীয়া শোনাতে—থাকে আমি দাঁতে দাঁত চেপে কম্বলের নীচে ঢুকে পড়ি কান-মাথা-মুখ কম্বল-মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার আপ্রাণ দমবন্ধ চেষ্টায় ইষ্টনাম জপ করতে থাকি। এটাই আমার প্রাত্যহিক নিদ্রাকর্ষণের প্রকৃষ্টতম পন্থা—(জীবনে শেষ পর্যন্ত দুশো আটবারও ইষ্টনাম গুনতে পেরেছি কিনা সন্দেহ!) মাথার মধ্যে ওই শব্দ আমি আর শুনতে পারছি না, হে ভগবান, আমার শ্রবণে তুমি শান্তি দাও!

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল পাখিদের ডাকাকাকিতে। জঙ্গলে যে কতরকমের পাখিই থাকে, আর কতই মনোমোহিনী তাদের কলকাকলি! তারই সঙ্গে এখনো ঝিঁঝি ডাকছে বনের ভেতরে এই তো দিন-হয়ে-বলে। মাথাটা ভার ভার লাগছে। বারান্দায় বেরিয়েই মাথা হালকা হয়ে গেল। বৃষ্টি থেকে গেছে। কী সুন্দর সেজেগুজেই না সূর্যের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে শৈল শ্রেণি।

বারান্দা থেকে একদিকের বাকি দুটো ঘরেই বাইরের দরজায় বড় বড় তালা মারা—একমাত্র হৃদয় হৃদয়েই যাওয়া-আসা করা যায়—যেটা আমি প্রায় গুরুকৃত্যের মতো নিষ্ঠার সঙ্গে সারারাত ধরে করেছি! কী মনে হল আবার আমার ঘর দিয়ে মাঝের আটকোনা ঘর পার হয়ে বড় ঘরে যাই—ওই তো, রিসিভারটা পাশে নামানো রয়েছে। ঘরে ঢোকার সময়ে দেওয়াল-আয়নায় আবার নিজেকে দেখতে পাই। খাটটা সত্যি মস্ত বড়—মাথার

কাছে একটা টানা তাক। কী যেন নেই—কী যেন নেই—মনে হতে থাকে—ঠিক বুঝতে পারি না। খাটের মাথার কাছে ওই তাকে কী থাকার কথা ছিল এখনি হঠাৎ খেয়াল হয়, বাইবেল। হ্যাঁ, খাটের মাথার ধারে একটা বাইবেল থাকত নিশ্চয়—ওটা কি কালও ছিল? গন্ধটা এবারে হঠাৎ চিনতে পারি। না আতরের নয়, বিলিতি ইনসেন্সের গন্ধ। গির্জেতে যে ধূপ জ্বলে সেই ধূপের। ঘরটায় গির্জের গন্ধ। কফিনের বাক্সে যে ধুপ জ্বলে, সেরকম। মনে কেমন একটা ভার নিয়ে পিছু হেঁটে বেরিয়ে আসি। ফোনের রিসিভারটাকে ক্রেডলে তুলে রাখা আর হয় না।

বড়ুয়া চা নিয়ে আসে ট্রে সাজিয়ে।—'গুড মর্নিং মেমসাব। আপনার চা।'

'গুড মর্নিং বড়ুয়া। কাল রাত্রে বার বার একটা ফোন আসছিল!'

বড়ুয়া চুপ করে থাকে। ওর এই অভ্যেসটা আমার খুব খারাপ লাগছে।

'তোমাদের কোয়ার্টার থেকে শোনা যায় না রিং? রাত্তিরে?'

'না মেমসাব।'

'ফোনটা খুলে রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই?'

'উপরেরটা খোলা যায়, নীচেরটা যায় না।'

'আজ রাত্রে বরং রিসিভারটা নামিয়ে রেখে যেও, নীচে-ওপরে দু-জায়াগাতেই।'

—'ঠিক আছে। ব্রেকফাস্ট সাতটায় দেব তো?'

—'হ্যাঁ। আচ্ছা বড়ুয়া, ওই জাপানি বাগিচার আলোয় কি টুনি-বালব লাগানো নাকি? আপনা-আপনিই জ্বলে-নেবে?'

'বলতে পারি না মেমসাব, ওসব ব্যাপার মালি জানে।'

'আচ্ছা কাল রাত্তিবেলায় নীচের তলায় কিসের একটা মেশিন চালু হল বলো তো?'

বড়ুয়া চলে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়ায়। ভুরু কুঁচকে বলে—'কই, কোনো মেশিন তো চালানো হয়নি রাত্রে?'

'হয়নি? কিসের আওয়াজ হচ্ছিল তবে? কোনো এয়ার কন্ডিশনারের লুজ কানেকশন হয়ে নেই তো?

'না মেমসাব!'

কিংবা আর কিছু? পাম্প সেট-টেট? ডায়নোমো?

'না মেমসাব।' বড়ুয়া মাথা নেড়েই চলে।

কিন্তু আমি যে স্পষ্ট শুনলুম, সারারাত—খুব স্পষ্ট শুনলুম—

'যাই হোক, জাপানি বাগিচার বাতিগুলো রাত্রে কিন্তু ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল।'

'জ্বলছিল নাকি বাতিগুলো? ঠিক দেখেছেন?' এবার বড়ুয়ার নির্বিকার মুখে স্পষ্টই চমক লাগে।

'কেন, তুমি জ্বেলে দাওনি?'

'না মেমসাব। ওসব মালি জানে।'

পাগড়ি বাঁধা মালি বাগানে উবু হয়ে বসে খুরপি হাতে কাজ করছে। চায়ের কাপ হাতে বাগানে নেমে যাই।

'জাপানি বাগিচাটা ভারি সুন্দর করেছ।'

'হম নহী বনায়া মেমসাব, ও অংগ্রেজসাহাব আপনা হাথসে বনওয়া থা। উধরমে মৎ যানা মেমসাব—মিট্টি গিলা হ্যায় বারিশসে—'

'জাপানি বাগিচার বাতি কি তুমি জ্বালিয়ে গিয়েছিলে কাল?'

বুড়ো মালি ঘোলাটে চোখ তুলে তাকিয়ে ফোকলা মুখে মিষ্টি করে হাসে। মাথা নাড়তে নাড়তে বলে—

'বাত্তি হ্যায় নহী মেমসাব, উয়ো ছোটা ছোটা বালব ইধর মিলতা হী নহী, জ্বলাউঙ্গা কৈসে?'

আমার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা বরফের বাতাস নেমে গেল। ইচ্ছে করল চিৎকার করে উঠি, কিন্তু সারা রাত্তিরই তো বাতি জ্বলেছে ওখানে! জ্বলেছে, নিবেছে, জ্বলেছে! কিন্তু মুখে কিছুই বলি না।

আমি বুঝতে পারছি, এখন যদি বড়ুয়াকে জিগ্যেস করি, 'বড়ুয়া, তুমি ঘরে ঘরে কোন এয়ার ফ্রেশনার স্প্রে করেছিলে বলো তো, গন্ধটা বড্ড কড়া ছিল।'

বড়ুয়া নিশ্চয় বলবে—'স্যরি মেমসাব, কিন্তু আমি তো কোনো স্প্রে লাগাইনি?' যথাসাধ্য ঘ্রাণশক্তিকে তীক্ষ্ণ করে আরেকবার গন্ধটা খুঁজতে চেষ্টা করি বাতাসে। পাওয়া যাচ্ছে না। জাপানি বাগানটি আজ সকালের আলোয় কেমন যেন ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছে। রাত্রে যে এ-ই মোহিনী মায়ায় পরীর দেশ হয়ে আমাকে ডাকছিল। তা কে বলবে।

'সুপ্রভাত! সুপ্রভাত! কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?' ব্রেকফাস্টে হোসেনের সঙ্গে চলে এলেন স্বয়ং ম্যানেজার মিস্টার চ্যাটার্জি এবং ফিনান্স অফিসার শ্রীনিবাসন।

'আরে, আসুন, আসুন। না না, খুবই কমফর্টেবল—'

'রাত্রে ঘুমটুম হয়েছিল তো?'

'খুব ভালো, খুব ভালো,—থ্যাংকিউ'—

'বাংলোটা পছন্দ হয়েছে তো আপনার? মিঃ হোসেন অবিশ্যি বলেছিলেন আপনি এখানে স্যাটিসফায়েড—আমি তবুও এসেছিলাম অন্য একটা সাজেসান নিয়ে—আমার স্ত্রীর খুব শখ আপনাকে একটু আমাদের বাংলো এই বাংলোর ধারে-কাছে লাগে না, তবু, সেটাও একটা অন্যরকম টিলার ওপরে একটা ঝরনা আছে, একটা ছোট লেক মতনও আছে সামনে—চলুন না যাবেন নাকি? আমার স্ত্রীর একান্ত অনুরোধ'—

'অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু কেন মিছিমিছি ঝামেলা বাড়াবেন, বেশ তো আছি—আচ্ছা মিস্টার চ্যাটার্জি, এটাকে ম্যানেজারের বাংলো না করে গেস্ট হাউস করা হল কেন? এত সুন্দর বাগানটা।'

'মানে', একটু গলাখাঁকরি দিয়ে নিয়ে বৃদ্ধ শ্রীনিবাসনই উত্তর দেন, 'এটাই আগে ম্যানেজারের বাংলো ছিল, একটা রাদার আনফরচুনেট ব্যাপারের পর থেকে আর ম্যানেজারেরা কেউ এখানে থাকেন না।'

'তার মানে?'

'টেড ম্যাথায়াস নামে এক অল্পবয়সী ইংরেজ ম্যানেজার এ-বাড়িতে মারা গিয়েছিল। তারই তৈরি এই টেরাসড গারডেন, তার নিজের হাতে করে গড়া ওই মডেল জাপানি বাগিচা, তার বাগদত্তা বউয়ের জন্যে উপহার। ছুটি নিয়েছিল, বিয়ে করতে দেশে যাবে বলে। এক রাত্তিরে ট্রাংককলে হঠাৎ খবর এল বউ অন্যের সঙ্গে ফ্রান্সে পালিয়ে গেছে। ম্যাথায়াস সাহেব খবরটা পেয়ে নিজের উপর রাগে গুলি চালায়। সেই থেকে অপয়া বাড়ি বলে কেউ এখানে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বসবাস করতে চায় না আর কি। আর যত আজেবাজে গল্প-গুজবও লোকে রটিয়েছে এই ফাঁকে, সে সব অবিশ্যি কিছু না।'

চ্যাটার্জি বলেন—'কিছু নয় ঠিকই, তবু শুনে-টুনে ভয়ও তো পায় দেখি লোকে। বয়বাবুর্চিরাও ওই অজুহাতে এখানে রাত্রি বাসটা করতে চায় না। সেবার এক ভদ্রলোক তো ভয়ংকর ভয়টয় পেয়ে কেলেংকারি করে ফেলেছিলেন, কীসব শব্দটব্দ শুনেছেন, আলো-ফালো দেখেছেন, তাঁর সারারাত ঘুম হয়নি। হাইপার টেনশনের রুগি, সকালবেলায় সোজা ডাক্তার ডাকতে হল। সে এক কাণ্ড। সেই থেকে আমরা আর এটা তেমন ইউজ করি না।'

'যতসব ফাটাইল ইমাজিনেশনের লোক—' মহোৎসাহে বললেন হোসেনসাহেব।

'এই তো ডক্টর দেবসেন দিব্যি ঘুমোলেন, কিছুই ডিসটার্বড হননি। ওসব গল্পসল্প কাউকে বলাই উচিত নয় আগে থেকে।'

'কী, আমাদের কথাটা ভাবছেন একটু?' চ্যাটার্জি বললেন—'গিন্নীর আবেদনটা মঞ্জুর হবে তো? আজ রাত্রে?'

আশা করি ওরা খেয়াল করেননি কখন আমার হাতের কাঁটা-চামচ স্থির হয়ে গেছে, অভুক্ত ডিম বেকনের প্লেটে।

রাতটা ছিল দুর্যোগের

সমরেশ মজুমদার

দিনটা ছিল দুর্যোগের। আকাশে আলো ছিল না একফোঁটা। ঠান্ডা বাড়ছিল হু-হু করে। পোড়া কাঠের মতো মেঘগলো চাপ হয়ে ঝুলছিল, যেন টোকা মারলেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে। দিন ফুরোবার আগেই রাত নামল। সেইসঙ্গে দাঁতালো হাওয়ারা নেমে এল খোলা পৃথিবীতে। এখনো বৃষ্টি নামেনি, এই রক্ষে।

রাস্তায় এই আবহহাওয়ায় মানুষ থাকার কথা নয় বলেই নেই। স্ট্রিট ল্যাম্পগুলো ডাইনির চোখ হয়ে জ্বলার চেষ্টা করছিল। এই অবস্থায় ভদ্রমহিলাকে দেখা গেল দ্রুত হাঁটতে। তাঁর বয়স চল্লিশের ওপরেই, একটু মোটাসোটা ভালোমানুষ গোছের চেহারা। হনহনিয়ে হাঁটছেন আর বারংবার পেছন ফিরে দেখছেন। যেন কেউ তাঁকে অনুসরণ করছে। স্ট্রিট ল্যাম্পের নীচ দিয়ে তিনি যখন হেঁটে গেলেন, তখন তাঁর মুখটা চকখড়ির মতো সাদা দেখাল। সেটা ঠান্ডায় যতটা নয়, আতঙ্কে ঢের বেশি। ওঁর শরীরে শীতের পোশাক আছে। তার ওপর একটা কালো চাদরে মাথা-গলা ঢেকে রেখেছেন। সম্ভবত কানে যাতে হাওয়া না ঢোকে, তাই সতর্কতা। হাতে একটা ব্যাগ। যেসব ব্যাগ নিয়ে মহিলারা অফিসে যান, সেইরকমের। পায়ে মোজা এবং পাম্প-শু গোছের জুতো।

দ্রুত চলার জন্যই ভদ্রমহিলা হাঁপাচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল তিনি যে-কোনো মুহূর্তেই বসে পড়বেন। দু-পাশের বাড়িগুলোর দরজা-জানালা বন্ধ। একটুও আলো চোখে পড়ছিল না। বাঁক ঘুরতেই ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে পড়লেন। সামনের একটা বাড়ির দোতলার জানলায় আলো দেখা যাচ্ছে। কাচের আড়ালে কেউ যেন দাঁড়িয়ে কথাও বলছে। ভদ্রমহিলা আর দেরি না করে ছুটে গেলেন একতলার দরজায়। প্রাণপণে বেলের বোতাম টিপে ধরলেন। সেই মুহূর্তেও তাঁর চোখ পেছন দিকে চলে গেল। দূরে কুয়াশায় কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে। ওপর থেকে গলা ভেসে এল, 'কে?'

'দয়া করে দরজা খুলুন। প্লিজ। আমাকে বাঁচান।' ভদ্রমহিলা আর্তনাদ করলেন।

দরজাটা খুলে যেতেই একদঙ্গল আলো রাস্তায় ভদ্রমহিলার শরীর ভাসিয়ে লাফিয়ে নামল। একজন মধ্যবয়সী মানুষ দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'একটু যদি ভেতরে আসতে দেন, তাহলে বলছি।'

ভদ্রলোকের স্ত্রী পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আসুন, নিশ্চয়ই আসবেন।'

ভদ্রমহিলা কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে ভেতরে ঢুকতেই ভদ্রলোক দরজা বন্ধ করলেন। ওঁরা ভদ্রমহিলাকে ওপরে নিয়ে এসে বসতে বললেন। সেটা খুবই প্রয়োজন ছিল ওঁর। একটা চেয়ারে বসে বড়-বড় নিশ্বাস ফেললেন তিনি। ভদ্রলোকের স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি অসুস্থ?'

'অ্যাঁ? না, ঠিক, আসলে দৌড়ে আসছিলাম বলে, অভ্যেস তো নেই।' ওঁর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল।

'দৌড়চ্ছিলেন কেন?'

'মনে হচ্ছিল, হচ্ছিল বলব কেন, স্পষ্ট দেখেছি, কেউ যেন আমাকে ফলো করছিল। রাস্তায় তো আজ একটাও লোক নেই, তাই ভয়ে...' ভদ্রমহিলা কথা শেষ করতে না পেরে দুহাতে মুখ ঢাকলেন।

ভদ্রলোক বললেন, 'সে কী! এ-পাড়ায় কে অমন কাজ করার সাহস পাবে?' তিনি সোজা জানলার কাছে চলে গিয়ে রাস্তাটা দেখার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, 'নাঃ, কেউ নেই।'

'কিন্তু ছিল!' ভদ্রমহিলা প্রতিবাদ করলেন।

'বেশ, থাকেও যদি, তাহলে আর আপনার ভয় নেই। আমার স্বামী সরকারি অফিসার। সবাই ওঁকে চেনেন।' স্ত্রী পরিচয় দিতেই স্বামী এগিয়ে এলেন, 'শোনো, আমার মনে হয় ওঁকে এককাপ গরম দুধ দিলে ভালো হয়।'

ভদ্রমহিলা আপত্তি করলেন, 'না, না, দুধ আমি খাই না।'

ভদ্রলোক হাসলেন, 'শৈশব থেকেই অনেকে এই বদ অভ্যেসটা করে ফেলে। বেশ, কফি চলবে?'

ভদ্রমহিলা আরও সঙ্কুচিত হলেন, 'না, না। আমার এসব লাগবে না।'

ভদ্রলোকের স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, এই বিচ্ছিরি আবহাওয়ায় আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?'

ভদ্রমহিলা মুখ নিচু করে মাথা নাড়লেন, 'কাজে। আমি যেখানে কাজ করি, সেখানে অনুপস্থিত হলেই মাইনে কাটে। টাকার প্রয়োজন বলেই এই আবহাওয়াতেও সকালে বেরিয়েছিলাম।'

ভদ্রলোক সমব্যথীর গলায় বললেন, 'সকালে অবশ্য আবহাওয়া এত খারাপ ছিল না।'

ওঁর স্ত্রী বললেন, 'তা হলে আপনি চাকরি করেন। বাড়িতে আর যাঁরা আছেন...।'

'আর কেউ নেই ভাই।' ভদ্রমহিলা মুখ তুলছিলেন না। তিনি রুমালে চোখ মুছলেন।

ভদ্রলোক ইশারায় স্ত্রীকে নিষেধ করলেন এ-বিষয়ে কথা চালাতে। স্ত্রীর সেটা ভালো লাগল না। একটু সময় যেতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার স্বামী...?' প্রশ্নটা ইচ্ছে করেই শেষ করলেন না।

'তিনি মারা গিয়েছেন অ্যাকসিডেন্টে। এইরকম খারাপ আবহাওয়ার সন্ধে ছিল সেদিন।'

ভদ্রলোক কিছু বলার আগেই ওঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর?'

'উনি অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন, এই সময় একটা কালো গাড়ি এসে ওঁকে চাপা দেয়।'

'ইস।'

'কিন্তু আমি জানি, উনি কখনো অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তায় হাঁটতেন না।'

'তার মানে?'

'আমার কথা পুলিশ বিশ্বাস করেনি। কালো গাড়িটাকেও ধরতে পারেনি, কিন্তু আমি দেখেছি।'

'দেখেছেন মানে?'

'যখনই আমি একা-একা রাস্তায় হেঁটে যাই, তখনই দেখি একটা কালো গাড়ি আমার পেছন-পেছন আসছে। যতক্ষণ না সেটা বেরিয়ে যায়, ততক্ষণ আমি রাস্তা পার হই না।'

'গাড়িতে কে থাকে দেখেছেন?'

'না। মুখ দেখতে পাইনি।'

'আজও কি গাড়িটা পেছনে ছিল?'

'হ্যাঁ। প্রথমে গাড়িটাকে দেখলাম। একবার। তারপর মনে হল, কেউ যেন দরজা খুলে নেমে আমার

পেছন-পেছন আসতে লাগল।'

ভদ্রলোক আবার জানলায় চলে গেলেন। ভালো করে রাস্তাটা দেখে ফিরে এলেন তিনি, 'আচ্ছা, আপনি কতদূরে থাকেন?'

'সামনের রাস্তা ধরে মিনিটচারেক গেলে বাঁ দিকে তিনতলা কাঠের বাড়িটায় থাকি আমি।'

'ও। সামান্যই পথ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আপনাকে পৌঁছে দেব।'

'না, না। আপনি কেন যাবেন। ছি ছি, এসেই বিব্রত করেছি, তার ওপর।'

'মোটেই বিব্রত করেননি।' ভদ্রলোক বড় গলায় বললেন, 'প্রতিবেশিকে যদি সাহায্য না করি, অন্যের প্রয়োজনে যদি না লাগি, তা হলে মানুষ হয়ে জন্মালাম কেন?

ওঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার শরীর এখন কেমন লাগছে?'

ভদ্রমহিলার মুখের সাদা ভাব এখন অনেকটাই চলে গিয়েছে। সোজা হয়ে বসে বললেন,

'ভালো। আমি এখন যেতে পারব। শুনুন, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আমি একাই যেতে পারব।'

'তা হয় না। যে কালো গাড়ি আর তার ড্রাইভারের গল্প শোনালেন, তারপর আর আপনাকে একা ছেড়ে দিতে পারি না। হ্যাঁ, আপনাকে কথা দিচ্ছি, কয়েকদিনের মধ্যেই এই কালো গাড়ির রহস্য-সমাধান হয়ে যাবে। কাল থেকেই পুলিশকে বলব ওয়াচ করতে।'

ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন, 'আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব।'

'কর্তব্য, বুঝলেন, এসব কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।' ভদ্রলোক উদার গলায় বললেন।

উনি উঠে দাঁড়াতেই স্ত্রী স্বামীকে ডেকে নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে, চাপা গলায় বললেন, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে?'

'স্বামী অবাক হলেন, 'কেন? কী করেছি?'

'তুমি ওঁকে পৌঁছে দিতে যাচ্ছ! এই আবহাওয়ায় একটা কুকুরও রাস্তায় নেই।'

ভদ্রলোক আড়চোখে বাইরের দিক দেখলেন, 'তোমার কিসসু মনে নেই।'

'মানে?'

'আমার একটা কালো গাড়ি ছিল এবং আমিও একটা অ্যাকসিডেন্ট করেছিলাম।'

'কিন্তু তুমি তো বলেছিলে লোকটা মরেনি।'

'করার সময় তাই মনে হয়েছিল, পরে তো দেখতে যাইনি, খবরও নিইনি।'

'তার মানে, তোমার গাড়িতেই...?'

'নাও হতে পারে। শুনলে তো, এখনো সেই কালো গাড়িটা ওঁকে ফলো করে।'

স্ত্রীর উত্তেজনা কমল। তিনি মনে করে বললেন, 'তুমি তখন বলতে, গাড়িটা যেন কীরকম!'

'হ্যাঁ। সবসময় ড্রাইভারের কথা শুনত না। তাই তো বিক্রি করে দিলাম।' ভদ্রলোক উসখুস করলেন, 'চলি। উনি অনেকক্ষণ বসে আছেন।'

'শোনো, যে-জন্যে তোমাকে ডাকলাম, তুমি রিভলভারটা নিয়ে যাও।'

'রিভলভার?'

'হ্যাঁ। যাচ্ছই যখন, তখন সাবধান হয়ে যাওয়াই ভালো।'

'বেশ।' ভদ্রলোক আলমারির দিকে এগোলেন।

ভদ্রমহিলা দরজার কাছে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিলেন। যেন এই ঘরেও তাঁর শীত লাগছে, এমন ভঙ্গি। ভদ্রলোকের স্ত্রী হাসিমুখে এগিয়ে এলেন, 'আপনার কোনো ভয় নেই। উনি পৌঁছে দিয়ে আসবেন। আচ্ছা, আপনার বাড়ির ফোন নম্বর কত?'

'আমার বাড়িতে তো ফোন নেই।'

'ওঃ। বাড়ি পৌঁছে একটা ফোন করলে নিশ্চিন্ত হতাম, তাই বললাম। ওই অ্যাকসিডেন্টটা কতদিন আগে ঘটেছিল?' খুব সাধারণ গলায় জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোকের স্ত্রী।

'বছর-দুই আগে।'

ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। ওঁরা নীচে নেমে গেলে ভদ্রলোকের স্ত্রী বারংবার তাড়াতাড়ি ফিরে আসার কথা বলে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

এখন রাস্তায় ঘন কুয়াশা। স্ট্রিট ল্যাম্পগুলোকে ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। ভদ্রমহিলা লজ্জিত গলায় বললেন, 'দেখুন তো, আমার জন্যে আপনার কি কষ্ট হচ্ছে।'

'কষ্ট কেন বলছেন! এটা কর্তব্য।'

কয়েক পা হেঁটে ভদ্রমহিলা পেছন ফিরে তাকালেন। সেটা লক্ষ করে ভদ্রলোক দাঁড়ালেন। তাঁর কোটের পকেটে রিভলভারটাকে আঁকড়ে ধরে লক্ষ করলেন, কাউকে দেখতে পাওয়া যায় কি না। না পেয়ে বললেন, 'কেউ নেই তো।'

'পায়ের আওয়াজ শুনলাম।'

'ঠিক আছে, আপনি এগোন, আমি একটু পিছিয়ে আপনাকে ফলো করব। কেউ যদি কাছে এসে পড়ে, তা হলে আমার হাত থেকে ছাড়া পাবে না।'

'না, না। তার দরকার হবে না। ওই যে জুতোর দোকানটা এসে গেছে, আমি ঠিক যেতে পারব। আপনি চলে যান।' ভদ্রমহিলা সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে বললেন।

এই সময় গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। তারপরেই দুটো হেডলাইটকে কুয়াশা চিরে এগিয়ে আসতে দেখলেন ওঁরা। ভদ্রলোক রিভলভার বের করে তৈরি হলেন। কিন্তু গাড়িটা দাঁড়াল না। সমান গতিতেই তাঁদের পেরিয়ে চলেগেল। দুজনেই দেখতে পেলেন গাড়িটার রং সাদা।

ভদ্রমহিলা স্বস্তিতে বলে উঠলেন, 'নাঃ।'

'হ্যাঁ, আমিও...।' ভদ্রলোক রিভলবার আর ঢোকালেন না, 'চলুন, আপনাকে পৌঁছে না দিয়ে আমি ফিরব না।'

কয়েক পা হেঁটে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার স্বামী কী করতেন?'

'মাস্টারমশাই ছিলেন।'

'কীরকম বয়স ছিল?'

'এই, আপনারই বয়সি।'

ভদ্রলোক ঢোক গিললেন, 'ও। উনি কি দুর্ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। পুলিশ তাই বলেছিল।'

কিছুদূর যাওয়ার পর ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমি এসে গিয়েছি। আর চিন্তা নেই।'

'ও। বাড়িটায় আলো জ্বলছে না।'

'পুরোন বাড়ি। দোতলায় আমি ছাড়া কেউ থাকে না। তিনতলাটা বন্ধ।'

'চলুন, আপনাকে আপনার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'না, না। কোনো দরকার নেই। আমি ওই সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠলেই ফ্ল্যাটের দরজায় পৌঁছে যাব। আর আমার কোনো ভয় নেই।'

'বেশ। তা হলে চলি।'

'হ্যাঁ। অনেক ধন্যবাদ।' বলেই ভদ্রমহিলা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। তিনি যতক্ষণ না চোখের আড়ালে না গেলেন, ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর নিশ্বাস ফেলে বাড়ির পথ ধরলেন।

কয়েক পা হাঁটার পরই মনে হল, কেউ যেন তাঁর পেছনে আসছে। স্পষ্ট পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছেন তিনি। ঘুরে দাঁড়িয়ে লক্ষ করলেন। কুয়াশা এখন এমন ঘন হচ্ছে যে, কাউকেই দেখতে পেলেন না। রিভলভারটা উঁচিয়ে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই গাড়ির শব্দ কানে এল। একটা গাড়ি যেন আসছে, কিন্তু তার হেডলাইট নেভানো। সেটা জ্বললে তিনি দেখতে পেতেন। দ্রুত ফুটপাতের শেষপ্রান্তে চলে এলেন তিনি। গাড়িটা রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাক, তারপর তিনি যাবেন। কিন্তু সরে আসামাত্র শব্দটা থেমে গেল। কুয়াশারা এখন পাক খাচ্ছে সর্বত্র। স্ট্রিট ল্যাম্পগুলোকেও গিলে ফেলেছে তারা। তিনি আবার পা ফেলতেই গাড়ির শব্দ শুনলেন। যেন গাড়িটা ওত পেতে ছিল একপাশে, তাঁকে চলতে দেখেই সক্রিয় হয়েছে।

ভদ্রলোকের সমস্ত শরীরে কাঁটা ফুটল। ওই ঠান্ডায় কুয়াশায় দাঁড়িয়েও হাতের মুঠোয় ধরা রিভলভারটা ভিজে উঠল। তাঁর মনে হল, এগোনোটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তিনি এক দৌড়ে পেছন দিকে চলে এলেন। ভদ্রমহিলার বাড়ির কাঠের সিঁড়িটা দেখতে পেয়ে পেছন ফিরে তাকালেন। না, কেউ নেই। তাঁর মনে হল একা ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না। থানায় একটা ফোন করে সাহায্য চাইতে হবে। ফোন কোথায় পাওয়া যায়? ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারেন। তিনি দ্রুত কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, দোতলায় উনি একা থাকেন। অতএব ওঁকে খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না।

দোতলায় উঠে পা বাড়াতে গিয়ে কোনোমতে নিজেকে সামলে নিলেন ভদ্রলোক। সিঁড়ির সামনে বারান্দা বা করিডোর বলে কিছু নেই। কাঠগুলো অনেক, অনেক আগেই খসে পড়ে গিয়েছে। ওপাশের দরজাটা ভাঙা এবং অন্ধকার।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভদ্রমহিলা এই শূন্য দিয়ে হেঁটে গিয়েছেন।

ব্রহ্মদত্যির খড়ম নেই

শেখর বসু

রিন্টুর বহুদিন ধরে ইমতিয়ারপুরে যাওয়ার খুব শখ। তিনটে দেখার জিনিস আছে ইমতিয়ারপুরে। এক, অসংখ্য বাঁদর আছে ওখানে। দুই, বাপ্পাদের বাড়ির খুব কাছেই আছে মস্ত একটা পাহাড়। তিন, ওখানকার একটা বেলগাছে আছে এক ব্রহ্মদত্যি। তিন নম্বরের জিনিসটা সম্পর্কে রিন্টুর খুব একটা পরিষ্কার ধারণা ছিল না। স্কুলে যদি ব্রহ্মদত্যির সম্পর্কে কিছু লিখতে দেওয়া হত তাকে—ও নির্ঘাত লিখত, ব্রহ্মদত্যি এক প্রকারের জিনিস যা বেলগাছে থাকে। কিন্তু এখন ও ব্রহ্মদত্যি সম্পর্কে অনেককিছু জেনে গেছে একটা গল্পের বই পড়ে। আর জানার পরেই সত্যিকারের ব্রহ্মদত্যি দেখার জন্যে ওর আগ্রহ বেড়ে গেছে ভীষণ।

পুজোর ছুটির দু-মাস আগে থেকে রিন্টু ঝুলোঝুলি শুরু করে দিয়েছিল ইমতিয়ারপুরে বেড়াতে যাওয়ার জন্যে। বাবা বলেছিল, ওখানে গিয়ে কী হবে, তার চেয়ে চল আমরা সিমলায় বেড়াতে যাই। মা বলেছিল, সিমলার চেয়ে ঢের ভালো রাজস্থান, আমরা এবার রাজস্থানে যাব।

কিন্তু রিন্টুর বায়নায় সিমলা আর রাজস্থান বাদ পড়ে গেল। পুজোর ছুটিতে সবাই মিলে হাজির হল ইমতিয়ারপুরে বাপ্পাদের বাড়িতে। বাপ্পা রিন্টুর মাসতুতো ভাই; তিন মাসের ছোট-বড় ওরা, দুজনেই পড়ে ক্লাস ফাইভে। দুজনের মধ্যে খুব ভাব। বাপ্পারা কলকাতায় এলেই রিন্টুদের বাড়িতে ওঠে। তখন একসঙ্গে দুটো কাজ চলে। এক কলকাতা দেখা; দুই ইমতিয়ারপুরের গল্প শোনা।

ইমতিয়ারপুরে এসে রিন্টু বাপ্পাকে বলল, 'এই, কোন গাছে থাকে রে?'

'কে?'

'কে আবার, ব্রহ্মদত্যি।'

'সে তো ওই দূরের এক আমবাগানে। আমবাগানের একধারে একটা বেলগাছ আছে, সেই বেলগাছে থাকে ব্রহ্মদত্যি।'

'চল দেখে আসি।'

'এখন কী করে দেখবি! সন্ধের আগে ভূত ব্রহ্মদত্যিরা বাড়ি থেকেই বার হয় না।'

'সন্ধে! সন্ধের তো অনেক দেরি, এখন তো সবে সকাল।'

রীতিমতো হতাশ হয়ে পড়ল রিন্টু।

বাপ্পা ওকে চাঙ্গা করার জন্যে বলল, 'তুই কীরে! এখানে ব্রহ্মদত্যি ছাড়া কি আর কিছুই নেই! চল তোকে বাঁদর দেখাচ্ছি, টিয়াপাখির ঝাঁক দেখাচ্ছি। এই, পাহাড়ে উঠবি?'

তিনটি প্রস্তাবই লোভনীয়, কিন্তু রিন্টুর মাথায় এখন ব্রহ্মদত্যি ছাড়া আর কিছুই নেই, ও বিড়বিড় করে বলল, 'ধ্যাত ভাল্লাগে না, সকাল থেকে সন্ধে হতে কেন যে এত দেরি হয়!'

সন্ধে না হওয়ার জন্যে ওর মন খারাপ ভাবটা বেশিক্ষণ থাকল না অবশ্য। ইমতিয়ারপুর জায়গাটা সত্যিই

দারুণ। বাড়ির পাশেই আছে বিশাল-বিশাল তেঁতুল গাছ। সেই গাছগুলোয় যেন টিয়াপাখির মেলা বসে গেছে। পাখিগুলো খাঁচার টিয়ার চেয়ে ঢের বড় দেখতে। গায়ের রং চকচকে সবুজ, গাঢ় লাল রঙের বাঁকানো ঠোঁট। হঠাৎ-হঠাৎ বিশাল একটা দল হাওয়ায় বুক ভাসিয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে, আবার কোত্থেকে আর একটা দল উড়ে এসে বসছে গাছে। সবুজ পাতার ফাঁকে সবুজ টিয়ার ঝাঁক। রিন্টুর মনে হল, ইমতিয়ারপুরের লোকজন খুব ভালো। কত টিয়াপাখি, কিন্তু কই, কেউ একটাও টিয়া ধরছে না।

নিমগাছের পাশেই আম, জাম আর বেঁটে-বেঁটে একগাদা গাছ। সেই সব গাছে লেজ ঝুলিয়ে বসে আছে কত বাঁদর। মা-র কোলে কিংবা মা-র পাশে বাচ্চা বাঁদররাও আছে। তারা মনের সুখে বাঁদরামো করছে, কিন্তু বড় বাঁদরদের কেউ তাদের ধমকাচ্ছে না।

বাপ্পা বলল, 'পালোয়ান বাঁদরদের কেউ এখন গাছে নেই, দুপুরবেলায় এলে দেখতে পাবি।'

'কোথায় গেছে ওরা?'

'রেল-ইয়ার্ডে।'

'কেন, চাকরি করতে?'

'হ্যাঁ, সত্যিই তাই।'

রিন্টু মজা করে কথাটা বলেছিল, কিন্তু বাপ্পা গম্ভীর গলায় উত্তর দিল, 'হ্যাঁ সত্যিই তাই।' ইমতিয়ারপুরের নিয়মকানুন হয়তো সত্যিই অদ্ভুত, কিন্তু তাই বলে এটা কি কখনো সম্ভব!

রিন্টু একটু চটে উঠে বলল, 'বাজে কথা বলিস না তো, বাঁদর আবার চাকরি করতে পারে নাকি?

বাপ্পার মুখ আগের মতোই গম্ভীর। ও বলল, 'একে তুই চাকরি ছাড়া আর কী বলবি? তবে বাঁদরদের পক্ষে তো আর চেয়ার-টেবিলে বসে চাকরি করা সম্ভব নয়!'

'তার মানে! বাঁদররা তাহলে কীভাবে চাকরি করে?'

'তুই তো জানিস এখানে খুব আখ হয়, সেই আখ চালান যায় রেলের ওয়াগনে করে। পালোয়ান বাঁদরগুলো রোজ সকালে ইয়ার্ডে যায় আখ আনতে। একটু বাদেই দেখবি বোঝা-বোঝা আখ নিয়ে ফিরে আসছে গাছে। মানুষরা অফিস থেকে মাইনে আনে, আর ওরা আনে আখ—এই যা তফাৎ। আসলে দুটোই চাকরি।'

বাপ্পার কথায় রিন্টু বেশ মজা পেল। পালোয়ান বাঁদরদের তো তাহলে বেশ ভালো বলতে হয়, নিজেরাই শুধু পেট পুরে আখ খায় না, বাড়ির জন্যেও নিয়ে আসে।

শুধু বাঁদর আর টিয়াপাখিই নয়, বাড়ির সামনের পাহাড়টাও রহস্যমাখা। দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পরে বাপ্পা ওই রহস্য সিরিজের গোটাতিনেক গল্প বলতে না বলতেই ঝুপ করে সন্ধে নেমে গেল। আর সন্ধে নামতেই রিন্টু বিছানা ছেড়ে একলাফে উঠে পড়ে বলল, 'সন্ধে হয়েছে, চ এবার ব্রহ্মদত্যি দেখতে যাব।'

পাহাড়ের গল্পের মধ্যে দুম করে ব্রহ্মদত্যি এসে যাওয়ায় বেশ বিরক্ত হয়ে উঠল বাপ্পা। 'তোর খালি ব্রহ্মদত্যি অর ব্রহ্মদত্যি, ও ছাড়া এখানে যেন আর কিছুই নেই।'

'না-না, তা বলছি না, ব্রহ্মদত্যি দেখে এসে আবার পাহাড়ের গল্প শুনব।'

রিন্টুর নরম কথায় কাজ হল। বাপ্পা বলল, 'ঠিক আছে, চল।'

বাড়ির সামনের অল্প-চওড়া রাস্তাটা সরু হতে হতে মাঠের মধ্যে মিশে গেছে। মাঠ মানে ধু-ধু মাঠ, আশেপাশে খেত সূর্য আকাশের এক কোনায় লাল-হলুদ হয়ে থমকে আছে। পাখিরা ঝাঁক বেঁধে বাড়ি ফিরে

যাচ্ছে। ফুরফুর করে হাওয়া বইছে চারদিকে।

আমবাগানের কাছাকাছি আসতেই সন্ধের চমৎকার আলোটা কালো হয়ে গেল হঠাৎই। ওরা দুজন ছাড়া এখন আশেপাশে আর কেউ কোথাও নেই। ঝাঁকড়া আমবাগানের মাথায় চাপ হয়ে বসছিল অন্ধকার। সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে গা ছমছম করে উঠল রিন্টুর। ও বাপ্পার জামাটা চেপে ধরে খসখসে গলায় বলল, 'এই, কোনো ভয়টয় নেই তো?'

'কিসের ভয়?'

'না, বলছিলাম কি—ব্রহ্মদত্যি যদি চটে গিয়ে আমাদের ঘাড়টাড় মটকে দেয়!'

বাপ্পা হা-হা করে হেসে উঠে বলল, 'এ কি কলকাতার ব্রহ্মদত্যি যে ওইরকম অসভ্যতা করবে! দেখবি কত গল্পটল্প করবে। মগডাল থেকে পাকা বেল পেড়ে খাওয়াবে আমাদের।'

বাপ্পার হাসি আর কথায় রিন্টু আবার আগের মতো সহজ হয়ে উঠল। আমবাগানের ধারে বেলগাছের কাছে ওরা যেই না পৌঁছছে অমনি দূরের মাঠের মধ্যে সূর্যটা ডুবে গেল টুপ করে।

সূর্য ডুবলেও ঝাপসা আলো ছিল আকাশে। সেই আলোয় রিন্টু খুঁটিয়ে দেখে নিল বেলগাছটাকে। কই, গাছের কোথাও কেউ নেই তো! গাছের আশেপাশেও কাউকে ওর চোখে পড়ল না। রিন্টু একটু হতাশ হয়ে বাপ্পাকে বলল, 'কইরে, তোর ব্রহ্মদত্যি কোথায়?'

বলার সঙ্গে বেলগাছের মাথা থেকে কে যেন গম্ভীর গলায় বলে উঠল, 'ব্রহ্মদত্যি নয় ব্রহ্মদৈত্য।' তারপরেই গাছ থেকে শাঁ করে নেমে এল আসল ব্রহ্মদৈত্য।' তারপরেই গাছ থেকে শাঁ করে নেমে এল আসল ব্রহ্মদৈত্য।

চোখের সামনে হঠাৎ ব্রহ্মদৈত্যকে দেখে রিন্টুর বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। কিন্তু ব্রহ্মদৈত্য খুব ভালো, ও রিন্টুর হাতে একটা পাকা বেল তুলে দিয়ে মিষ্টি গলায় বলল, 'তুমিই বোধহয় রিন্টু, তাই না?'

রিন্টু ভয়ে ভয়ে মাথা কাত করল একপাশে।

ব্রহ্মদৈত্য হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি তো খুব ভালো ছেলে। বাপ্পার মুখে তোমার অনেক গল্প শুনেছি আমি। তুমি তো ক্লাসের পরীক্ষায় সেকেন্ড হয়েছ এবার। খুব ভালো ফুটবল খেল। বয়েজ ক্লাবের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছিলে?

রিন্টু ফুটবল বলতে পাগল। ফুটবলের কথায় ওর ভয়টয় উধাও হয়ে গেল। উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, রিন্টু, 'রেফারি কিন্তু চোট্টামি করে শেষের গোলটা দেয়নি আমাকে। বলে কিনা অফসাইড, আচ্ছা কী করে অফসাইড হয়—বল ছিল সুগতর পায়ে আমি ঠিক লাইন ধরে ঢুকছি—।'

ব্যস, জমে গেল গল্প। প্রথমে ফুটবল তারপর টেবিল-টেনিস, তারপর ঘুড়ি ওড়ানো—এইসবের মাঝেমধ্যে আরও কত মজাদার গল্প। গল্প পালা করে ঘুরছিল রিন্টু, ব্রহ্মদৈত্য আর বাপ্পার মুখে মুখে।

মাথার ওপর এখন মস্ত চাঁদ। সন্ধের সেই অন্ধকার কেটে গেছে একদম। গল্পপুজবে আরও কিছুটা সময় কেটে যাওয়ার পরে বাপ্পা তাড়া লাগাল রিন্টুকে—এবার বাড়ি ফিরতে হবে, কত রাত হয়েছে কে জানে!

বাড়ি ফেরার মুখে রিন্টু ব্রহ্মদৈত্যকে বলল, 'তুমি একটু দাঁড়াও তো, গল্পে গল্পে ভালো করে দেখাই হয়নি তোমাকে।'

ব্রহ্মদৈত্য গলা ছেড়ে হেসে উঠে বলল, 'ঠিক আছে, ভালো করে দেখে নাও, কলকাতায় ফিরে আবার বন্ধুদের কাছে গল্প করতে হবে তো।'

স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে আছে ব্রহ্মদৈত্য আর রিন্টু তাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে। হ্যাঁ, অবিকল ওই গল্পের বইতে পড়া ব্রহ্মদৈত্যের মতো দেখতে তাকে। পরনে ধুতি, খালি গা, গলায় ধপধবে শাদা পৈতে। বেশ সাত্ত্বিক-সাত্ত্বিক চেহারা, নিবাস বেলগাছ। কিন্তু একটা বর্ণনা তো মিলছে না। ব্রহ্মদৈত্যের পায়ে থাকে খড়ম। ওই খড়ম পায়ে ব্রহ্মদৈত্য গম্ভীর চালে পায়চারি করে প্রায়ই। হাঁটার তালে তালে শব্দ ওঠে খট-খট-খটাশ।

রিন্টু হঠাৎ বলে বসল, 'তুমি বোধহয় আসল ব্রহ্মদৈত্য নও।'

ওর কথায় ব্রহ্মদৈত্যের কপালে ভাঁজ পড়ল বেশ কয়েকটা। গম্ভীর মুখে ব্রহ্মদৈত্য বলল, 'তার মানে! কী বলতে চাইছ তুমি?'

গম্ভীর গলার কথা শুনে একটুও ঘাবড়াল না রিন্টু, বেশ ঝরঝরে গলায় বলল, 'বইতে পড়েছি ব্রহ্মদৈত্যেদের পায়ে খড়ম থাকে, তোমার পায়ে তো খড়ম নেই।'

রিন্টুর কথায় ব্রহ্মদৈত্যের মুখ একেবারে কালো হয়ে গেল। তারপর কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'খড়মের দুঃখে আমার রাতের ঘুম নষ্ট হতে বসেছে রিন্টু। এই একটা ব্যাপারে অনেকেই আমাকে খোঁটা দেয়। কিন্তু কী করব বলো? আমার কী দোষ? আজকাল আর খড়মের চল নেই। আমার পুরোন খড়মজোড়া ভেঙে যাওয়ার পরে হন্যে হয়ে খড়ম খুঁজেছি কিন্তু কোথাও পাইনি। সবাই বলে খড়ম বানানো বন্ধ হয়ে গেছে আজকাল।'

ব্রহ্মদৈত্যের কথায় অপ্রস্তুত হয়ে গেল রিন্টু। বুঝতে পারল, না জেনে ভীষণ দুঃখ দিয়ে ফেলেছে ওকে। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে রিন্টু বলল, 'ও নিয়ে তুমি একটুও মনখারাপ করো না, আমি তোমাকে একজোড়া খড়ম উপহার দেব।'

রিন্টুর কথায় ঝলমল করে উঠল ব্রহ্মদৈত্যের মুখ। 'সত্যি! সত্যি বলছ দেবে?'

'নিশ্চয়ই দেব, একশোবার দেব।' আমরা তো আরও সাতদিন ইমতিয়ারপুরে আছি, তার মধ্যেই তোমার খড়মের ব্যবস্থা করব আমি।'

ব্রহ্মদৈত্যের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এল রিন্টু আর বাপ্পা। পরদিন সকাল থেকেই দোকানে দোকানে ওরা খড়মের খোঁজ শুরু করে দিল, কিন্তু খোঁজাই সার, কোথাও খড়ম পাওয়া গেল না। সব দোকানদারই বলে, এখানে আর খড়ম বানানো হয় না আজকাল। কোথায় পাওয়া যেতে পারে, সে সন্ধানও দিতে পারল না কেউ।

খড়মের খোঁজে ছ-ছটা দিন কেটে গেল। পরদিন রিন্টুরা ফিরে যাবে কলকাতায়। ব্রহ্মদৈত্যকে খড়ম উপহার দিতে না পারার দুঃখে রিন্টুর ভীষণ মন খারাপ। কিন্তু সন্ধেবেলায় হঠাৎই একটা মতলব খেলে গেল ওর মাথায়। ও খবরের কাগজে কী যেন একটু মুড়ে নিয়ে জামার তলায় ঢুকিয়ে নিয়ে বাপ্পাকে ফিসফিস করে বলল, 'চল চট করে একবার ব্রহ্মদৈত্যের কাছ থেকে ঘুরে আসি।'

ব্রহ্মদৈত্য ওদের দেখে খুব বেশি। রিন্টু এ-কথা সে-কথা বলার পরে সেই কাগজে মোড়া জিনিসটা ব্রহ্মদৈত্যের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই নাও তোমার খড়ম।'

কাগজের মোড়কটা খুলে ব্রহ্মদৈত্য বলল, 'এটা তো খড়ম নয়, এ তো হাওয়াই চপ্পল!'

রিন্টু বলল, 'হাওয়াই চপ্পলের সোল এত মোটা হয় নাকি। এটা হংকংয়ের তৈরি নতুন ধরনের খড়ম। সোলটা তৈরি রবার আর পলিথিন দিয়ে।'

ব্রহ্মদৈত্য দোনামনা করে বলল, 'কিন্তু এটা পরে হাঁটলে তো খড়মের সেই খট-খট-খটাশ শব্দ উঠবে না।'

'কেন উঠবে না, তুমি বেলগাছের কাঁটা দিয়ে পাতলা পাতলা কাঠের টুকরো সোলের তলায় লাগিয়ে নিও, তাহলে হাঁটলে পরে আওয়াজ উঠবে—খট-খট-খটাশ।'

রিন্টুর লাগসই পরামর্শ পেয়ে ব্রহ্মদৈত্যের আনন্দ আর ধরে না। ধপধপে শাদা পৈতেটা হাতে জড়িয়ে ও বলল, 'আমি মরার আগে ব্রাহ্মণ ছিলাম, মরে ব্রহ্মদৈত্য হয়েছি, কিন্তু এখনো আমি খুব নিষ্ঠাবান। তোমাকে আমি বর দিতে চাই, বল কী বর নেবে?'

রিন্টু সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'পরের মাসে বয়েজ ক্লাবের সঙ্গে আবার আমাদের ম্যাচ, ওই ম্যাচে আমি যেন ডবল-হ্যাটট্রিক করতে পারি।'

ব্রহ্মদৈত্য বলল, 'তথাস্তু'।

পরদিন রিন্টুরা কলকাতায় ফিরে যাবে। সকাল থেকেই গোছগাছ শুরু হয়ে গেল। সবকিছুই হাতের কাছে, কিন্তু হংকং থেকে কেনা রিন্টুর বাবার নতুন হাওয়াই চপ্পলটা পাওয়া গেল না কোথাও।

বাপ্পার মা বলল, 'আমি কাল বিকেলেও দেখেছি চটিটা আলনার কাছে আছে, আর আজ নেই!'

রিন্টুর মা হাসতে হাসতে জবাব দিল, 'থাক থাক, তোমাকে আর অত খুঁজতে হবে না; ভারি তো একজোড়া চটি।'

'কিন্তু কে নেবে?'

'কে আবার নেবে ভূতে নিয়েছে।'

মা-র কথার উত্তরে আর একটু হলেই রিন্টুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ভূত না মা, ব্রহ্মদৈত্য। কিন্তু অনেক কষ্টে ও মুখের কথাটা মুখের মধ্যেই রেখে দিল।

বিকেলবেলায় কলকাতার ট্রেনে উঠল রিন্টুরা। ট্রেন ছাড়ার সময় ইমতিয়ারপুর ছেড়ে যাবার জন্যে সবারই খুব মন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু যতই মন খারাপ হোক না কেন ট্রেন তো নির্দিষ্ট সময়ের বেশি দাঁড়িয়ে থাকে না। ট্রেন ছাড়তেই রিন্টু জানলার ধারের সিটে গিয়ে বসল।

ইমতিয়ারপুরে আসার পথে যার কথা রিন্টুর সবচেয়ে বেশি মনে হয়েছিল, তার কথাই আবার নতুন করে ভাবতে বসল ও। ব্রহ্মদৈত্য এখন হয়তো বেলকাঁটা দিয়ে হংকং হাওয়াই চপ্পলের সোলে কাঠের টুকরো বসাচ্ছে।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য

চিন্ময়ী দে

সত্যমামু তার ভাগনে ভাগনিদের নিয়ে গড়বেতায় দিদির বাড়িতে গল্পের আসরে মধ্যমণি হয়ে বসেছেন। কলকাতায় রাষ্ট্রীয় পরিবহনে চাকরি করেন।

সময় পেলেই দিদির বাড়িতে আসনে। দিন কয়েক জমিয়ে আড্ডা দিতে। সেদিনটা ছিল কনকনে শীতের একটা ঘুটঘুটে অন্ধকার দিন। হ্যারিকেনের আলো চারপাশে অনেক গুলো চোখ। মামু বলল দেখ তোরা ভয় পাবি না তো? তাহলে একটা....

অপু বলল, 'ড্রাকুলাকে' ভয় পাইনি আর তোমার ভূতের গল্প?

তাহলে বলি, নে হ্যারিকেনের ফিতেটা একটু কমিয়ে দে, আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে আমি আমার কাকু পূর্ববঙ্গের চাদশি থেকে কলকাতায় এসেছি। তখন কলকাতা একেবারে আটপৌড়ে। সবে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। না ছিল বড় বড় বাড়ি মার্কেটিং কমপ্লেস বড় বড় রাস্তা উড়াল পুল। কিরকম একটা গ্রাম গ্রাম গন্ধ ছিল। সেই কলকাতার বিডনস্ট্রীটে একটা বাড়ির একটা ঘর ভাড়া নিয়ে কাকু আমি থাকতাম। পুরনো বাড়ি দুটো কল ছিল, একটা গঙ্গার জল, আর একটা টাইম কল। কেরোসিন তেলের স্টোভ কিনে কাকু আর আমি ভাত রান্না করে খেতাম। যে কোন কারণে অন্য ভাড়াটেরা মাঝে মাঝেই তিক্ত বিরক্ত হত। প্রায়ই তারা বাড়ি ছাড়ার কথা বলত। কাকা আর আমি এত ব্যস্ত থাকতাম যে এনিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করিনি। যুদ্ধের বাজারে ভৌতিক নানারকম ঘটনা প্রতিবেশিরা নানা ভাবে বোঝাতে চেয়েছিল। কাকু একেবারেই পাত্তা ছিল না।

সেদিনটাও ছিল এমনই একটা তমসাবৃত শীতের রাত। সন্ধ্যে থেকে আকাশে মেঘ জমেছে। আমি কাকু সবে খেয়ে উঠেছি। এমন সময় প্রতিবেশীদের একজন বলল আপনাদের সাথে একজন দেখা করতে এসেছে। কাকা বললেন সত্য যা তো দেখ, ডেকে নিয়ে আয়।

এরপর একজন লোক না ছেলে এসে কাকাকে প্রণাম করল।

জেঠু কেমন আছেন?

কাকা বলল ভাল? তা কোথা থেকে আসছ? তোমার নাম কি? কে তোমাকে আমার ঠিকানা দিল।

রোগাটে চেহারা শীতের জন্য একটা পুরনো ছেঁড়া কোট গায়ে হাতে কাপড়ের একটা ব্যাগ বহুদিন দাড়ি গোঁফ কামায়নি।

চেহারা দেখে বোঝা গেল খাদ্য তো জোটেই নি। বাসস্থানও নেই। আমতা আমতা করে বলল আমি আমি সুধীর বাবুর ছেলে।

আমার নাম অমিত পূর্ব বাংলা থেকে কলকাতায় এসেছি।

দাড়ান বলে একটা ছোট সাদা কাগজ ঝোলা থেকে বের করে দিল।

কাকু মন দিয়ে চার লাইনের চিঠি পড়লেন। অন্তত পাঁচবার।

তারপর একটা বাটিতে মুড়ি বাতাসা দিয়ে বললেন খাও। আর আজ কষ্ট করে নিচে এই তালাই এর উপর শোও। তারপর না হয়....

শোন কাল জামাকাপড় কাচবে দাড়ি কাটবে। আর কোন কথা না বলে তক্তোবোশের উপর কাগজ কলম নিয়ে কাজে বসলেন।

পরদিন থেকে ভোর বেলা ও বেরিয়ে যেতো রাত্রি হলে বাড়ি ফিরত। কাকু খাবার রাখত সেটা খেয়ে কাথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ত। দাড়িটা কামাবার পর মনে হয়েছিল ওর বয়স চব্বিশ পঁচিশ হবে। ওরজন্য সতরঞ্চি এল। প্রতিবেশীরা যারা চলে যেতে চেয়েছিল তারা কাকুকে পিঠে পায়েস দিল। কাকুকে অভিভাবক মানল। কাকু আসার পর ও বাড়িতে অদ্ভুত সব ঘটনা আর ঘটছে না বলে।

আমাদের প্রতিবেশি বিজন বাবু আকাশবাণীতে কাজ করতেন। তিনি কাকুকে বললেন ভাই চল না এবার সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর যাই। কাকু বললেন মানুষের সেবাই বড় তীর্থ তবে আপনি যখন অনুরোধ করছেন, সত্য যাবি নাকি? আনন্দে বললাম সবতীর্থ বার বার গঙ্গাসাগর একবার। রাত্রে খাবার সময় কাকু অমিতকে বলল যাবে নাকি গঙ্গাসাগরে।

বলল, হ্যাঁ তবে কবে?

১৩ই জানুয়ারি।

তারপর শুয়ে পড়ল।

দিনটা ১৩ই জানুয়ারি বাবুঘাট থেকে আমরা নৌকাতে উঠলাম। সেই সময় গঙ্গাসাগর যাওয়া আজকের মত এত সহজ ছিল না। বিজনবাবু নানা গল্প করছেন। কতদিনের মন বাসনা। কাকু প্রকৃতিকে দেখছে। চারিদিকে জল। দুপুরের দিকে ভাটায় একটা চড়ায় নৌকো আটকে থাকল, ঘণ্টা তিনেক। চড়াটা একটা বড় ফুটবল মাঠের সমান। জোয়ারে আবার নৌকা ছাড়ল। নৌকা ভর্ত্তি পুণ্যার্থী এমনকি তার সাতে মুরগি, ছাগল, কেরোসিনের তেলের টিন। কি বলবো আজও বুক কেঁপে ওঠে ভাবলে গা হীম হয়ে যায়। নৌকো ভারে কাত হয়ে যাচ্ছে। মাঝিরা চিৎকার করছে। এত ভার নিয়ে নৌকো তো উল্টে যাবেই তখন কত বললাম। জল শুধু জল। বিজনবাবু কাঁদতে লাগলেন। কেরোসিন তেলের টিন জলে ফেলে দেওয়া হল। চারিদিকে ক্রন্দনের রোল। কিন্তু নৌকার অবস্থা শোচনীয়। কাকু বললেন তোকে আনা ঠিক হয়নি। ভাগ্যিস অমিতটা আসেনি। মাঝি বারবার বলতে লাগল যারা সাঁতার জানেন যারা জানেন না সবার জীবন ঈশ্বরের হাতে সোঁপে দিলাম। তিনি রক্ষা করলে করবেন মারলে মারবেন।

সে সময়টার পরিস্থিতি প্রকাশের ভাষা ছিল না। শুধু অনুভব। আমি কাকুর পাশে কাকুর হাতটা ধরলাম, বিজনবাবু কাকুকে বললেন ক্ষমা করুন আমাকে, না হলে নরকে যেতে হবে। কাকু হাসলেন। এতগুলো মানুষের কথা ভাবুন, ভাবুন মায়ের কোলের ঐ শিশুটির কথা, কি রকম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখুন।

হঠাৎ এমন সময় সকলে চিৎকার করে উঠল ঐ যে দূরে একটা নৌকো। মনে হয় এদিকেই এগিয়ে আসছে। তাকিয়ে দেখি দ্রুতবেগে একটা নৌকো আসছে। তারপর যা দেখলাম অমিত সেই নৌকোতে অমিত কাকুকে প্রণাম করে বলল এসে গেছি জ্যাঠামশাই, তাড়াতাড়ি চলুন আমার নৌকোতে। অমিত এক এক করে মানুষদের ওর নৌকোতে তুলছে। বিজনকে বলল কাকাবাবু আসুন সত্য তাড়াতাড়ি এসো তোমাদের নৌকোতে ইতিমধ্যে জল ঢুকে গেছে। সবাই এমনকি মাঝিকেও ঐ নৌকোতে উঠিয়ে নিল। চোখের সামনে দেখলাম নৌকোটা নিমেষে জলের তলায় তলিয়ে গেল। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম. মনে হল জেগে স্বপ্ন দেখছি। সত্যি বেঁচে আছি তো? বিজনবাবু কাকুকে জড়িয়ে ধরে বললেন পুণ্যবান আপনি, আপনার জন্য এতগুলো লোকের প্রাণ বাঁচল। এমন সময় অমিত সকলকে কাগজের একটা করে ঠোঙা দিল। জীবন বাঁচাতে

সকলে ব্যস্ত ছিল তাই খিদের কথা কারুর মনে হয়নি, সকলে খাবার খেতে ব্যস্ত। মায়ের কোলের বাচ্চাটাকে অমিত আদর করছে। এরপরের ঘটনা আরও বিস্ময়কর। আমাদের নৌকো পৌছলো। আমরা গঙ্গাসাগরে পৌছে সকলেই পুণ্যার্জনে ব্যস্ত হলাম। সাগরের ঢেউ আর সাধুদের ভিড়ে হারিয়ে গেল অমিত। কপিল মুনির আশ্রমে সকলে সাগর স্নান করে পূজো দিল।

ফেরার সময় আমরা অমিতকে কেউ দেখতে পেলাম না। সবাই ভাবল ও আগে চলে গেছে ফিরে এসে কাকু বলল সুধীরের ছেলেটা এত ভাল হয়েছে ও সেদিন না থাকলে আমাদের যে কি ঘটত?

কিন্তু সেদিন রাত্রে অমিত এলনা। তার পরদিন না। তার পরদিনও না। এমনি করে সাত দিন অমিত না আসায় কাকু চিন্তিত হল। আমার ভয় হল আমি বললাম কাকু সুধীর কে? কাকু বলল আমার বাল্য বন্ধু ইস্কুলে এক সাথে পড়েছি। লেখাপড়ায় ভাল ছিল না। কিন্তু যেমন ছিল খেলা ধুলোয় তেমন ছিল পরপোকারি। একবার কারা যেন লাঠি দিয়ে রাস্তায় একটা কুকুরের পা ভেঙ্গেছিল। ওকে দেখেছিলাম চুন হলুদ দিয়ে কুকুরের পা ব্যান্ডেজ করতে। সেই সুধীরের পড়াশুনা হল না বলে একটা মুদির দোকান দিল। আজও মনে পড়ে একবার অমিতকে কোলে নিয়ে এসে বলেছিল বন্ধু নিজের তো পড়া হল না ছেলেটা বড় হলে তোমার কাছে পাঠাবো তখন কিন্তু ওকে রেখে সাহায্য করতে হবে। আমি বললাম পাঠিয়ে দিও। তারপর শুনেছি স্বদেশীদের সুধীর গোপনে সাহায্য করত। একবার আমার কাছে টাকা চেয়ে এক পত্রবাহককে পাঠিয়েও ছিল। আমি সাহায্য দিয়েছিলাম। তখনই জেনেছিলাম সুধীরের ছেলে পড়াশুনায় খুব ভাল হয়েছে। এরপর দাঙ্গার সময় শুনেছি বহুলোককে লুকিয়ে নৌকোতে তুলে দিয়ে পালিয়ে আসতে সাহায্য করেছে সুধীর। এরপর বহুদিন খবর রাখি না ঢাকার বি এম কলেজের ছাত্র শশী বলেছিল সুধীর নাকি নৌকোডুবিতে প্রাণ হারিয়েছে। বিশ্বাস করিনি। অমিত যখন এল তখন আমার প্রাণটা জুড়ালো। ওর বাবার চিঠিটা পেয়ে ভাবলাম কত গুজবই না রটে। কাকু বললেন আমি সুধীরকে পুরনো ঠিকানায় চিঠি দিয়েছি অমিত কেন আসছে না? অমিত কত বড় মাপের মানুষ হয়েছে সব জানিয়ে, ওকেও আসতে বলেছি। মাথায় হাত দিয়ে এরপর আরও দিন দশ বাদে একটা পোস্টকার্ড হাতে নিয়ে কাকু তক্তোপোসের উপর বসে। আমি কখনও এমনভাবে কোনদিন কাকুকে দেখিনি। জিজ্ঞেস করার সাহস হল না। এমন সময় কাকু পোস্টকার্ডটা এগিয়ে দিল।

চিঠিটা বাংলাদেশ থেকে এসেছে।

শ্রদ্ধাষ্পদেষু,

আপনার একখানা চিঠি এখানে আসিয়াছে। অবগতির জন্য জানাই সুধীর বাবু বহুদিন হইল গত হইয়াছেন। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় আপনি পুত্র অমিতের কথা লিখায়াছেন যে সে আপনার নিকটে আছে। আপনাকে জানাই ইহা কোন মতেই সম্ভব নহে। পাড়া প্রতিবেশি সকলের কাছে খোঁজ লইয়া জানিলাম অমিত বাবার সহিত কলিকাতায় তাহার পিতার বন্ধুর কাছে যাইবার সময় নৌকাডুবিতে প্রাণ হারাইয়াছে। প্রত্যক্ষদর্শী মাঝির কথায় ইহার সত্যতা জানিতে পারিলাম। বেশ কয়েকজনরে প্রাণরক্ষা করিয়া আমিও নিজে তলিয়ে যায়। এমত অবস্থায় আপনার চিঠি আমাদের চিন্তার উদ্রোক ঘটিয়েছে। কোন ঠগ লোক অমিতের নাম করে আপনার কাছে আছে। অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করুণ। নমস্কার নেবেন!

বিনয়াবনত—

শ্রী শংকর লাল চক্রবর্তী।

কাকু তোষকের তলা থেকে সুধীরের লেখা চিঠিটা আবার পড়লেন একবার দুবার দশবার।

তারপর বলল সত্য অমিত এসেছিল। অমিতই আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে। অবিশ্বাস্য হলে ও সত্য।

ভূতের বিভীষিকা

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

রুবি বাগচি

ভূতের গল্প শুনলাম খোদ এই কলকাতায় বসে। ভূততত্ত্বের স্বপক্ষে-বিপক্ষে বিস্তর আলোচনা শুনেছি এ যাবৎ। কেউ বলে ভূত আছে, কেউ বলে ভূত বলে কিছু হয় না। যারা দ্বিতীয় পর্যায়ের বিদগ্ধজনেরা, তাঁরা প্রায়ই বলে থাকেন—কই, কখনও তো শুনলাম না বক্তা নিজের চেখে ভূত দেখেছে! সবাই বলে অমুকের কাছে এই ভূতুরে ঘটনার বিবরণ শুনেছি, সেটাই বলছি তোমাদের।

অমুক আবার তমুকের কাছে এই ঘটনাটির কথা শুনেছিলো। সোজা কথা হল, কেউ স্বচক্ষে কখনও ভূত দেখেনি। সবই শোনা কথা! আর এই গল্প গুলো বলে কেন? শুধু সেনসেশান ক্রিয়েট করবে বলে, আর কেন? যত্তসব।

এনাদের শত অবিশ্বাসের পরেও কিন্তু ভূত দেখেছে ফুলি ! আমাদের বাড়ি তার আনাগোনা, তা আজ প্রায় বছর বারো হয়ে গেল। তারই জীবনে নেমে এসেছিল এক ভয়ঙ্কর দুর্যোগের ছায়া, প্রায় চব্বিশ বছর আগে।

সন্তান সম্ভবা ফুলি, বয়স সবে চৌদ্দ বছর, বাপের বাড়ি এসেছিল বড় ছেলে উত্তমের জন্মের সময়। ওর বাপের বাড়ি ছিল বেহালার জয়শ্রী কলোনীতে। আজকের জমজমাট ঐ পাড়া পঁচিশ বছরেরও আগে ছিল বন-বাদাড়। জলা-খাল-পুকুরে ভরা এক অত্যন্ত অবহেলিত ও জনবিরল জায়গা। শুধু মাত্র পাঁচ-ছয় ঘর লোকের বাস ছিল সেখানে। খেটে খাওয়া দিন আনে, দিন খায় দরিদ্র পরিবারেরা তখন বাস করত সেখানে। তাদের ঘরের সর্বত্রই ছিল পেয়ারা বাগান, শয়ে শয়ে কাঁঠাল গাছের বন- তার ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে এক প্রায় মজে আসা খাল, খালেরই একদিকে ঘন বাঁশ বন, জলা-পুকুর-এই সব কিছুর মধ্যে তখন বসবাস ছিল ফুলিদের সহ আর চারটি পরিবারের -অতীতের জয়শ্রী কলোনীতে। বাপের বাড়িতে ছিল তার ফুরফুরে এক স্বাচ্ছন্দ জীবন। কড়া নিয়মের বাধ্য বাধকতা ছিল না, ইচ্ছে মত সে ঘুরে বেড়াতো বনে- বাদাড়ে, তারপর এক সময় বাড়ি ফিরতো। বাড়ির কাছের খালপাড়, বাঁশবন, পুকুর আর -কাঁঠাল পেয়ারা বাগানে ফুলি ও তার পড়সিদের নিত্য আনাগোনা করতেই হতো অনেকটা স্নানাদি এবং নৃত্যকর্ম সারবার জন্য। তার উপর ফুলির ইচ্ছেমতো অতিরিক্ত বাইরে ঘোরাফেরা নিয়ে মা মাঝে মাঝে সস্নেহ ধমক দিতেন- ওরে বেশী দস্যিপনা করবিনা কিন্তু! একটু রয়ে সয়ে ঘোরাঘুরি কর— চৌদ্দ বছরের ফুলি মায়ের কিছু কথা শুনতো, কিছু শুনতো না। সে অশরীরী, আত্মা কি ভূত -প্রেতের অস্তিত্ব সম্পর্কে তেমন ওয়াকিবহাল ছিল না। ওদের অস্তিত্বে তেমন একটা আস্থা ছিল না তার।

রোজকার মত ফুলি সেদিনও গেল খালপাড়ে ও পুকুরপাড়ে। বেলা সাঁড়ে এগারোটা-বারোটা হবে অন্যান্য

দিনের মত সে বাঁশবন পেরিয়ে খালে নামলো প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে। তারপর, পুকুরে গিয়ে স্নান পর্ব সারা হল। কিন্তু সেদিন গোটা জায়গাটায় কিরকম যেন একটা থমথমে পরিবেশ। জন-মানব শূন্য জায়গাটায় তার অকারনেই গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠল। সে দুম্‌ করে জল ছেড়ে উঠে এলো। ঘরে ফিরল কিন্তু তারপরই তার মনটা কিরকম যেন আনচান করতে থাকল, গোটা দিন ধরে। মনের মধ্যে কিসের জন্য যেন তোলপাড় হতে থাকল। দিন ভোর সে আনমনা হয়ে রইল। মা-বাবা ভাইদের,বোনেদের সঙ্গে তেমন সহজ হয়ে কথাও বলতে পারল না। অত্যন্ত নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লো সে।

মাঝ রাত্রে তাকে আবার খালপাড়ে যেতে হলো। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে মা তার সঙ্গে ছোট মেয়েকে পাঠালেন। বাঁশবন পেরিয়ে তাকে খালের ধারে নামতে হলো। খালপাড়ে সার দিয়ে অগুনতি কাঁঠাল গাছ দাঁড়িয়ে। হঠাৎ ফুলি দেখে, সামনের কাঁঠাল ডালে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। একসময় আগুনটা নিভে গেল, আর তার পরেই সেই স্থানে দেখা গেল এক কালো বুড়িকে। শনের মত এলো চুল, ঝুলছে কোমর পর্যন্ত। চোখ জ্বলছে আগুনের ভাঁটার মত আর সে মুখ হাঁ করছে — সেখান থেকে ছুটে বেরোচ্ছে আগুনের হল্কা। ফুলি লক্ষ্য করলো বুড়ি অনেকবার মুখ খুলল, এবং প্রত্যেকবারই তার মুখ থেকে আগুনের বন্যা বেরিয়ে এলো। ফুলি মন্ত্রমুগ্ধের মত একই জায়গায় বসে থাকল। চলাফেরার স্বাভাবিক ক্ষমতা হারিয়ে গেল তার। কিছুক্ষণ পরে বুড়ি গাছ থেকে নেমে এলো। তার স্থির জ্বলন্ত দৃষ্টি ফুলির উপরে নিবদ্ধ। ক্রমশঃ সে কেমন যেন ঘষটে,, হামা দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল ফুলির দিকে। মুখ থেকে তখনও তার আগুনের হল্কা নিঃসৃত হয়েই চলেছে। এতক্ষনে ফুলির জ্ঞান ফিরল। স্বাভাবিক আত্মরক্ষার তগিদে সে একছুটে খালের উপরে উঠবার চেষ্টা করল। খানিকটা পালিয়েও ছিল, কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। বুড়ি তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফুলি জ্ঞান হারালো।

পরে ফুলি শুনেছিল, তার ছোট বোন দিদিকে পড়ে যেতে দেখে দৌড়ে গিয়ে মাকে খবর দিল। মা ও ছোট বোন তাকে কোনোও রকমে সামলে নিয়ে আসে। ওরা গুনিনকে ডেকে আনে পরদিন। সে তার ক্রিয়াকর্ম যা করার করল। ফুলি কিছুটা সুস্থ হল, কিন্তু সে সম্পূর্ণ সারল না। সেই নারী তাকে সম্পূর্ণ ছাড়ল না। ফুলি আগের মতই অন্যমনস্ক থাকতো। ঘরে তার মন কিছুতেই বসলনা। তার মনটা পড়ে থাকতো পেয়ারা বাগানে, ঝোপঝাড় ভর্তি, কাঁঠাল বন পরিবৃত, সেই খালের ধারে। যেন কোন এক অমোঘ টানে তাকে দিনে যেতে হত ঐ জায়গাটিতে, ঠিক এগারো-বারোটায় দিনের বেলা এবং মধ্য রাতেও ঐ একই কারণে। এই অমোঘ আকর্ষনকে এড়িয়ে যাবার উপায় তার ছিল না। কখনও সে যেত মাকে জানিয়ে, কখনও তাঁকে না জানিয়ে।

রোজকার মতন ফুলি সেদিনও গেল নিত্য কর্ম সারতে খালের পাড়ে, বাঁশবন পেরিয়ে। বেলা তখন সাড়ে এগারোটা-বারোটা। ভয়ে ভয়ে চার দিকে তাকিয়ে দেখলো সে। নাঃ সেদিনের বুড়িটা কোথাও নেই। নিমেষে মনটা হাল্কা-ফুরফুরে হয়ে গেল তার। চারদিক কেমন মায়াময় পরিবেশ। মজা খালের এক খন্ড জায়গায় অল্প একটু টলটলে জল। হাতের কব্জি ডুবতে পারে-এমন গভীরতা তার। আচমকা তার চোখে পড়ল ঐ জলের মধ্যে বিশাল এক জোড়া শোল মাছ। এত বড় সাইজ সে কখনও দেখেনি আগে। স্বভাবিক ভাবেই তার মনে লোভ জাগল। সে জলে হাত ডুবিয়ে জলজ্যান্ত মাছ জোড়াকে ধরতে গেল। ধরে নিয়ে গিয়ে ভেজে খাবে। কিন্তু একি! এক নিমেষে মাছটি হাওয়া। ঐটুকু গর্তের জল একেবারে মৎস শূন্য। এ কি করে হয়? ফুলি ভেবে কূল পায় না। যাক, চলে যাবে বলে সে পা বাড়ালো, অমনি মাছ দুটো গর্তের জলে কিলবিল করতে লাগল।

ফুলি ফের তাদের ধরতে গেল এবং ফের তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। ধরবে বলে ফুলিরও জেদ চেপে যায়। সে নাওয়া-খাওয়া ও সময় জ্ঞান ভুলে গিয়ে শুধু চালিয়ে গেলো মাছ ধরার বিফল খেলাটা। অনেকক্ষণ পরে মায়ের ডাকে সে সম্বিত ফিরে পেলো।

ফুলির অস্বাভবিক অবস্থা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগল। বাবা ঠেলা গাড়ির চালক, মা পাঁচ বাড়ি ঠিকের কাজ করে বেড়ান— কে লক্ষ্য করবে? ফুলি ক্রমশঃ কি হারিয়ে যাবে তার স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে? ফুলিও তার ঘোর লাগার অবস্থাকে বুঝতে পারতো না। খাল-পুকুরের দুর্নিবার আকর্ষণ-কে মেনে নিয়ে সে নিত্য হাজিরা দিতে লাগল সেখানে দুপুর ও মাঝ রাতে। রতে সে প্রায়ই দেখতো এবার একটি নারী মূর্ত্তি— চুল খোলা, মোটা-সোটা কমবয়সী বৌ- কপালে টিপ, কোলে বাচ্চা, তার দিকে কটমট করে চেয়ে আছে। তার আশে-পাশে ঘুরে বেড়ায় সে। দিনে দেখতো, রাতে দেখতো, আর দেখতো তার চোখে তীব্র ঘৃণা ও ভর্ৎসনা তার প্রতি। সেটা আরেক দিন। একজোড়া কাঁকড়া সেই একই গর্তের জলে এবং ঘটলো সেই একই খেলার পুনরাবৃত্তি। ফুলি ধরতে গেলে তারা চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যায়, আর ফুলি ফিরতে চাইলে এ এক অদভূত টানাপোড়েন ঘটে তার জীবনে। সে বাহ্যজ্ঞান হারাতে শুরু করল। কথা বলা বন্ধ হয়ে গেল তার। সে এক ঘোরের মধ্যে তলিয়ে যেতে শুরু করল। এখন সে ঐ ভীষণ-দর্শনা কালো বৌটাকে সর্বত্র দেখে বেড়ায়, বৌটা তাকে তীব্র শাসনে বেঁধে রাখে, বকা-ঝকা করে, আর চৌদ্দ বছরের ফুলি ঐ অদ্ভূতূড়ে পরিস্থিতির বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না। সে যেন এক অপ্রাকৃতিক জগতে প্রবেশ করে ফেলেছে— ক্রমশঃ ফুলি তার বাবা-মা, দাদাদের, বোনেদের অস্তিত্ব ভুলতে শুরু করল।

এই ভৌতিক পরিবেশে একদিন সে ফের দেখল-খাল পাড়ে এক জোড়া নধরকন্তি সাদা খরগোস। সেই জল ভর্ত্তি গর্তটার কাছে তারা দুটিতে দাপাদাপি করছে। ফুলি যেই তাদের ধরতে গেল, তারা দেখ্-না-দেখ্ হাওয়া। এবার তাদের ধরবে বলে এক অবুঝ জেদের বশে ভুলে গেল তার পারিপার্শ্বিকের কথা। ডুবে গেল ফুলি এক অন্ধ নেশাতে, ঐ খরগোশ তাকে ধরতেই হবে। ফুলি বলে ঐ সব কান্ড-কারখানা দেখে আমার সব সময় গা ছমছম করতো। বুঝতেই পারতাম না এসব কি ঘটছে। শোল মাছ জোড়া, কাঁকড়া জোড়া আর খরগোশ জোড়া, একে তাদের অতিকায় সাইজ—তায় তাদের ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্য-অদৃশ্য হতে থাকা। এমন সব অতি প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটতে কখনও দেখিওনি, শুনিওনি। মাকে গিয়ে বলতাম প্রথম দিকে ঐ সব ভৌতিক ঘটনার কথা, আর মা ভীষণ রেগে গিয়ে বলতেন— দস্যি মেয়ে! তোকে কতবার বারণ করেছি না যেতে হবে না ঐ সব অলক্ষুণে জায়গায়? কেন কথা শুনিস না তুই বল্?— মাকে কিছুতেই বেঝাতে পারতাম না আমার কোনোও উপায় ছিল না, না গিয়ে। এক অমোঘ, দুর্নিবার টান আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতো ঐ বিশেষ জায়গাটিতে, আর সেই টানকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আমার আদপেই ছিল না। অদ্ভূত ব্যাপার ছিল এই যে আমাকে যেতেই হত খালপাড়ে প্রকৃতির ডাকে, দেখতে হত ছেলে কোলে টিপ পরা ঐ ভীষণ দর্শনাকে যে আমাকে চিবিয়ে খেতে উন্মুখ হয়ে থাকতো। তাকে বাড়িতেও দেখতে আরম্ভ করলাম— দিনে দুপুরে। আশ্চর্য! তাকে আমি ছাড়া কেউ দেখতেও পেতো না, আমি ভাষাজ্ঞান হারিয়ে ফেলে ছিলাম ততদিনে—তাই বাড়ির কারোকে ঐ নারীর উপস্থিতির কথা বুঝিয়ে বলতে পারতাম না। আমাকে বোবা রোগে ধরল আমার রক্তাল্পতা বেড়ে গেল ভীষণ করে। শরীর এতো খারাপ হয়ে গেল যে সবাই আমাকে ভর্ত্তি করে দিল বিদ্যসাগর হাসপাতালে। আমি টের পেতাম লোকে আমাকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে— গায়ে, পীঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, খাইয়ে দিচ্ছে কিন্তু তাদেরকে আমি কিছুই বলতে পারতাম না, তখন কথা বলতে অপারগ হয়ে

গিয়েছিলাম আমি। সব সময়ে ঐ ভীষণ বৌটা আমাকে আগলে রাখতো। কি তীব্র শাসানি ছিল তার— আমাকে চোখ রাগিয়ে বলত এ্যাই, শিগ্‌গির নাম! নাম বলছি আবার হাসপাতালের খাটে আয়েস করে শোওয়া হয়েছে, নাম তোর ঐ 'সীট' থেকে! কথা শুনতাম না বলে সে ফিরে যেন পাখির মত উড়ে এসে আমার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো, আর রক্ত চুষে খেতো। আমাকে তিন বোতল রক্ত দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ঐ বৌটা যেন সব রক্ত টেনে নিতো। ডাক্তার বললেন— একে আর প্রাণে বাঁচানো যাবে না। শুনে মায়ের কি আকুল কান্না। ইতিমধ্যে ছেলের জন্ম হয়ে গেল সেই একই অবস্থায়। আঁতুড়ের শিশুকে নিয়ে গেল আমার 'জা', কিন্তু আমার মরণাপন্ন অবস্থার কারণে আমাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়লো না। আমার কথা বন্ধ হয়ে গেল, আমি তলিয়ে গেলাম এক অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর আবর্ত্তের মধ্যে। আমার মা যে সব বাড়িতে কাজ করতেন সেই সব বাড়ি থেকে সবাই আমাকে দেখতে হাসপাতালে আসতেন। একদিন আমাকে দেখতে এলেন যোগেন দাঁর স্ত্রী শ্রীমতী দীপ্তি দাঁ। মা এনাদের বাড়িতে কাজ করতেন। এই দম্পত্তি অত্যন্ত ঈশ্বর ভক্ত ছিলেন। বাড়িতেই এঁরা রাধা-গোবিন্দর মন্দির বানিয়ে অত্যাধিক নিষ্ঠা এবং এবং ভক্তি সহকারে ঠাকুরের নিত্য সেবা নিয়ে থাকতেন। আমাকে দেখেই দীপ্তি বৌদি সবাইকে বললেন— আরে! এর কিন্তু কোনোও অসুখ করে নি। একে অন্য রোগে ধরেছে, তিনি আমার বাবাকে বললেন যে, যদি বাবা একটি গাছ ফোটা, নিখুঁত ও টাটকা জবা ফুল আনতে পারেন এবং একটি পিতলের গেলাসে লোহার পেরেক রেখে, পাঁচটি পুকুর থেকে এক নিঃশ্বাসে জল সংগ্রহ করতে পারেন এবং সেই জলের একটি ফোঁটাও মাটিতে পড়তে পারবেনা, তাহলে আমি সেরে যাব। আর অতি অবশ্যই একান্ন টাকা দিয়ে বাবাকে আমার জন্য একটা মাদুলী নিতে হবে। মাদুলীর দামের আধিক্য নিয়ে কোনোও প্রশ্ন করা চলবে না। বাবা তাঁর আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করলেন। ঐ মন্ত্রপুতঃ জল দীপ্তি বৌদি আমার গায়ে ছিটিয়ে দিলেন এবং মাদুলীটা আমাকে পরিয়ে দিলেন। এর আধ ঘন্টার মধ্যেই আমি সুস্থ হাসপাতালে নিজের শয্যায় উঠে বসলাম। আমি মুমূর্ষ রুগি যাকে ডাক্তার জবাব দিয়ে ছিলেন, খাটে সটান বসে থাকতে দেখে হাসপাতালের নার্স, আয়ারা এবং সিস্টার সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। আজ যে আমি বেঁচে আছি ও সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে ঘর-সংসার করছি, বলতে পার সব কিছুই দীপ্তি বৌদির দয়ায় হয়েছে। তবে তিনি আর বেঁচে নেই। ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

ফুলিকে প্রশ্ন করলম— কিরে, এই গল্পের মধ্যে নির্জলা সত্য কতটা আছে?

ফুলি বলল— এই ঘটনার সাক্ষী এবং প্রত্যক্ষ দর্শীরা আজও বেঁচে আছে। বলতো, তাদের ডেকে আনতে পারি।

সেকী ?

ভূতদাদু

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

ক'দিন ধরেই অনির খুব মন খারাপ। কিছুই যেন ভাল লাগে না। অনির এই মন খারাপটা করে প্রতিদিনই স্কুল থেকে ফেরার পর। আসলে অত্যাধিক চাপ স্কুলে। তারপর বাড়ি এসে চুপচাপ। তাকে স্কুলের গাড়ি মেন রোডের মোড়ে নামিয়ে দিয়ে যায়। বাড়ির কাজের পিসি তাকে নিয়ে আসে বাড়িতে। তারপর হাতমুখ ধুয়ে নিলে খাবার দেয়। অনির খাবার খেতেও ভাল লাগে না। মনে হয় এক ছুটে বাইরে চলে যায় খেলতে। যদিও খেলার মাঠ আশেপাশে নেই। সারা চত্বরটা জুড়ে শুধু উঁচু উঁচু ফ্ল্যাট আর ফ্ল্যাট। অনির ভীষণ রাগ হয়। মা- বাবার ওপর।

অনির মা- বাবা দু' জনেই চাকরী করেন। তাঁদের সঙ্গে অনির দেখা হয় ভোরবেলা আর রাতে। ভোববেল মা জোড় করে ওকে তুলে রেডি করে দেন। সেখানেই আসে স্কুলের গাড়ি। এর মধ্যিখানে শুধু মা- বাবার নানা উপদেশ। আর রাতে ফিরে অনির স্কুলের খাতা চেক। তার আগে অবশ্য দু' জন মাস্টারমশাই এসে তাকে পড়িয়ে যান। এসব নিয়ে অনি ভীষণ বিরক্ত।

অন্যান্য বন্ধুদের কথা মাঝে মধ্যে ভাবে। যাদের সঙ্গে ও স্কুলে পড়ে। তাদের মা ওদের নিতে আসে। অথবা বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকে। অনির ইচ্ছা করে এসব ফেলে ছুটে পালাতে। সেখানে খেলা আর খেলা।

এব ভাবনার মধ্যেই কাজের পিসি খাবার নিয়ে আসে। অনির খেতে ইচ্ছে করে না। সে চিৎকার করে, খাবো না যাও। খাবার নিয়ে যাও। আমি খেলতে যাবো।

কাজের পিসি অবশ্য রাগ করে না। ক্লাস ফোরের ছাত্র অনিকে কাছে ডাকে কজের পিসি। বলে, রাগ করতে নেই বাবা,খেয়ে নাও। মা-বাবা জানলে এসে বকাবকি করবে। অনি তবু গোঁ ধরে বসে থাকে। কাজের পিসি অনেক বোঝাবার পর অনি খায়।

আস্তে আস্তে সন্ধ্যে হয়ে আসে। অনি নিউ টাউন এস্টেটে থাকে। বিশাল এলাকা জুড়ে শুধু উঁচু উঁচু ফ্ল্যাট আর ফ্ল্যাট। অনি তাদের তিনতলার ফ্ল্যাট থেকে দেখে আর অবাক হয়ে যায়। কাজের পিসি এখন রান্না ঘরে রান্না করছে। আজকে মাস্টার মশাইও পড়াতে আসেন নি। অনি যে ঘরে পড়ে, সেই ঘরে একা বসে আছে।

এমন সময় ঘরে ঠুক করে আওয়াজ হল। অনি বিছানায় বসে ছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে চাইতেই অনি অবাক এবং ভয়ে চিৎকার করতে যাচ্ছিল। ঠিক তখনই অনি শুনল, চিৎকার করো না। সবাই জেনে যাবে। আমায় ভয় পেও না। আমি তোমার দাদু হই।

অনি ভাল করে চেয়ে দেখল। এক বৃদ্ধ মানুষ। সারা মাথা জুড়ে সাদা চুল। আবার সাদা মোটা গোঁফ। চোখে কলো ফ্রেমের চশমা। পরনে ধুতি পাঞ্জাবী। হাতে একট লাঠি। অনি অবাক হয়ে ওদিকে চেয়েই আছে।

কি গো অনিবাবু, ভয় কেটেছে। আমি তোমার দাদু। কিন্তু তুমি ঢুকলে কি করে? ঘরে তো খিল দেওয়া। আমি যে জাদু জানি।

মানে ম্যাজিক? আমায় শেখাবে তো? মা-বাবাকে চমকে দিয়ে ভ্যানিস হয়ে যাবো। অনি বিছানা থেকে নেমে দাদুর কাছাকাছি আসে।

নিশ্চয় শেখাবো। সেই জন্যেই তো এলাম।

কিন্তু আমার দাদুকে তো আমি কোনদিন দেখিনি। অনি গম্ভীর হল। তাতে কি আছে! আমিও তোমার দাদু। তোমার মন খারাপ বলেই তো এলাম। কিন্তু আমি এসেছি কাউকে বলবে না। এমন কি মা- বাবাকে-ও নয়।

সে না হয় হল। কিন্তু আমার মন খারাপ কেন জানো? অনিকে বেশ ছটফটে লাগল।

জানি । আমি সব জানি। তুমি খেলতে পাও না। শুধু কাজ আর কাজ। সকাল থেকে রাত্রি। পিঠে বইয়ের বোঝা। তোমার মা-বাবা দু' জনেই চাকরী করে। তোমায় কেউ সঙ্গ দেয় না। তুমি খুব একা তাইতো?

ঠিক তাই দাদু। আচ্ছা, তুমি আমার একেবারে নিজের দাদু তো? অনির গাল ধরে আদর করে দাদু বলল, হ্যাঁ, একেবারে নিজের।

তাহলে আমাদের এখানেই থাকবে তো? আমার সঙ্গে। দেখ না, আমার সঙ্গে কেউ খেলে না, বাবাও নয়। ওরা বড্ড বাজে। অনি অভিমানে ফুলে উঠল। না দাদুভাই। মা-বাবা কারো বাজে হয় না। ওরা তোমার ভাল চান। তাই তো এতকিছু করেন। আর আমি তো এখানেই থাকতাম। এখনও থাকি।

এখানে? কই কোনো দিন তো দেখিনি তোমায়! দেখবে কি করে। আমি দেখা না দিলে কে-উ দেখতে পায় না আমায়।

তা'লে যে বললে এখানেই থাকো! অনি দাদুর একেবারে কাছে এগিয়ে এল।

শুনবে? তাহলে সেই কথা তোমায় শোনাই। দাদু ওই ঘরের একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। তার কাছেই বসল অনি।

শোনো অনি, আমার নাম কমল কুমার বসু। এই যে, তোমরা যে ফ্ল্যাটটায় থাকো, এটাই ছিল আমার বাড়ি। তবে তখন এখানটা ছিল বিশাল বাগান। সেই বাগানের মধ্যেই বিশাল দোতলা বাড়িতে আমরা থাকতাম। আর এই যে সামনে বিশল জায়গা জুড়ে ফ্ল্যাট দেখছ, এখনে ছিল ফুটবল খেলার মাঠ। কত ছেলেরা এই মাঠে খেলত। আর, সকালে. বিকালে আমি সবুজ মাঠে হাঁটতাম। কি আনন্দ ছিল। একমাঠ সবুজ আর রোদ্দুর। গরম কালে ফুরফুরে হাওয়া।

তুমি কি একা থাকতে দাদু?

না গো অনি বাবু। তোমর দিদিমা থাকত। আমার দুই ছেলে থাকত, সে এক হৈ চৈ। কণ্ঠ ভারী শোনাল কমলবাবুর।

তোমার ছেলেরা এখন কোথায়? দিদিমা কোথায়? গল্প শুনতাম রাক্ষসদের!

তোমার দিদিমার কথা পরে বলব। আর আমার দুই ছেলে? তারা মস্ত চাকরী করে। দেশের বাইরে তাই আমার এই সাধের বাগানওলা বাড়ি তারা একদিন প্রোমোটারকে দিয়ে দিল। ব্যাস। সব কিছু হাওয়া।

তুমি দুঃখ করো না দাদু। আমাদের বাড়িতেই তুমি থাকবে। আমি মা-বাবাকে বলে দোব। অনি কমলবাবুর হাত ধরে ফেলল।

শোন অনি, তুমি দুঃখ করো না। তোমায় রোজ বিকেলে এসে একটা বড় মাঠে খেলতে নিয়ে যাবো। সে মাঠ কোথায় দাদু? অনি উৎসুক হল।

বেশিদূরে নয়। কলকাতায়। গড়ের মাঠে। তাছাড়া আর মাঠ কোথায় ছিল বল। দেখবে কত রকম লোকজন সেখানে। কত রকম খেলা।

সে তো অনেক দূর। যদি মা-বাবা বকে?

দূর আমি নিমেষে তোমাকে নিয়ে যাবো সেখানে। খেলার পর আবার বাড়ি পৌঁছে দেব, তোমার মা-বাবা আসার আগেই। কেউ টেরটি পাবে না।

সেই ভাল দাদু। থেকেই যাবো।

বেশ। কিন্তু কাউকে বলবে না। আর ভাল করে পড়াশুনা করবে। জীবনে বড় হতে হবে না? তবে হ্যাঁ মনকে কিন্তু ঠিক রাখবে।

এমন সময় দরজা খোল। তাড়াতাড়ি খোল। অনির মা-বাবার কণ্ঠস্বর।

অনিবাবু দরজা খুলে দাও। কাল আবার আমি আসব। তোমায় খেলতে নিয়ে যাব গড়ের মাঠে। ভালো করে থাকবে। আজ আসি। দাদু ভ্যানিস হয়ে গেল। অনি হাঁ করে দরজার দিকে চেয়ে আছে।

আবার দরজায় ধাক্কা। অনি দরজা খুলে ফেলল। কতদিন তোমায় বলেছি, একা একা দরজা বন্ধ করে থাকবে না। থাকতে নেই। কিছু হলে! পড়তে বসেছিলে? শুনলাম মস্টারমশাই আসেন নি!

অনি শান্ত কণ্ঠে জবার দিল, হ্যাঁ মা মস্টারমশাই আজ আসেন নি।

তুমি অঙ্কগুলো করে রেখেছ?

অনি চমকে উঠল। এই রে, দাদুর সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে অঙ্কর কথাই ও ভুলে গেছে। ও চুপ করে রইল।

মা-বাবা দুজনেই বললেন, কি হল, কথা বলছ না কেন? হঠাৎ ছুটে গিয়ে ওর মা খাতা খুললেন। বাঃ! চমৎকার অঙ্ক কষেছ তো । প্রতিটা ঠিক হয়েছে। মা এগিয়ে গেলেন অনির দিকে। তারপর বুকে টেনে বললেন, আমার সোনা ছেলে।

অনি তখন আকাশ থেকে পড়ার মত অবাক। ও তো অঙ্ক করে নি। দাদু করে দিয়েছে? কিন্তু দাদু তো খাতা খোলেনি। কালকে জিগ্যেস করতে হবে।

কাজের পিসি অবাক হল । আজকে অনি স্কুল থেকে ফিরে টুঁ শব্দটি করল না। লক্ষী ছেলের মত সবকিছু করে নিল। তারপরই ঘরে ঢুকে পড়ল। কাজের পিসি নিজের কাজে চলে গেলেন।

একটু পরেই কমলবাবু এলেন। আনন্দে থুরি লাফ খেল অনি। দাদু আমি রেডি। বাঃ, চল বেরিয়ে পড়ি।

দাদু, কালকে আমার অঙ্কগুলো কি তুমি করে দিয়েছিলে? হ্যাঁ অনিবাবু। শুধু কাল ন্যেই করে দিয়েছি। মানে রোজ আগের কাজ আগে করবে। ভাল করে লেখাপড়া করা চাই। তার কিছু।

কিন্তু তুমি তো একটা খাতা খোল নি। অনি অবাক করে বলল।

তোমায় তো বলেছি অনি। আমি ম্যাজিক জানি।

আমায় ম্যাজিক শিখিয়ে দেবে দাদু?

নিশ্চয় শেখাব। তবে আগে বড় হও। এবার চারদিক চেয়ে দেখ। একি দাদু। আমি কোথায় এলাম! যেদিকে চাই কি বড় মাঠ! কত মনুষজন। কত ছেলেরা একসঙ্গে খেলছে। ওদিক দিয়ে হুসহুস করে গাড়ি যাচ্ছে। এ কোথায় দাদু! কি করে এলাম! আমি তো ঘরে তোমার সঙ্গে গল্প করছিলাম!

অনিবাবু, এটাই হল গড়ের মাঠ। কলকাতায়, নাও খেল। যত পার এখন সন্ধ্যে হতে অনেক দেরি।

অনি বলল, তুমিও আমার সঙ্গে খেলবে দাদু?

আমি কি পারি। আমার বয়স হয়েছে না? যাও খেল। দাদু বসে পড়লেন।

অনি খেলল অনেকক্ষণ। তারপর ছুটে এল। দাদু, হাঁপিয়ে গেছে। তিনি এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলল।

চল এবার বাড়ি যাই অনি। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, মা বাবা এসে পড়লেন। তোমায় পড়াশুনা করতে হবে। স্যার আসবেন, হ্যাঁ, চলো দাদু?

অনি দেখল ও বাড়িতে চলে এসেছে।

এবার আমি আসি দাদুভাই। কমলবাবু বললেন।

চলে যাবে দাদু? কাল আসবে তো?

আসবো। তুমি একটু বড় না হওয়া পর্যন্ত।

কিন্তু দাদু, তুমি হঠাৎ করে ভ্যানিস হয়ে যাও কিভাবে?

দাদু হাসলেন, আমি যে জীবন থেকে ভ্যানিস হয়ে গেছি বাবা।

অনি ঠিক বুঝতে না পেরে দাদুর দিকে চাইল।

এখন নয়। বড় হলে বুঝবে। একথার মানে। দাদু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

আবার বললেন, মনে রেখ অনি। মানুষ, প্রকৃতি আর মানসিকতা, এই তিন যতদিন থাকবে ততদিন সবাই থাকবে। অনেক কিছু হারিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে বিশেষ করে প্রকৃতি আর মানসিকতা। এগুলোকে বাঁচাতে হবে।

কি করে দাদু?

আবার আসবো। আস্তে আস্তে বোঝাব তোমায়। যাতে তুমি আধুনিকতার যাঁতাকলে যন্ত্র না হয়ে যাও। চেষ্টা করব, যাতে মানুষ হও।

অনি এ কথার ভাবগম্ভীর অর্থ বুঝল না, হাঁ করে দেখল। দাদু আজকের মত হাওয়ায় আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেলেন।

অন্যরকম ভূত

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

শীতভেজা সে এক আশ্চর্য সকালে মরাই ছাইতে ছাইতে গল্পটা শুনিয়েছিল পঞ্চু ঘরামি। এলেভূতের গল্প। এলে ভূত যে কী জিনিস তখনও জানতাম না। কিন্তু পঞ্চু ঘরামির গল্প বলার ধরন এমনই যে ভূতপ্রেত সব জ্যান্ত হয়ে ঘোরে চোখের সামনে। শিরশির করে ওঠে গা-হাত-পা-শরীর।

এখন ঘোর শীতকাল। 'পোষের শীত মোষের গায়/মাঘের শীত বাঘের গায়' এরকম একটা প্রবচন আমাদের প্রায়ই বলতেন ঠাকমা। একন পৌষের শেষে সেই শীত কাঁপ ধরিয়ে দিচ্ছে দুশো বত্রিশখানা হাড়ে। তার মধ্যে একটু আগেই এই সাতসকালে দু-গেলাস নলেন রসে পাটকাঠি ডুবিয়ে চোঁ চোঁ করে সাবাড় করেছি। তাতে শীতের দাঁত আরও ধারাল আরও তীক্ষ্ণ হয়ে ফোটাচ্ছে সারা গায়ে। একটা ছোটমোটো শাল জড়িয়ে রেহাই পেতে চাইছি শীত থেকে। শালে কুলোচ্ছে না বলে বইখাতা ফেলে ছুটেছি পুকুরপাড়ে রোদ পোহাতে। পুকুরের চারপাশে নতুন চামরমণি ধানের গোছ ডাঁই হয়ে জমে আছে ক'দিন ধরে। একপাশে ঝাড়াই মাড়াই হচ্ছে সেই ধানের গোছ। তার খড় টাল হয়ে জমা হচ্ছে খামারের পাশে। আর সোনালি ধান মাথায় মাথায় চলে যাচ্ছে মরাইতে।

পুকুরের চারপাশে তাই নতুন ধানের মিষ্টি গন্ধ। সেই গন্ধের ওম নাকের লতিতে নিয়ে বসে পড়ি একগলা রোদের মধ্যে। মরাইয়ের ধার ঘেঁসে। নতুন মরাইটা বেশ বড়সড় করে বাঁধা হচ্ছে এবার। সেখানে পঞ্চু ঘরামি মরাইয়ের উপর বসে, আর নীচে থেকে নতুন খড় জোগান দিচ্ছে তার ছেলে ফড়িং।

তার মধ্যেই আবার ভূতের গল্প। তাতে তো শরীরের কাঁপ আরও বেড়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা হল না পঞ্চু ঘরামির গল্প বলার ভঙ্গিতে। বরং রক্ত আরও চলকে ওঠে, গায়ের লোম খাড়া হয়।

পঞ্চু ঘরামি এ তল্লাটের নামকরা ঘরামি। তার চেহারাটা যেমন দশাসই, তেমনি তার হাতের বাইসেপ। তার বুকটাই শুধু বিয়াল্লিশ ইঞ্চি। তার জন্যে পঞ্চু ঘরামিকে কখনও ডনবৈঠক দিতে হয়নি বা বার্বেল ভাঁজতে হয়নি। হাতে পায়ের বেশ কিছু শিরা নারকেলের দড়ির মতো পাকিয়ে রয়েছে যা অনেক দূর থেকেই দৃশ্যমান।

পঞ্চু ঘরামি সম্পর্কে নানা গল্প লোকমুখে প্রচারিত, তার মধ্যে একটা হল গাঁয়ে ডাকাত পড়া ও একচড়ে ডাকাত সর্দারের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। সেবার চারপাশে হইচই ফেলে ডাকাতরা যে-বাড়িতে ঢুকছে, লুটপাট করে নিঃস্ব করে দিচ্ছে মনের সুখে। তাদের বাধা দেবে তেমন পুরুষমানুষ কই গাঁয়ে। এক পঞ্চু ঘরামি আছে কিন্তু সে তো ঘুমিয়ে পাহাড়। পঞ্চু ঘরামি রাতে ঘুমোলে নাকি কেটে ফেললেও উঠতে পারে না। ডাকাত পড়ায় সেবার কীভাবে যেন তার কানের মধ্যে জল ঢেলে ডেকে তোলে গাঁয়ের মানুষ। পঞ্চু ঘরামির গায়ের জোর কত সে-গল্প পাঁচগাঁয়ের মানুষ জানে, জানে ডাকাতরাও। কিন্তু লোকে এও জানে তার কুম্ভকর্ণপ্রতিম ঘুমের গল্পও। ডাকাতরাও সেই কাহিনি সম্পর্কে সচেতন বলেই এ গাঁয়ে ডাকাতি করার সাহস পেয়েছে। কিন্তু তারা ভাবতে পারেনি পঞ্চু ঘরামি জেগে উঠবে মধ্যরাতে। পঞ্চু ঘরামি জেগে উঠে কিছুক্ষণ সময় নিল ব্যাপারটা

বুঝতে। তারপর এক হুঙ্কার দিয়ে ছুটল সেই বাড়িটার দিকে যেখানে তখনও লুটপাট চলছে ঘোরতরভাবে। ডাকাতরা হঠাৎ ঘটনাস্থলে পঞ্চু ঘরামিকে আবির্ভূত হতে দেখে বেশ থতমত। নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করে লুটপাটের মাল ফেলে ছুট লাগাল পড়িমরি করে। পঞ্চু ঘরামির চোখে তখনও কিছু ঘুম। নইলে ডাকাতদের ধরতে তার দু মাইল ছুটতে লাগে! শেষে ডাকাতদের সর্দারকেই জাপটে ধরতে পারল আর এমন একখানা থাপ্পড় লাগাল যে তাতেই স্বর্গলাভ হয় তার। তারপর থানা-পুলিশ হয়ে কী ছিরকুট্টি কাণ্ড!

সেই গল্প আমাদের শোনাতে শোনাতে পঞ্চু ঘরামি হেসে বলে, সে সব কী দিনকাল ছেল, দা'ঠাকুর! লোহা চিবিয়ে খেতে পারতাম।

সেই পঞ্চু ঘরামির বয়স এখন কত হবে তা আর জিজ্ঞাসা করা হয়ে ওঠে না। কিন্তু এখনও তার চেহারা দেখে ডাকাত দল কেঁপে উঠবে নিশ্চিত।

শুধু যে ডাকাত মারার গল্পই তার ঝুলিতে তা কিন্তু নয়। মাঝেমধ্যে কাজে বা অকাজে এসে কত যে গল্প শোনায় তার সীমাসংখ্যা নেই। কখনও শ্মশানকালিতলার মামদো ভূতের গল্প, কখনও সুন্দরবনে গিয়ে বাঘের মুখে পড়ার গল্প, কখনও কখনও বাজি ধরে এক ধামা নাড়ু এক আসনে বসে খাওয়ার গল্প, কখনও এক পাগলা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বিপত্তির গল্প।

সেই পঞ্চু ঘরামি আজ হঠাৎ মরাই ছাইতে ছাইতে বলতে শুরু করল এলেভূতের গল্প। তখন ভোরের শীত পেরিয়ে দিনের রোদ ঢুকে পড়ছে তার ফনা তুলে। শীত কমতে শুরু করেছে গা থেকে। তবু শালের ওম গায়ে নিয়ে আমি বলি, এলে ভুত! সে আবার কী?

—এলে ভূত কী তা কি আমিই জানতাম? শুনেছিলাম আমাদের গাঁয়ের লক্ষ্মণখুড়োর কাছে।

কে লক্ষ্মণকুড়ো তা জিজ্ঞাসা করলে এখন আবার সেই কাহিনি সাতকাহন শোনাতে বসবে পঞ্চু ঘরামি। তাতে এলেভূতের গল্পটা মাঠে মারা যাবে।

কিন্তু পঞ্চু ঘরামি সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে দিল না, বলল, কে লক্ষ্মণখুড়ো তা জানতে চাইলে না তো, দা'ঠাকুর!

বাধ্য হয়ে বলতে হল, কে ছিলেন তিনি?

—সে এক ভারি রগুড়ে লোক। থাকত আমাদের গাঁয়ে। আমাকে দেখলে বলত, পঞ্চু, তোর এরকম পাহাড়ের মতো শরীর! তুই ঘর ছেয়ে নষ্ট করলি জেবনটা! তোর হওয়া উচিত ছেল মস্ত ব্যায়ামবীর। রেবা রক্ষিতের মতো বুকে হাতি তুলতে পারতিস। তাতে তোর বাড়িতে পয়সা রাখার জায়গা হত না!

রেবা রক্ষিত যে একজন শক্তিমতী মহিলা, সার্কাসে বুকের উপর হাতি তুলে শিহরিত, রোমাঞ্চিত করতেন দর্শককে সে কথা বহুবার শুনেছি আমাদের বাবা-কাকাদের মুখেও।

রেবা রক্ষিতের প্রসঙ্গ তুললে হয়তো তাকে নিয়েই এখন দশকাহন ফাঁদতে বসবে পঞ্চু ঘরামি। তার চেয়ে এলে ভূতেই ফিরে যাওয়া যাক এই ভেবে বলি, তারপর পঞ্চুদা, এলেভূতের কী হল?

—তো লক্ষ্মণ খুড়োর কথা বলছিলাম না? আমার কাছে আর কী শোনছ! তেনার কাছে গল্প শুনলে তিন জনম কেটে যাবে, বুঝলে, দা'ঠাকুর! তিনি নাকি সুন্দরবনে মাছ ধরতে গিয়ে একবার গোটা একটা বাঘ মেরে ছিলেন বলে খুব গর্ব ছিল তেনার।

বাঘের গল্প আমার কাছে যদিও খুব প্রিয়, কিন্তু এখন এলেভূতটা আমাকে এমন উসকোচ্ছে যে, সুন্দরবনের বাঘকেও ঠেলে সরিয়ে দিই একপাশে। বলি, তুমি এলেভূতের গল্পটাই আগে বলো, পঞ্চুদা।

—তো সেই লক্ষ্মণখুড়োর কাছেই শুনেছিনু এলেভূতের কথা। বলে পঞ্চু ঘরামি একটু থামে। তার গল্পে আবার সেই লক্ষ্মণখুড়োর কথাই ঘুরেফিরে আসে দেখে মুখ কিসমিস করে তাকিয়ে থাকি। কার গল্প শুরু হবে এবার, লক্ষ্মণখুড়োর, না এলেভূতের!

না, এল দুজনেই। একজনের পিঠে আর একজন চড়ে।

—বুঝলে, দা'ঠাকুর, সেই লক্ষ্মণখুড়ো বলেছিল এলেভূত নাকি জলের মধ্যে থাকে। এলোমেলো ঘুরে বেড়ায়, এক একবার ভুস করে ঠেলে ওঠে উপরে, দপ করে আগুন জ্বালায়, আবার আগুন নিবিয়ে ভুস করে ডুবে যায়। আগুনটা নাকি তার নিঃশ্বাস। কখনও জলের মধ্যে একলা মানুষ বাগে পেলে তার ঘাড় ঠেসে ধরে জলের তলায়। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

এতক্ষণে বুকের মধ্যে হাপিসটিপিস করতে থাকে। কী জানি কেমন সেই এলেভূত!

—বুঝলে, দা'ঠাকুর, এলেভূতের নাম জানতাম, কখনও চোখেও দেখিনি তাকে, সেই এলেভূতের পাল্লায় পড়ব তা স্বপনেও ভাবিনি।

চমকে উঠে বলি, এলেভূতের পাল্লায় পড়লে? কী সর্বনাশ!

—সব্বোনাশ বলে সব্বোনাশ! যাকে বলে সাড়ে সব্বোনাশ!

—তা কোথায় পেলে সেই এলেভূতকে?

—বুঝলে, সেবার লালতাকুঁড়ি গাঁয়ে গেছি ষাঁড়ের লড়াই দেখতে। যে যদি দেখতে ষাঁড়ের লড়াই, তুমি নিশ্চিত ভিরমি খেয়ে যেত!

এলেভূতের মধ্যে ষাঁড়ের লড়াই ঢুকে যাক তা আমি একেবারেই চাই না, কিন্তু পঞ্চু ঘরামির কাছে গল্প শুনতে গেলে মাঝেমধ্যে বেলাইন হবেই তার গল্প। আসলে গল্পের পেটে গল্প থাকে পঞ্চু ঘরামির ঝুলিতে। কিন্তু না, এবার ষাঁড়ের লড়াইকে রেহাই দিয়ে ফিরে এল এলেভূতের গল্পে।

—ষাঁড়ের লড়াই দেখে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল সেবার। অন্তত পাঁচক্রোশ পথ ফুরুতে হবে জোর পায়ে হেঁটে। হয়তো পৌঁছোতে ভোর হয়ে যাবে। তাই বড় রাস্তা দিয়ে নয়, সরাসরি মাঠ ভেঙে পেরোচ্ছি অতখান পথ। সঙ্গে গাঁয়ের আরও জনাছয়েক ছেলে। সবারই জোয়ান বয়স। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যাই চেনাই দহের বিল। সেই বিলের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে কে যেন বলল, 'পঞ্চুদা, এখেনে বাবলাঘাঁটি গাঁয়ের তিনু সর্দারের লাশ পাওয়া গিয়েছিল না?' শুনে মনে পড়ে গেল গল্পটা। না, ঠিক গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। পা-দুটো উপরে ভেসে আছে, মুণ্ডসহ শরীরটা নীচে।

সেই তিনু সর্দারের লাশের গল্প শুরু হবে ভেবে আঁতকে উঠি। যদিও জানি পঞ্চু ঘরামি যে-গল্পই শুরু করবে তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত দম বন্ধ হয়ে থাকবে। কিন্তু তিনু সর্দারের লাশ থেকে গল্প ঘুরে গেল এলেভূতের দিকে।

—বুঝলে, চেনাই দহের বিলের ধারে কতবার এসেছি দিনমাসে। বিলের জলও আমাদের তন্নতন্ন চেনা। এর মধ্যে বড়বড় রুই আর কাৎলায় ভরা। এক একটার ওজন হবে পনেরো-কুড়ি, কেজি। বিয়ের লগনশায় কত-কত যে জাল পড়ে বিলের জলে তার ইয়ত্তা নেই। সাতগাঁয়ের মানুষ চেনাই দহের মাছ খেয়ে ধন্য ধন্য করে।

চেনাই দহ থেকে পঞ্চু ঘরামি কখন যে এলেভূতের গল্পে ঢুকবে আমি সেই প্রত্যাশায় অপেক্ষা করি। গল্প তখন ঘাই দিতে থাকে চেনাই দহের জলে। লাফিয়ে উঠতে থাকে সেই বিশাল আকারের মাছগুলো।

শরৎচন্দ্রের কার্তিক আর গণেশদের দেখতে ইচ্ছে হয় মনে মনে। কিন্তু সেই লোভ সামলে আমি শুনতে থাকি পঞ্চু ঘরামির গল্প।

—বুঝলে, তখন চারদিক জনমানবহীন। সুনসান করছে গোটা চত্বর। ঘুরঘুট্টি আঁধারে কোথাও আলো বলতে নেই। হাওয়ায় শব্দ উঠছে শোঁ শোঁ করে। এক একটা হাওয়া দমকা মেরে মিলিয়ে যাচ্ছে কোথায় না কোথায়! বিলের জল তখন সমুদ্দুরের মতো। তার আদিঅন্ত কিছুই বোঝা যায় না আঁধারে। চোখে দেখা যায় না তার জল। শুধু একটা কালো চাদরের মতো শুয়ে আছে সাত মাইল লম্বা হয়ে। আর বিলের ধার ঘেঁসে ফুটে আছে অজস্র নালফুল। তার বড় বড় পাতার মধ্যে থিকথিক করছে নালগুলো। কিন্তু অন্ধকারে দেখাই যাচ্ছে না তার রং। মেঠোপথ এক্কেবারে নির্জন। লোকজন দূরের কথা, একটা ঝিঁঝি পর্যন্ত রা কাড়ছে না কোনও দিগরে।

বললাম, বেশ সংঘাতিক জায়গা, তাই না?

—বেজায় সাংঘাতিক। এ সব তল্লাটে সন্ধে হতে না হতে নিশুত। রাতে লোকজন চলাফেরা করে না। লোকে বলে সন্ধের পর চেনাই দহের বিলের ধারে নিশি হাতছানি দেয়। ডেকে নিয়ে যাবে সুন্দরী মেয়ের রূপ ধরে।

অধৈর্য হয়ে বলি, তারপর? এলেভূতের কী হল?

—সেইটে বলার জন্যিই তো এত তোড়জোড়।

—তোমার ভয় করছিল না?

—ভয়! পঞ্চু ঘরামি হেসে ওঠে আমার অজ্ঞতায়, বলে, ছোটবেলা থেকে আমার শরীলে ভয়ডর বলতে নেই। তা ছাড়া আমরা তো তখন সাতজন! আমার একা যেতেও ভয় করত না। ভূতের ভয় তো নেইই। কতবার বাজি ধরে রেতের বেলা শ্মশানে গেছি মাঝরাতে। একবার বাজি ধরার লোকেরা বলল, 'তুমি যাওনি। মিথ্যে বলছ।' বলি, 'তাইলে একটা পাঁচটাকার নোট সই করে রেখে এসো চিতার উপর। দেখো ঠিক গে নে আসব'খনে।' ব্যস, যে কথা সেই কাজ। সই করা নোট নে এসে তাক লাগিয়ে দিছি সবাইকে। আর মানুষের ভয়! মানুষও আমাকে দেখলে ডরায়।

আমি শুধু একটা কথা বেফাঁস বলে ফেলতে অমনি আর একটা গল্প পেড়ে ফেলল পঞ্চু ঘরামি। তৎক্ষণাৎ গল্পের মুখ ঘুরিয়ে দিতে বলি, তারপর? এলেভূতের কী হল, ও পঞ্চুদা? এল নাকি তোমাদের পথের উপর?

—ওই দ্যাখো, এলেভূত পথের উপর আসবে কী করে? তেনারা তো থাকে জলের মধ্যি। তোমারে তো আগেই বললাম। তো এলেভূত সত্যিই এল।

—এল! আমার বুকের ভিতর কাঁপ ধরে।

—হ্যাঁ। বিলের ধার দিয়ে সে সাতজনে জোর পায়ে হাঁটছি। হঠাৎ দেখি মাইলখানেক দূরে একটা আগুনের ডেলা দপ করে জ্বলে উঠল। আমাদের মধ্যে কে একজন বেশ বলল, পঞ্চুদা, ওই দ্যাখো—

আমি দম বন্ধ করে বলে উঠি, কী দেখলে?

—দেখি কি, আগুনের ডেলাটা ভাসছে জলের উপর। কিন্তু একসঙ্গে সবাই দেখছে আগুনের ডেলাটা। এ নিশ্চয় চোখের ভুল নয়। এত দূর থেকেও দেখতে পাচ্ছি আগুনের ডেলাটা ভেসে ভেসে এগোচ্ছে এদিকেই। বাকি সবাই তো ভয়ে আটখানা। ততক্ষণে জোর পায়ে হেঁটে পৌঁছে গেছি বিলের মাঝ বরাবর। দলের

অন্যেরা তখন দৌড় দে পালাতে চাইছে। কিন্তু আমি তাদের থামিয়ে বলি, রোসো, বেপারটা কী তা ভালো করে বুঝতি দে।

একটু পরেই দেখি আগুনের ডেলাটা ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। বেশ জোরেই এগোচ্ছে দপদপ করতে করতে। আমাদের পটলা ভয় পেয়ে গোঙাতে থাকে, কী হবে পঞ্চুদা? আজ রেতে নির্ঘাত আমাদের এলেভূতে ধরবে।

তাদের বুক থেকে ভয় তাড়াতে বলি, অত ভয় কীসের? ভূত সমনে এলে কষে ধমক দিবি। যাক গিয়ে, এখন তাড়াতাড়ি পা চালা।

—নিজের জন্য নয়। ভূতে আমাকে কখনও কাবু করতে পারবে না। ভূতদের যা হাড়গিলে চেহারা তাতে আমার নিরানব্বই সিক্কার ঘুষি সামলাতে দম বেরিয়ে যাবে ব্যাটাদের। কিন্তু দলের বাকি ছ'জন এমন হুড়তাড় করছে যে জায়গাটা পার হতে পারলেই যেন বাঁচে। পা চালিয়ে ছুটছে সবাই। উদ্দেশ্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এলেভূতের আওতা থেকে দূরে পালিয়ে যাওয়া। কিন্তু হল কি, হঠাৎ সাঁইসাই করে একটা দমকা হাওয়া লাফিয়ে চলে এল আমাদের ঘাড়ের উপর। তখন সামনে বিশাল জল কালো রং মেখে ভুষ হয়ে আছে, তার মধ্যে রাশ রাশ নালফুল ফুটে আচে, সেগুলোর রংও তখন মিশকালো, আমরা হাওয়া সামলে হাঁটছি এলোমেলো পায়ে, সে সময় দেখি কি আগুনের ডেলাটা ভুস করে নিভে গেল। যেই না হাঁপ ছেড়ে ভাবছি, যাক, বোধহয় নিস্তার পাওয়া গেল এলেভূতটার হাত থেকে। বোধহয় জানতে পেরেছে দলটার সঙ্গে পঞ্চু ঘরামি আছে। বেশি জারিজুরি খাটবে না। কিন্তু সে বোধহয় কিছুক্ষণ, হঠাৎই দেখি আগুনের ডেলাটা ভেসে উঠল আমাদের একেবারে কাছে। বলতে গেলে হাতার মধ্যে। তক্ষুনি বিশে নামের একটা ছেলে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠে প্রায় ভিরমি খাবার জোগাড়। তাকে এক ধমক গিয়ে বলি, চুপ, চুপ। যে-ছোঁড়া ভয় পাবে তার গা বেয়ে উঠে পড়বে এলেভূত।

—কিন্তু তাতেও কারও ভয় ভাঙ্গে না, কেউ কেউ অন্ধকারে দৌড় লাগাল বিলের পাশে পায়ে চলতে থাকা মেটেপথ ধরে। কিন্তু এলেভূতের আওতা থেকে রেহাই পাওয়া যে অত সহজ কাজ নয় তারও প্রমাণ পাওয়া গেল পরক্ষণেই। আগুনের ডেলাটা নিভে গিয়ে যেদিকে ছেলেগুলো দৌড়োচ্ছিল সেখানেই গিয়ে ভেসে উঠল। তারা সে-দৃশ্যে এত ভয় পেয়ে গেল যে, পরক্ষণে যতটা এগিয়েছিল ততখানি পিছিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে হাইমাউ করে কাঁদতে শুরু করে 'পঞ্চুদা, বাঁচাও।' তখন বললাম, 'ধুস ভূতফুত বলে কিছু নেই। চল, আমরা এলেভূতটারে তেড়িয়ে ধরি। আয়, জলে নামি। দেখবি পালিয়ে পথ পাবে না। তাড়িয়ে ধরার প্রস্তাবে সবাই তো আরও থতমত। বলল, 'তা কী করে হবে, পঞ্চুদা? এলেভূত তো গা বেয়ে ওঠে শুনেছি।' তাদের বুকে সাহস ভরতে বললাম, 'একটা বুদ্ধি বার করেছি। সবাই মিলে রামনাম করবি। তাহলে আর এলেভূত গা বেয়ে উঠতে পারবেন না। রামের কাছে ব্যাটারা জব্দ। আর সেই ফুরসতে আমরা ভূতটারে ধরব। কাউকে ওর গায়ে হাত লাগাতে হবে না। সে কাজটা আমার।' তো যে কথা সেই কাজ। কিছুক্ষণ আমতা আমতা করে সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিলের জলে। নালফুল সরিয়ে পৌঁছে যাই আগুনের ডেলাটার কাছে। তাকে ঘিরে এগোতে থাকি। সবাই তখন রামের পায়ে তেল মাখাচ্ছে। কিন্তু চোখে মুখে যেমন আতঙ্ক, তেমনই কৌতূহল। কী হবে আগুনের ডেলাটার কাছে গেলে তা ভেবে সবাই রুদ্ধশ্বাস। কিন্তু বরাত এমনই যে, যেই মাত্তর আগুনের ডেলাটার কাছে পৌঁছে গেছি, অমনি দপ করে নিভে গেল আগুনটা। আমরা বোকার

মতো এ ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। পরক্ষণে দেখি আর একটু দূরে ভেসে উঠেছে আগুনটা। বলি 'দ্যাখ, কেমন ভয় পেয়েছে এলেভূত!' অমনি কে যেন বলল, 'ঠিক বলেছ, পঞ্চুদা। কী'রম ঘাবড়ে দিয়েছি বলো?' কথাটা সবার মনে ধরে। অমনি সবাই হইহই করে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার চারদিক ঘিরে। এগোচ্ছি সবাই। গোল হয়ে ঘিরে ধরছি আগুনের ডেলাটাকে। ভয়ও কেটে গেছে। যেই না তার কাছে পৌঁছেছি, অমনি আবার নিভে গেল আগেরবারের মতো। ছেলেদের সাহস দিতে বলি, 'দেখলি তো, কী ভয় পেয়েছে ব্যাটা?' তখন সবাইকার মধ্যে একটা বিপুল উত্তেজনা। পরক্ষণে যেই না একটু দূরে জ্বলে উঠেছে আগুনটা, অমনি আবার এগোতে থাকি তার চারপাশ ঘিরে। বলি, আজ রেতে ধরবই ব্যাটাকে। চল, রে, বিশে—

এই পর্যন্ত শুনে আমার আর ধৈর্য থাকে না, বলি, তারপর? ধরা পড়ল এলেভূত?

—কী আর বলি, দা'ঠাকুর? সে এক ভারি আজব গল্প।

—কী আজব গল্প, পঞ্চুদা?

—সারারাত ক'জনে মিলে কী তাড়াই না করলাম এলেভূতটারে। তারপর বুঝলাম এলেভূতটা আমাদের চেয়েও ঢের বুদ্ধিমান।

—বুদ্ধিমান! আমার ঠিক প্রত্যয় হয় না পঞ্চুদার কথায়। ভূতের আবার বুদ্ধি থাকে নাকি?

পঞ্চু ঘরামি হাসে, থাকে না আবার? সাত-সাতটা ছেলেকে সারাটা রাত ধরে লণ্ডভণ্ড করে দিল ধোঁকা দিয়ে! কী ঘোরানটাই না ঘোরাল! তাইলে রগড়টা শোনো মন দে।

বলে আবার শুরু হয় তার গল্প, বুঝলে, তো এরকম তেড়িয়ে নে যাচ্ছি তারে এক-একবার, আর এলেভূতটা পালিয়ে যাচ্ছে বারবার। তো আমার ছেলেরা তখন মরিয়া। ততক্ষণে ভোরের রং দেখা দিচ্ছে পুব আকাশে। ফরসা হয়ে আসছে পৃথিবী। কিন্তু এলেভূতটা তখনও চোর-পুলিশ খেলে যাচ্ছে একনাগাড়ে। শেষে এমন হল আমরা একেবারে এলেভূতের হাতার মধ্যে। আমার হাতদুটো তো প্রায় আঁকশির মতো সিড়িঙ্গে। যেই না তারে বাগে পেয়েছি, অমনি একটা লম্বা লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম আগুনের ডেলাটার ঘাড়ে। আর—

—আর? তখন আমারও শ্বাস রুদ্ধ, পেলে এলেভূত?

পঞ্চু ঘরামি হাসে, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হাসল মিটিমিটি, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সে এক রগড়ের কাণ্ড!

—কী রগড়? আমারও তর সইছে না শেষটা জানতে।

—আগুনের ডেলাটা নিভে গেল দপ করে। কিন্তু আমিও ছাড়বার পাত্র নই। আগুনটার সাথে সাথে আমিও দিলাম ডুব যাতে ফসকে না যায় ব্যাটা। কিন্তু হাতড়ে মাতড়ে কী পেলাম জানো?

—কী?

—একটা ফুটো মালসা।

সারারাত এলেভূতের পিছনে এক কোমর জলে ছুটে বেড়িয়ে শেষে একটা ফুটো মালসা পেয়েছে শুনে আমার ঠিক মন ভরে না। এত কষ্ট শেষে সব বৃথা?

পঞ্চু ঘরামি তখন মিটমিট করে হাসছে। বুঝলে দা'ঠাকুর, আসলে কী জানো, ভূতটুতকে যত ভয় পাবে তত সে চেপে বসবে ঘাড়ে। তারে যদি তুমি টুঁটি ধরে চেপে ধরতে চাও তো দেখবে লেজ গুটিয়ে চোঁ চোঁ দৌড় দেবে উল্টোমুখো।

পঞ্চু ঘরামির গল্পটা শুনে ঠিক তৃপ্তি হয় না যেন। পরদিন স্কুলে গিয়ে মাস্টারমশাইকে বলি গল্পটা। শুনে মাস্টারমশাই তো হেসে বাঁচেন না, বললেন, পঞ্চু ঘরামি বলেছে এই গল্প? আর তুমি তা বিশ্বাস করলে?

ঠিক বিশ্বাস করিনি, আবার অবিশ্বাসও করিনি, কেন না পঞ্চুদা এর আগেও তার নির্ভীকতার গল্প আরও অনেক শুনিয়েছে। তা ছাড়া এলেভূতের কাণ্ডকারখানা শোনার পরেও তার পিছনে ধাওয়া করেছে, সেই ধরার মধ্যেও তো এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ।

পরদিন মাস্টারমশাইয়ের কথা মতো পঞ্চুদাকে গিয়ে বলি, পঞ্চুদা, আসলে কী জানো, এলেভূত বলে কিছু নেই। আসলে ওটা মিথেন গ্যাস। অনেকদিনের জমে থাকা জলের মধ্যে এই গ্যাসের সৃষ্টি হয়। সেই গ্যাস বুদবুদ কেটে ওঠে জলের নীচে থেকে। সেই গ্যাস যখন জলস্তর পেরিয়ে উপরে বাতাসের সংস্পর্শে আসে তখনই জ্বলে ওঠে আগুন। গ্যাস ফুরিয়ে গেলেই আগুন নিভে যায়। তখন অন্য জায়গায় গ্যাস উঠতে থাকে। সেখানে আবার আগুন ধরে।

কথাটা শুনে অনেকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে তাকে আমার দিকে। তার অভিব্যক্তি দেখে অনুমান করি কথাটা পছন্দ হয়নি পঞ্চু ঘরামির, বলল, তোমরা লেখাপড়া শিখে কী যে সব বলো, দা'ঠুকর!

সে এসে দেখা দেয়

মহীন্দ্র বসু

ভোরের শহর কলকাতা। শুভো মিত্রের কাছে অপরিচিত নয়। রাস্তায় ভোরের আলোয় ঠান্ডা বাতাস। ময়দানের সবুজ যেন আরও স্বচ্ছ করে তাকে। এই জন্যই সে প্রাতঃভ্রমন করে প্রতিদিন। শরীরের পক্ষে জরুরি। প্রতিদিনকার মত আজও এসেছে ভিক্টোরিয়া চত্বরে ঘুরতে। অল্প অল্প শীতের বাতাস। সব মিলেমিশে একাকার। গাছগুলো যেন কথা বলছে, হাওয়ায় নড়ছে। পুকুরের জলে সূর্য ওঠার রশ্মির সোনালি আভা এসে পড়েছে।

শুভো বাইক চালিয়ে ভিক্টোরিয়া চত্বরে ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্ছে। মনটা তার ভোরের বাতাসের মত ফুরফুরে। ওর বেশ ভালো লাগছে। শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে এটাই আমাদের চেনা কলকাতা সংলগ্ন ভিক্টোরিয়া। এখানে আসে প্রতিদিন বহুলোক প্রাতঃভ্রমণ সারতে। আবার বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য লোকজনের ভিড়। ভিক্টোরিয়া দেখতে আর বেড়াতে সব রকমের মানুষের আনাগোনা।

নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ। কালিপূজো অনেক আগে শেষ হয়েছে। ঠান্ডা পড়ার শুরু। বেলা যত বাড়তে থাকে শহরের চেহারাটা কী রকম পাল্টে যায়। ট্রফিক জ্যাম, মানুষের ব্যস্ততা,গাড়ির হর্ন। আসলে জীবনটাও তাই এখনকার লোকজনের ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে সময় লাগবে না। বহুজাতীয় মানুষের সমাবেশ। শহরে, দিন দিন রাস্তাঘাট যত বাড়ছে গাড়ির সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে।

কৈশোরটা সত্যিই ভোরের মত স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জটিলতা ভিড় করে জীবনে।

খুব ছোটবেলায় গান শেখা শুরু শুভোর। খেয়াল ঠুমরি। বড় হয়ে সে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কাছে তালিম নিয়েছিল। আর একজন মানুষকে পেয়েছিল গানের গুরু হিসাবে। তিনি হলেন স্বনামধন্য সঙ্গীত পরিচালক মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়। মৃণালদা, ওর জীবনের সব প্রাপ্তির পিছনে তাঁর অপরিসীম অবদান। তারপর সে আস্তে আস্তে গান শেখাতে শুরু করল। অনেক ছাত্র-ছাত্রী হল। তর মধ্যে থেকে রিমি রায় এক কিশোরী মেয়ে গান শিখতে আরম্ভ করে। তখন ওর তেরো কী চৌদ্দ। ইংরেজী মিডিয়াম স্কুলের ছাত্রী। পরিচিতদের বাড়িতে গানের আসর বসলে ডাক পড়ত রিমির। তার গান শুনে শ্রোতারা মুগ্ধ হত। যেমনি গানের গলা তেমনি সুরেলা গলা। রিমি গানগুলো ভালোই গাইত।

রিমি ফ্রকপরা কিশোরী। বাবার সাথে প্রায় প্রতিদিন প্রাতঃভ্রমণে ভিক্টোরিয়া চত্বরে আসে। সেখানে শুভোর সঙ্গে পরিচয় হয় রিমির। তার কিছুদিন পরে ওর কাছে ক্ল্যাসিকাল গান শিখতে শুরু করে। গানকে ভালবেসে তাকে ভালো করে শিখে নিতে হয় সেটা জানত রিমি। আস্তে আস্তে রিমি নিজেকে তৈরী করে ফেলে গানের শিল্পী হিসাবে। ওর জীবনটা কাটত পড়শোনা গান আর ছবি আঁকার মধ্যে দিয়ে। মাঝে মধ্যে ডাক আসত অনুষ্ঠানে গান গাইতে। আর কয়েকদিন বাদে বাদে গানের ক্যাসেট আর সিডি বেরুবে কোম্পানি থেকে। এমন সময়ে ওর বাবার বদলির অর্ডার এল গোয়াহাটিতে। পত্রপাঠ ওদের চলে যেতে হ'ল। আর

করা গেল না গানের ক্যাসেট। পরে যখন ফিরবে কলকাতায় ক্যাসেটটা তখন আবার চেষ্টা চরিত্র করে বার করতে চায় রিমি।

রিমির বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে। সত্যি ওর স্মৃতিশক্তি অনর্গল বলে যেতে পারে ওর নিজের কবিতা, অন্যের কবিতা। নিজের কবিতা থেকে কয়েকটা কবিতার সুর করা। সেগুলো গাইলে শ্রোতাদের ভালো লাগে।

ভিক্টোরিয়া চত্বরে কয়েক পাক ঘুরে শুভো বুঝতে পারছে হঠাৎ তার কাঁধের কাছ ঠান্ডা বাতাস এসে লাগছে। পেছনে কে বসে আছে তার নিঃশ্বাসের বাতাস তার শরীরকে স্পর্শ করছে। এত ঠান্ডা বাতাস ওর গায়ে লাগলে ওর গোটা শরীর শিরশির করে ওঠে। যেনও হাড়কাঁপানি দেয়। সে অনুভব করছে যে তার বাইকের পিছনে কে যেন বসে আছে, মাঝে মাঝে কার যেন শরীরের ছোঁয়া লাগছে। কে সে বুঝে উঠতে পারছে না। সে তখন বাইক চালাতে চলাতে থেমে গেল। সে ফিরে তাকিয়ে দেখে কেউ কেথাও নেই। কোনো বাতাস আর পাচ্ছে না। এমনকি তার কয়েক গজ দুরে কোন মানুষজন দেখা যাচ্ছে না। কুয়াশার ধোঁয়া চারদিকে ঘিরে রয়েছে। সে একটু অবাক হয়ে যায়। সে তখন ভাবে, তার হয়তো মনের ভুল। আবার বাইক চালাতে থাকে। কিছুটা যাবার পরই দেখতে পায় একটা মেয়েকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দুটো ছেলে পেছন পেছন আসছে। তারা ওর পাশ কাটিয়ে চলে গেল ঘোড়া সমেত। মেয়েটির দিকে লক্ষ্য করেনি শুভো। আস্তে আস্তে ঘোড়া কুয়াশায় মিলিয়ে গেল।

সে আবার বাইকে উঠে চক্কর খায়। সে কয়েক গজ যেতে না যেতে আবার বুঝতে পারে সেইরকম অনুভূতি। কেউ যেন পেছনের সিটে বসে আছে। কার যেন হাত ওর গায়ে এসে পড়েছে। যে ভাবে লোকেরা যায় পেছন সিটে বসে। ঠিক সেই ভাবে বসে আছে পিছন সিটে কে যেন। এ কেমন হচ্ছে ব্যাপারটা সে নিজেকে প্রশ্ন করে উত্তর মেলাতে চায়। তাহলে কি অন্য কিছু হতে পারে? তারপরক্ষণে মনে হল কেউ যেন পাস থেকে হেঁটে চলে গেল। কাউকে দেখতে পেল না বা সত্যিই হতে পারে অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছে না আবার যেন কে গেল চলে, শুকনো পাতা খস খস শব্দ। এ কেমন হচ্ছে? বারে বারে এভাবে ঘটে যাওয়াতে ও আর থাকল না এখানে। কালবিলম্ব না করে বাইক নিয়ে সোজা বাড়ির দিকে ফিরে যায়। তার বাড়ি ভবানীপুরে টার্ফ রোডে। বহুকালের বাসিন্দা। বাড়ি ফিরে দেখে ঠিকেঝি বিমলা কাজ সেরে চলে গেছে।

ওর বাবা বিশ্বজিৎ মিত্র বাড়িটা ভাড়া নেন। ভবানীপুরে এক কলেজে তিনি বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। বছর পাঁচেক হল তিনি দেহ রেখেছেন। উঁনি চলে যাবার একবছরের মাথায় স্ত্রীও চলে গেলেন পরলোকে।

এখন হঠাৎ শুভোর মনে পড়ে রিমির কথা। সে তার প্রিয় ছাত্রী ছিল। ওর বাবা বছর পাঁচেক হল বদলি হয়ে চলে গেছেন গোয়াহাটিতে। রূপে গুণে ওর অতুলনীয় ব্যবহার। অনেক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ওকে ভীষণ স্নেহ করে শুভো। আজও ওর কাছে ওদের কোনো খবর নেই। ঠিকানা নেই তাহলে চিঠি লিখতো। ওরা বলেছিল ওখানে গিয়ে ওকে ঠিকানা পাঠাবে। মনে হয় ওর শিল্পী হিসবে বেশ নামডাক হয়েছে। তাই শুভোর বিষয়ে কোনো খোঁজ খবর রাখতে চায় না হয়তো। তাই জানায়নি ঠিকানা নেয়নি। মানুষের কত পরিবর্তন হয়, রিমিরও হয়েছে। মেয়েটা ভালোই গাইত। বেশ সুরেলা মিষ্টি গলা।

শুভোর সান্নিধ্যে যেসব ছাত্র-ছাত্রী এসেছে গান শিখতে তারাও মুগ্ধ হয়। ও হয়েছিল। শুভোর অফিসের সময় হয়ে গেল। সে তৈরী হয়ে অফিস চলে যায়। প্রতিদিন লাঞ্চ করে অফিস ক্যানটিনে। সকালে তার রান্নাপাট থাকে না।

অফিস যাবার সময় হলে, তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়ে অফিসের দিকে। সে অফিসে গিয়ে আর শান্তি পাচ্ছে

না। আজ সকালের ঘটনার কথা বার বার মনটাকে ভাবিয়ে তোলে। কাকে কি বলবে, কার কাছে মন খুলে কথা বলবে তেমন কেউ নেই। অফিসের সেই একই লোকজন। একই কাজকর্ম। ছুটির পরেই বাড়ি ফিরে একা একা থাকা আর দুঃখকে আঁকড়ে বেঁচে থাকা। বিশেষ করে কয়েকদিন হল সে ভীষণ ভাবে হাঁপিয়ে উঠেছে। সব সময় মনে যেন এক অস্থিরতা ওকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কয়েক দিন হল তার গানে রেয়াজ করাটা কমে গেছে। গানে টিউশানিতে মন নেই। ভালো লাগে গান শেখাতে ছাত্র-ছাত্রীদের । সব সময় যেন মনমরা। আজ সকাল থেকে প্রাতঃভ্রমণে বেড়িয়ে যে ঘটনা ঘটে গেল। তার কাছে ব্যাপারটা ভীষণ খারাপ লাগছে। আবার মনকে বোঝাতে চায় ও কিছু নয়, সব মনের ভুল।

শুভো তার ভাগ্যের সাথে লড়াই করে নিজেকে তৈরী করেছে। অনেক সময় ওর মনে হয়— এটা করব, ওটা করব কিন্তু শেষ পর্যন্ত করে উঠতে পারেনা। ওর সময় চলে যায় অফিস আর গান শেখানোর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে। এছাড়া গানের কোনো অনুষ্ঠানে যেতে হয়। ভালো গান করে কিন্তু তার অনুযায়ী তেমন নামডাক হল না। যা হয়েছে পরিচিত মহলে। পরদিন ভোরে শুভো এল ভিক্টোরিয়াতে প্রাতঃভ্রমণ করতে। মিনিট দশেক পরে কালকের মত উৎপাত শুরু হয়ে গেল। বাইক চালাতে চালাতে টের পায় তার পেছন সিটে কে যেন বসে আছে বাইকের পেছনে।..... গলায় গান ভেসে আসে। ওর ছাত্র-ছাত্রীদের শেখানো গানের কলি আর সুর ভেসে এল ওর কানে। গান ভেসে ভেসে আসছে যে সে হচকচিয়ে যায়। এ গানটা কে গাইছে। বেশ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পরে বাইক নিয়ে তখন কিন্তু গান শোনা গেল না।

শুভো মিত্রের হঠাৎ নজরে এল ভিক্টোরিয়া পাঁচিল ঘেরা একটা গাছের আড়ালে নীল আলোর আভা ছড়িয়ে আছে কিছুটা। কে যেন আলো ফোকাস করছে কানের পাস দিয়ে। ভোরের আলো তখন পরিস্কার হয়নি চারপাশ। তখনও অন্ধকার। আস্তে আস্তে ফর্সা হচ্ছে। গাছটার সামনে এসে দেখে কোথাও কোনো আলো জ্বলার কোনো চিহ্ন নেই।

গাছের পাশ দিয়ে সরু পিচের রাস্তা চলে গেছে অনেকটা। আবার এই রাস্তার ধার দিয়ে সারি সারি গাছ। এবারে শুভো রাস্তা দিয়ে বাইকের গর্জন করে চলে গেল কিছুটা। এরপর পাক খেয়ে ঘুরে এখানে দেখে সেই আলো আর দেখা যাচ্ছে না যেন ভ্যানিস। শুভো এবারে সোজা রাস্তা দিয়ে চলে যায়। তার বাঁদিকে ঝিল। ঝিলের দিক থেকে দক্ষিণে বাতাস আসছে। মাথার উপরে সরু কাস্তের মতো চাঁদ মনে হয় ছুটছে। নির্মল আকাশ, রাস্তার ধারে সারি সারি গাছ। সেসব পার হয়ে যাচ্ছে। গাছে পাখির ঝাঁকের কোলাহল। এমন সুন্দর পরিবেশ ওর মন কেড়ে নেয়।

শুভো এবারে বাইকটা থামিয়ে দাঁড়ায়। কে যেন ওর বাইকের পেছন সিটে এসে বসে। তার আগে কে যেন এল পায়ের শব্দ হল শুকনো পাতার শব্দ। কোন মানুষ যেন হেঁটে আসে ওর কাছে। আবার পেছন দিকে কে যেন হেঁটে আসছে, শুকনো পাতার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ও ফিরে তাকাল। দেখে রিমির বাবা আসছেন ওর দিকে। কাছে আসতেই সামনে এক আগন্তুক। ঝপ করে কে যেন নামে বাইকের পেছন সিট দিয়ে। শুভো এবার ফিরে তাকালে রিমিকে দেখতে পায়। রিমির পড়নে প্যান্ট সার্ট। বেশ সুন্দর লাগছে। সে এসে শুভোর সামনে দাঁড়ায়। তার পাশে এসে দাঁড়ালেন তার বাবা বিনয় রায়। রিমি এবার খিল খিল করে একচোট হেসে ফেলে। তারপর হাসি থামিয়ে শুভোকে জিজ্ঞেস করে, শুভোদা, আমাকে বাবাকে দেখে বেশ অবাক হচ্ছ হঠাৎ তোমার কাছে এলাম বলে? রিমি বলে উঠে।

শুভো এবার বলে বসে, তোমরা কবে ফিরলে কলকাতায়। আবার যাবে কবে? যাবার আগে আমার বাড়িতে একবারটি আসবে।

—শুভোদা, বাবা রিটায়ার করে গোহাটির পাট চুকিয়ে এখানে চলে এলেন বরাবরের জন্য। রিমি বলল।

রিমি তোমাকে দেখে বেশ ভালো লাগছে। কবে আসবে আমার বাড়িতে? গান বাজনা কেমন হচ্ছে? শুভোর কথা শুনে রিমির বাবা এগিয়ে আসেন ওর দিকে বললেন, শুভোবাবু, রিমি অনেকবার বলছিল, কতদিন শুভোদার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি। চল বাবা, একবারটি দেখা করে আসি। রিমি এসে দাঁড়িয়ে আছে ওদের কথার মাঝে। ও বলে, তোমার একটা ক্যাসেট বার করো না? তুমিতো ভালো গান গাও। শুভো এবারে জবাব দিল, তোমার একটা ক্যাসেট দিও, কেমন হয়েছে শুনে নেব। আমি ক্যাসেট বার করবার কথা এতদিন ভাবিনি। তুমি যখন বললে, তখন চেষ্টা করে দেখতে পারি।

রিমি এবারে বলে শুভোদা, তোমার বাইকের চাবিটা দাও তো একটু চালাই। কেমন শিখেছি দেখ।

শুভো চাবিটা ওর হাতে দিয়ে বলে, সাবধানে চালিও, ব্রেকটা একটু গন্ডগোল আছে।

রিমি শুভোর হাত থেকে চাবিটা নিয়ে উঠে পড়ে বাইকটাতে। বাইকটা স্টার্ট দেয়। কিছুদূর যাওয়ার পর থেকে ওকে আর দেখা যায় না! কেবল বাইকটা দেখা যায়। শুভো ভীষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। রিমির বাবা বিনয়বাবুর ডাকে ফিরে তাকায় শুভো। দেখে মাটিতে তার শরীরের নীচের অংশটা নেই। উপরের অংশ শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে।

—হ্যাঁ, শুভো ঠিকই দেখছো, আমি আর রিমি বেঁচে নেই। কলকাতায় ফিরে তোমাকে খবর দেবার সময় হল না। তারমধ্যে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া জ্বরে আমরা দুজনে শেষ হয়ে গেছি। আমরা এখন পরলোক পাড়ি দিচ্ছি। যাবার আগে তোমাকে জানিয়ে গেলাম। তুমি জানো বলেই—। বাইকটা আছাড় খেয়ে পড়ে মাটিতে। ওরা শূন্যে মিলিয়ে যায়। শুভো শোনে চারদিকে যেন ভূমিকম্পের শব্দ। থরথর করে কেঁপে ওঠে তার শরীর। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বাইকটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তার চোখে ঝরঝর করে জল পড়ে। সে মনে মনে বলে, তোমরা যেখানে থাক, ঈশ্বরের কাছে রইল আমার প্রার্থনা তোমাদের আত্মা শান্তিলাভ করুক।

সে এবার আস্তে আস্তে বাইকটা তুলে নিয়ে দেখে ঠিক আছে কিনা। এবার বাইক চালিয়ে সোজা বাড়ির দিকে গেল। দুঃখে ভরা মন নিয়ে ফেরে বাড়িতে। আর কোনো দিকে তাকাবার সময় নেই। কিভাবে বাইক চালিয়ে চলে যায় সে বুঝতে পারে না। মনে হচ্ছে তার শরীরে কোনো শক্তি নেই। কোনো প্রকারে বাড়ি ফিরে বিছানায় এসে শুয়ে পড়বে শুভো।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে মেঘেদের আনাগোনা কমে গিয়ে, সূর্যের প্রখরতা বাড়িতে দিয়েছে। জানলা দিয়ে বাইরের আলো বেশ তীব্র ভাবেই পড়ছিল শুভোর মুখে খাটে শুয়ে থাকা অবস্থায়। দোর বেল বাজল। শুভো ধরমড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। সে ভাবল, রিমি বোধহয় আবার এসেছে। তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দেখে, পাশের বাড়ির ছোট মেয়ে রুম্পা। তার হাতে ভর্তি শিউলি ফুল। সে নিয়ে এসেছে শুভোকে দিতে, ও মাঝে মাঝে ফুল দিয়ে যায় ওদের গাছের।

রুম্পার বয়স আট বছর। বোবা মেয়েটি ফুটফুটে। তার যাকিছু কথা ইশারায় বলে। ফরসা গায়ের রং। শুভোর দিকে একগাল হেসে ঘরের ভিতরে চলে যায়। ওকে শুভো আদর করে ঘরে বসায়। তার হাত থেকে ফুলগুলো নিয়ে টেবিলের উপর রাখে। রুম্পার হাতে একটা চকলেট দিল। সে নিয়ে বাড়ি চলে গেল। এরপর শুভো এলবাম থেকে রিমির ছবি বার করে টেবিলে এনে রাখবে। একটা বইয়ের গায়ে ছবিটা দাঁড় করে রাখল। সে মনে মনে বললে, রিমি তোমার আত্মার শান্তিলাভ হোক, এই রইল আমার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা।

———